সম্পূর্ণ ব্যতিক্রমধর্মী উপন্যাস

বদর প্রান্তের

মাওলানা সাদেক হোসাইন

আল আকসা লাইব্রেরী
৫০, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০।

ঐতিহাসিক বদর প্রান্তরে প্রায় সহস্র দুর্ধর্ষ খোদাদ্রোহীর বিরুদ্ধে
মাত্র ৩১৩ জন আল্লাহপ্রেমিক জানবাজের ঈমানদীপ্ত
ঘটনানির্ভর একটি চমৎকার উপন্যাস

বদর প্রান্তর

মূল

মাওলানা সাদেক হোসাইন সিদ্দিকী
(প্রখ্যাত ভারতীয় ইসলামী ঔপন্যাসিক)

ভাষান্তর

মাওলানা নোমান আহমদ

আল-আকসা লাইব্রেরী

৫০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০; ফোন : ০১৮৯৪৬৬৯৭০

প্রথম প্রকাশ ঃ সেপ্টেম্বর ১৯৯৯

দ্বিতীয় প্রকাশ ঃ মার্চ ২০০৫

প্রকাশিকা ● **হাফিজা আখতার**, আল-আকসা লাইব্রেরী, ৫০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০, **বর্ণবিন্যাস** ● শিবলী কম্পিউটার, বাংলাবাজার, ঢাকা, **প্রচ্ছদ পরিকল্পনা** ● আশরাফ আলী, **স্বত্ব** ● প্রকাশিকা

মুদ্রণ ● **আল-আকাবা প্রিন্টিং প্রেস**,
শ্রীশ দাস লেন, ঢাকা-১১০০

মূল্য ● একশত বিশ টাকা মাত্র।

উৎসর্গ

সত্যকে সমুন্নত রাখতে যেয়ে যুগে যুগে
যাদের বুকের টাটকা তাজা খুন ধরিত্রীর
শ্যামল-সবুজ ভূমিকে লালে লাল
করেছে এবং ভবিষ্যতে করবে,
সেসব তরুণ-তরুণী ও
মুমিন-মুমিনার প্রতি।

ক্ষমা প্রার্থনা

ঐতিহাসিক বদরের যুদ্ধ। আল–কুরআনুল করীমে যাকে আখ্যা দেয়া হয়েছে 'ইয়াওমুল ফুরকান' (সত্য–মিথ্যার মাঝে সুস্পষ্ট ব্যবধান দিবস) হিসাবে। বদরের যুদ্ধ পর্যালোচনা করলে সুস্পষ্টভাবে প্রতিভাত হয়ে উঠে এই বাস্তব সত্য। এটা ইসলামের একটি প্রকাশ্য মুজিযা। না হয় এতে মুষ্টিমেয় সাহাবায়ে কিরামের বিজয়ের কোন কারণই ছিলো না। কারণ, একদিকে সেখানে প্রায় সহস্র সশস্ত্র দুর্ধর্ষ যুদ্ধবাজের বিশাল বাহিনী, অপরদিকে মাত্র ৩১৩ জন নিরস্ত্র দুর্বল সাহাবী। একদিকে বিরাট সম্পদশালী আমীর–ওমরা, যারা একাই গোটা বাহিনীর ব্যয়ভার বহনে সক্ষম, অপরদিকে কপর্দকহীন দরিদ্র মুষ্টিমেয় অসহায় আল্লাহর বান্দা। একদিকে বিশাল অশ্বারোহী বাহিনী, অপরদিকে মুসলমানদের মাত্র দুটি অশ্ব। একদিকে সমকালীন সর্বপ্রকার সমরাস্ত্র, অপরদিকে মাত্র কয়েকটি পুরনো তলোয়ার–নেযা। বিশ্ব ঐতিহাসিকরা এজন্য বিস্ময়ে হতবাক। এহেন পরিস্থিতিতে কিভাবে মুসলমানদের এই অভাবনীয় বিজয় সম্ভব হলো। এর একমাত্র কারণ, মুসলমানদের সুদৃঢ় ঈমান ও মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ তা'আলার গায়েবী সাহায্য।

৩১৩ জন আল্লাহ প্রেমিকের এই ঈমানদীপ্ত কাহিনী নিয়েই রচিত বক্ষমান উপন্যাসটি। খ্যাতনামা ভারতীয় ঔপন্যাসিক মাওলানা সাদেক

হোসাইন সিদ্দিকী এই উপন্যাসের রচয়িতা। তিনি নাম দিয়েছেন 'জঙ্গে বদর', আমরা দিয়েছি 'বদর প্রান্তর'।

উল্লেখ্য, সারা বিশ্বে বর্তমানে অশ্লীল, বাজে নভেল–উপন্যাসের প্রতি যুবক শ্রেণীর অসাধারণ ঝোঁক দেখে অধম এর বঙ্গানুবাদ করে। সাহাবীদের শানে কোন গোস্তাখী হতে পারে বিধায় সর্বপ্রথম আল্লাহর দরবারে ক্ষমাপ্রার্থী। উদ্দেশ্য একটিই যুবসমাজকে অশ্লীলতার স্রোত থেকে রক্ষা করা। এ ব্যাপারে আমার আন্তরিকতার কোন কমতি নেই। এমনিতেই অধমের কাঁচা হাত, তাছাড়া পাণ্ডুলিপি তৈরী করা ব্যতীত মাস দুয়েকের ভিতরেই সরাসরি কম্পোজ করাতে ভুল–ত্রুটি হওয়া স্বাভাবিক। তাই পাঠক মহোদয়ের নিকট বিনীত নিবেদন, কোথাও ভুল–ত্রুটি পরিলক্ষিত হলে অবহিত করবেন। আমরা সংশোধনের জন্য প্রস্তুত।

স্মর্তব্য, এটি একটি উপন্যাস। উপন্যাসকে উপন্যাসের মর্যাদাই দেয়া উচিত—তার ঊর্ধ্বে নয়।

মুহসিন ভাই সহ আরো যারা সহযোগিতা করেছেন তাদের সবার প্রতি রইলো আন্তরিক অভিনন্দন।

আয় আল্লাহ! তোমার প্রিয় বান্দাদের শানে কোন বেয়াদবী হলে তার জন্য আমাকে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড় করিও না।

ঢাকা
০৯. ০৯. ১৯৯৯

বিনীত
ইবনে নূর

বদর প্রান্তর

১
পরামর্শ

হেরেমে মক্কা। কাবা শরীফের সন্নিকটস্থ একটি সমতল ভূমি। এখানে কয়েকজন বেদুঈনের সমাগম। এরা কুরাইশের মোড়ল। এরা হলো আবূ জেহেল ইবন হিশাম, আবুল বাখতারী, আস ইবন হিশাম, উমাইয়া ইবন খালফ, রাবী'আর পুত্রদ্বয়, উতবা ও শায়বা। আবূ জেহেল বললো ঃ একটি মারাত্মক ভুল হলো, তোমরা মুহাম্মাদকে এখান থেকে বেরিয়ে যেতে দিলে।

উমাইয়া ইবন খাল্‌ফ বললো ঃ আমরা কোন চেষ্টাই তো আর বাদ রাখলাম না। তা সত্ত্বেও তো মুহাম্মাদ বেরিয়ে গেলো।

আবূ জেহেল ঃ আমাদের সে লোকগুলো অন্ধ হয়ে গিয়েছিলো, যারা মুহাম্মাদকে প্রাণে বধ করতে গিয়েছিলো। কমবখতগুলো দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুধু তামাশা দেখছিলো, আর মুহাম্মাদ বেরিয়ে গেলো।

আবুল বাখতারী ঃ কী অন্ধ হয়েছে! তারা লক্ষই করেনি। তাদের এই উদাসীনতাই গোটা জাতিকে বিপদে ফেললো।

আবূ জেহেল ঃ আমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে, যখন থেকে আমি জানতে পেলাম ইয়াসরিববাসী[১] মুহাম্মাদকে মাথায় তুলেছে, তাকে শাসক বানিয়েছে, সবাই করছে তার আনুগত্য।

হিজরী দ্বিতীয় বর্ষ। মুহাম্মাদ (সাঃ) মক্কার কাফিরদের অবর্ণনীয় জুলুম-নির্যাতনে অতিষ্ঠ হয়ে হিজরত করে মক্কা থেকে মদীনায় পদার্পণ করেন। ইসলামের জন্য কুরবান, রাসূলের একনিষ্ঠ সাহাবায়ে কেরাম নিজেদের ধনসম্পদ, আত্মীয়-স্বজন ও স্বদেশ ছেড়ে শুধু আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশে শিরকভূমি মক্কা ছেড়ে শান্তিনগরী মদীনায় পৌছলেন।

টীকা ঃ ১. মদীনা মুনাওয়ারার পূর্ব নাম ছিলো ইয়াসরিব। প্রিয়নবী (সাঃ)এর শুভাগমনের পর এর নাম হলো 'মদীনাতুন নবী'। বর্তমানে যাকে বলে মদীনা মুনাওয়ারা।

মক্কার কাফিররা ছিল মুহাম্মাদ (সাঃ)–এর জানের শত্রু। মক্কা ছেড়ে ঈমানদাররা নিরাপদ আশ্রয়ে চলে গেছেন। এতে সৃষ্টি হলো তাদের অন্তর্দাহ। শুধু আবু জেহেলই নয় প্রতিমাপূজক সকল পৌত্তলিকেরই মনের জ্বালা বারবার দাউ দাউ করে জ্বলে উঠে।

এই শত্রুতার কারণ, মক্কাবাসী ৩৬০টি প্রতিমার পূজা করতো। প্রতিটি গোত্র ও খান্দানের ছিলো স্বতন্ত্র প্রতিমা। আর মুহাম্মাদ (সাঃ) এসেছেন পৌত্তলিকতা বিরোধী একত্ববাদের পয়গাম নিয়ে। তারা পূজা করতো পাথর, মূর্তির। এরূপ প্রতিমা তারা হাতে তৈরী করেছিলো যেগুলো না কোন উপকার সাধন করতে পারে, না পারে কারো ক্ষতিসাধন করতে। অসহায় এই মূর্তিগুলো এমন কি নিজের দেহ থেকে একটি মাছিও তাড়াতে সক্ষম নয়। প্রিয়নবী (সাঃ) প্রচার করতে লাগলেন ঃ তোমরা মাথা নত করো কেবল সারা জাহানের সৃষ্টিকর্তার সম্মুখে, যার হাতে জীবন, মৃত্যু, যিনি জীবন দান করেন, মৃত্যু দেন, যার হুকুম ছাড়া একটি অণু–পরমাণুও নড়াচড়া করতে পারে না, যিনি চিরঞ্জীব, চিরন্তন, মৃত্যুর পর যার দরবারে সবাইকে হাজির হতে হবে, কিয়ামতের দিন যিনি সবার কৃতকর্মের হিসাব নেবেন, যিনি অপরাধী, মুশরিকদের জাহান্নামে ফেলবেন, সেই জাহান্নাম যাতে অগ্নি দাউ দাউ করে জ্বলছে। তিনি ঈমানদারদের জান্নাতে পাঠাবেন। সে জান্নাতে রয়েছে হুর–গেলমান, চিরসবুজ বাগান, পানির নহর–প্রস্রবন।

মুশরিকদের গাত্রদাহ আরম্ভ হতো যখন তারা প্রতিমাগুলোর বিরুদ্ধে নিন্দাবাদ শুনতো। তারা তাদের পিতা–প্রপিতারা ছিলো মূর্তির উপাসক, দেব–দেবী–প্রতিমার প্রতি সম্মান প্রদর্শনকারী। শত শত বৎসর থেকে খানায়ে কাবা পরিণত হয়েছিলো মূর্তির তীর্থস্থানে। স্বীয় উপাস্যগুলোর বিরুদ্ধে কথা শুনলেই তারা অগ্নিমূর্তি ধারণ করতো। মনে চাইতো ঈমানদারদের জবাই করে ফেলে, প্রিয়নবীকে খতম করে দেয়, নাস্তানাবুদ করে দেয় ইসলামের বুনিয়াদ।

প্রিয়নবী (সাঃ) যখন মক্কায় তখন তারা জুলুম–নির্যাতনের এমন ষ্টিম রোলার চালায় যার ইতিহাস সত্যিই লোমহর্ষক। অবশেষে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে নির্দেশ এলো হিজরতের। হিজরত করে প্রিয়নবী (সাঃ) মদীনায় তাশরীফ আনয়ন করলেন। মদীনাবাসী প্রিয় রাসূল (সাঃ)কে জানালেন সাদর সম্ভাষণ, লুটিয়ে পড়লেন তাঁর কদমতলে। তাঁরা সোপর্দ করলেন স্বীয় জানমাল। তাঁকে বানালেন শাসনকর্তা, মহামান্য পথপ্রদর্শক।

মক্কাবাসীদের কর্ণকুহরে এই সংবাদ পৌছলো। উদ্বিগ্ন হলো তারা। কারণ, প্রিয়নবীর (সাঃ) এই মহাসম্মান মানে প্রতিমাগুলোর অবমাননা, দেব–দেবী ও

মূর্তিগুলোর চরম অসম্মান। এতে ইসলাম মাথা উচু করে দাঁড়ালো, কুফর হলো লাঞ্ছিত, পদদলিত।

উমাইয়া বললো ঃ মদীনাবাসীদের কাণ্ড দেখো। তারা তো বেদ্বীন হয়ে গেলো। তারা একটুও খেয়াল করলো না যে, তাদের বাপ–দাদারা তো প্রতিমারই উপাসক ছিলো। সেই প্রতিমারই তো নিন্দাবাদ করছে মুহাম্মাদ। তাদের বিবেকে কি পর্দা পড়ে গেলো!

আবু জেহেল ঃ দৃঢ় বিশ্বাস রেখো। মদীনার ক্ষমতার মসনদ শীঘ্রই উল্টে যাচ্ছে। সেখানে বে–দ্বীনীর শক্তি বৃদ্ধি পাচ্ছে। মন্দির থেকে মূর্তি অপসারিত হচ্ছে। অদৃশ্য খোদার পূজা করা হচ্ছে। আমার আশংকা হচ্ছে এই মহামারী ছড়িয়ে পড়ে কিনা, নির্বোধ আরব এই সয়লাবে ভেসে যায় কিনা। স্বধর্মের প্রতি সহমর্মিতা আমার এত অধিক যে, সেটাকে টিকিয়ে রাখতে ধনসম্পদ ও জান উৎসর্গ করতেও প্রস্তুত।

আবুল বাখতারী ঃ ভাই! আমাদের সবার মনের স্পৃহা এটাই। যে মূতিগুলোর আমরা উপাসনা করছি, সেগুলোর নিন্দা আমরা কিভাবে সইতে পারি। আমাদের রক্ত শোনিত টগবগ করে উঠে যখন শুনি আমাদের উপাস্যগুলোর বিরুদ্ধে কোন কমবখত নিন্দা করছে।

শায়বা ঃ তুমি সত্য বলেছো। আমার তনুমনে আগুন জ্বলে উঠে। সত্য বলতে কি, আমরা আসলে বিরাট আহমকী করেছি। আমরা সবাই মিলে যদি মুহাম্মাদকে কতল করে ফেলতাম তাহলে ফিতনা মাথাচাড়া দিয়ে উঠার আগেই স্তব্ধ হয়ে যেতো।

আবু জেহেল ঃ চিন্তা করো না। ভয় করো না। এখনো তেমন কিছুই হয়নি। আমরা যদি ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করি, তাহলে মদীনায় আক্রমণ করে মুহাম্মাদ ও তার সাঙ্গপাঙ্গদের প্রাণে বধ করে ছাড়তে পারবো। শোনো, আমার প্রস্তাব হলো, আবু সুফিয়ানের সাথে শামে যে বাণিজ্যিক সম্পদ প্রেরিত হচ্ছে তা তো অনেক মূল্যের। কমপক্ষে ৫০ হাজার স্বর্ণমুদ্রা। আবু সুফিয়ান শাম থেকে ব্যবসা করে ফিরে এলে তার অর্ধেক সম্পদ দ্বারা যুদ্ধাস্ত্র তৈরী করে মদীনায় হামলা চালিয়ে মুসলমানের গোষ্ঠী শুদ্ধ শেষ করে এসো।

উমাইয়া ঃ নেহায়েত যৌক্তিক কৌশল। তবে শর্ত হচ্ছে যাদের সম্পদ বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে প্রেরিত হচ্ছে তাদের সবাইকে সম্মত হতে হবে।

আবু জেহেল ঃ আরে কে অস্বীকার করবে? কার মনে চোট লাগেনি? এই কাফেলায় সবচেয়ে বেশী সম্পদ হচ্ছে সাঈদ পরিবারের। তারপর বনী মাখযূমের। তারপর হারিস ইবন আমের ইবন নাওফাল এবং উমাইয়া ইবন খালফের। আমার সম্পদ আছে, আছে আবু সুফিয়ানেরও। এরা সবাই এমন

লোক যে, অর্ধেক কেন সম্পূর্ণ মালই দিয়ে দিবে।

আবূ সুফিয়ানের নেতৃত্বে যে অর্থসম্পদ শাম যাচ্ছিলো তাতে আমীর গরীব সবারই সম্পদ ছিলো। কোন কুরাইশী নারী পুরুষ এরূপ ছিলো না যার মাল তাতে ছিলো না। এক হাজার উট বোঝাই মাল হয়েছিলো। এই মালের হেফাজতে আদিষ্ট ২০০ লোক নিয়োজিত ছিলো। এই কাফেলা অবস্থান করছিলো মক্কার বাইরে। ২/১ দিনের মধ্যেই সফরে রওয়ানা হবার কথা। এমতাবস্থায় আবু সুফিয়ান ও কুরয ইবন জাবের সেখানে উপস্থিত হলো। আবু জেহেল বলল ঃ খুবই ভালো হয়েছে, এরা দুজনও এসেছেন।

আবু সুফিয়ান জিজ্ঞেস করলো ঃ কি পরামর্শ হচ্ছিলো?

আবু জেহেল পুরো আলোচনা সবিস্তারে শুনালো।

আবু সুফিয়ান ঃ খুব ভাল বুদ্ধি। চাঁদা উঠানোরও প্রয়োজন হবে না।

আবু জেহেল ঃ আমার মনে আরেকটি কথা এলো।

আবু সুফিয়ান ঃ বলো।

আবু জেহেল ঃ মুসলমানদের প্রভাবিত করার জন্য তাদের মাল ছিনতাই করা উচিত।

কুরয ঃ আরে আমি তো তাই বলতে চাচ্ছিলাম। আমার প্রস্তাব হলো, মদীনার আশেপাশে মুসলমানদের যেসব চারণভূমি আছে সেগুলোতে অতর্কিত আক্রমণ চালিয়ে উট বকরী যা পাবো ছিনিয়ে নিয়ে আসবো।

আবু জেহেল ঃ কুর্দন করে বলে উঠলো, লাত, উযযার শপথ, খুবই যুক্তিসঙ্গত প্রস্তাব। এতে মুসলমানরা ভীত সন্ত্রস্ত হবে। পুনরায় যখন আমরা বাণিজ্যিক কাফেলার প্রত্যাবর্তনের পর সৈন্যবাহিনী নিয়ে তাদের উপর আক্রমণ করব তখন তারা প্রভাব ও শংকার ফলে আমাদের বিরুদ্ধে মোকাবিলা করার সাহস পাবে না।

আবূ সুফিয়ান ঃ আমারও একই অভিমত। এই প্রস্তাব অত্যন্ত যুক্তিসম্মত।

আবু জেহেল ঃ ঠিক আছে, বলো, তাহলে এ গুরুদায়িত্ব কার কাছে অর্পণ করবো?

উমাইয়া ঃ এই প্রস্তাবের উদ্যোক্তাকেই এই গুরুদায়িত্ব দেয়া উচিত।

আবু জেহেল ঃ বিলকুল ঠিক। ভাই কুরয! এ ব্যাপারে তোমার কোন আপত্তি আছে?

কুরয ঃ আমি প্রতিমা উপাসক। আমাদের উপাস্যগুলোকে যারা মন্দ বলে আমি তাদের সবার শত্রু। এই বিরাট গুরুত্বপূর্ণ কাজে যেতে আমি সানন্দে প্রস্তুত।

আবু জেহেল ঃ তাহলে কথা পাকা হয়ে গেলো। তোমরা কবে রওয়ানা করবে?

কুরয ঃ যখন আপনারা বলবেন।

আবু জেহেল ঃ আমরা তো চাই, তোমরা বাণিজ্যিক কাফেলার সাথেই রওয়ানা হও। বদরে যেয়ে আবু সুফিয়ান মুলকে শামের দিকে চলে যাবে আর তোমরা মদীনার দিকে।

বদর মদীনা থেকে মক্কা শরীফের দিকে প্রায় ৮০ মাইল দূরে অবস্থিত একটি স্থানের নাম। প্রতি বৎসর সেখানে একটি মেলা বসতো। সেখান থেকে একটি পথ মুলকে শামের দিকে চলে গেছে, অপরটি গেছে মদীনার দিকে।

কুরয ঃ কাফেলা প্রস্তুত। তবে আমাকে প্রস্তুতি নিতে হবে। আমি হয়তো ২/১ দিন পর রওয়ানা হবো।

আবু জেহেল ঃ কোন অসুবিধা নেই। দেখো তো সামনের দিক থেকে কে আসছে। একি সুপ্রসিদ্ধ ভবিষ্যদ্বক্তা শিক?

আবু সুফিয়ান ইবন হারব দেখলো, আগন্তুক হাড়ের মালা পরিধান করে এক হাতে মাথার খুলি আরেক হাতে আয়না নিয়ে আসছেন। আবু সুফিয়ান বললো, কোন সন্দেহ নেই তিনি শিক।

আবু জেহেল ঃ এসো। আমাদের প্রস্তাবগুলো সম্পর্কে এঁকে জিজ্ঞেস করি। সবাই এই মজযুবকে দেখার জন্য ভীড় জমালো।

২
কাফেলার অভিযাত্রা

আগন্তুক খুবই ধীরকদমে বিড়বিড় করতে করতে আসছিলেন। তার অবস্থা ছিলো আজব ধরনের। যদিও গ্রীষ্মকাল সুতি কাপড় পরেও মানুষ গরমে অতিষ্ঠ, অথচ তিনি ছিলেন পশমী জুব্বা পরিহিত। জুব্বাও আবার বিভিন্ন স্থানে ছেঁড়া। মাথার চুলগুলো এমন উস্কু-খুশকু যেন কখনো বিন্যাস করা হয়নি। এতো পেঁচানো যে এখন বিন্যাস করাও কষ্টসাধ্য। দাড়িগুলো বিক্ষিপ্ত। চোখগুলো রক্তরাঙা। দেখলে ভয় লাগে। মাথায় পাগড়ি। পাগড়ির পেঁচগুলোও অবিন্যস্ত। গলায় হাড়ের মালা। ডানহাতে মানুষের মাথার খুলি, বাম হাতে আয়না। ভাঙ্গাচোরা আয়না।

সে ভবিষ্যদ্বক্তা দৃঢ়পদে তাদের কাছে এসে দাঁড়ালেন। চোখ মটকিয়ে রাঙাচোখে তাদের দিকে নজর করছিলেন। তার তেজ দৃষ্টি তাদের অন্তরে তার প্রভাব বিস্তার করছিলো। আবু জেহেল বললো ঃ উস্তাদ শিক! আসুন, বসুন।

এ ব্যক্তি উস্তাদ নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন। আররাফ নামে তাকে আখ্যায়িত করা হতো। যে অদৃশ্যের অবস্থা জানে এবং ভবিষ্যত ঘটনাবলী সম্পর্কে মন্তব্য করতে পারে তাকে বলা হয় আররাফ।

আরবের লোকেরা ছিলো খুবই সন্দেহপ্রবণ। সে যুগে তারা বহু কিছু বিশ্বাস করতো। দেও–দানবে বিশ্বাস করতো। তাদের আকীদা ছিলো জিনেরা[১] মানবীদের উপর প্রেমাসক্ত হয়, তাদের বিরক্ত করে। অনেক সময় তাদের তুলে নিয়ে যায়। এজন্য তারা সুন্দরী রূপসী যুবতী ও নারীদের খুব হেফাজত করতো। দিনের সূচনা ও সমাপ্তিকালে এবং দুপুরে তাদের ঘরের বাইরে বেরুতে দিতো না। এরূপ কোন জায়গায় যেতে দিতো না যেখানে তারা জিনের আশংকা করতো। তারা ধারণা করতো পরীরা মানব পুরুষদের প্রেমে আসক্ত হয়। যখন কোথাও সফরে রওয়ানা হতো, তখন যাবার সময় গাছের কোন সরু ডালে গিরা লাগিয়ে যেতো। সফর থেকে প্রত্যাবর্তন করে দেখতো, যদি গিরা লাগানো থাকতো তাহলে তারা মনে করতো স্ত্রী পবিত্র রয়েছে। আর যদি গিরা খোলা পেতো, তাহলে বিশ্বাস করতো যে, স্ত্রী পরপুরুষের সাথে অপকর্মে জড়িত হয়েছে। যখন কেউ মৃত্যুমুখে পতিত হতো এবং তার উটনী থাকতো তখন সে উটনীকে তার কবরের পাশে চোখ বেঁধে রাখতো। ফলে সেটি সেখানেই মরে যেতো। এরূপ করার কারণ, তাদের ধারণা ছিলো যখন সে মৃত্যুর পর কবর থেকে উঠবে তখন উটনীর উপর আরোহণ করে উঠবে। আরবরা ছিলো কাহানতে (ভবিষ্যত ও অতীত সম্পর্কে মন্তব্য করা) বিশ্বাসী। অতীন্দ্রিয়বাদী ছিলো দু প্রকার ঃ ১. অতীত ঘটনাবলী বর্ণনাকারী ২. ভবিষ্যদ্বক্তা। তারা উভয়কেই খুব সম্মান করতো।

শিক বহু বড় ভবিষ্যদ্বক্তা ছিলেন। তার খ্যাতি ছিলো গোটা হেজাযে। তিনি এসে বসলেন।

আবু জেহেল বললো ঃ উস্তাদ শিক! বলুন, আমরা এতক্ষণ কি বিষয়ে আলোচনা করছিলাম?

শিক প্রথম হাড়ের মালাগুলোর দিকে তাকালো তারপর মাথার খুলির দিকে। দীর্ঘক্ষণ দেখতে থাকলেন। অতঃপর আয়না সামনে এনে বললেন, ইরানের সম্রাট ছিলেন জামশেদ। তিনি একটি পেয়ালা বানিয়েছিলেন। এই পেয়ালার মাধ্যমে তিনি দুনিয়ার হাল–অবস্থা বর্ণনা করতে পারতেন। তবে শিক–এর এই পেয়ালা হাজারো জামশেদ অপেক্ষা উত্তম।

টীকা ঃ ১. জিন–পরীর অস্তিত্ব বাস্তবে আছে। আল–কুরআনে সূরা জিন নামে স্বতন্ত্র একটি সূরা আছে। —অনুবাদক।

আবু জেহেল ঃ কোন সন্দেহ নেই। এবং শিক ও জামশেদ এর উস্তাদ অপেক্ষা উত্তম।

শিক ঃ কিন্তু শিক–এর কদর তার দেশে নেই।

আবু জেহেল ঃ কেন নেই? বর্তমানে গোটা হেজাযই তো আপনাকে উস্তাদ মানছে।

শিক ঃ আচ্ছা শোন, তোমরা আলোচনা করছিলে কারো উপর আক্রমণ করার কথা। আমার আয়না বলছে, তোমরা তাকে দুশমন ভাবছো। প্রকৃতপক্ষে সে তোমাদের শত্রু নয়।

আবু জেহেল বিস্ময়ের দৃষ্টিতে তার প্রতি তাকালো। বললো ঃ না, সে আমাদের শত্রু।

শিক ঃ আমার আয়না তাই বলছে।

আবু জেহেল ঃ গভীর দৃষ্টিতে দেখুন।

শিক তার দিকে তীক্ষ্ণ নজরে তাকিয়ে বললেন, তোমাদের কি বিশ্বাস হয় আমার আয়না আমার সাথে মিথ্যে বলবে?

আবু জেহেল ঃ এই বিশ্বাস তো নেই। তবে........।

শিক ঃ সন্দেহ জেগেছে? সংশয় রেখো না। আয়না কখনো মিথ্যে বলে না।

শিক আবার গভীর দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললেন ঃ কথা সেটাই যা আমি ব্যক্ত করেছি—তোমরা তার দুশমন, সে তোমাদের শত্রু নয়।

আবু জেহেল ঃ তাহলে কোন্ দিকে আক্রমণ করতে মনস্থ করছি?

শিক ঃ উত্তর দিকে। একটি প্রসিদ্ধ শহরের উপর।

আবু জেহেল ঃ ঠিক আছে। আমরা এ হামলায় সফল হবো?

শিক ঃ তোমরা এ আক্রমণে কামিয়াব হবে। তবে তৎপরবর্তী ঘটনাবলী নেহায়েত বিপদজনক। তোমাদের এই আক্রমণ রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের কারণ হবে, যাতে মক্কার খ্যাতনামা লোকজন প্রাণ বিসর্জন দিবে।

আবু সুফিয়ান ঃ তাহলে আমরা এই হামলা থেকে বিরত থাকবো?

শিক ঃ এই হামলা অবশ্যম্ভাবী। যা হবার হবেই।

আবু জেহেল ঃ এই হামলায় আমাদের কোন লোকজনের ক্ষতি হবে না তো?

শিক ঃ এমন কিছু তো দৃশতঃ দেখছি না।

আবু জেহেল ঃ তাহলে আমাদের শংকা কিসের?

শিক ঃ ভয় করলেও লাভ কি? আমার আয়না বলছে, এখান থেকে অ–নে–ক দূর রণক্ষেত্র হবে। তাতে খুনের নদী বইবে।

আবু জেহেল ঃ এর ফলাফল কি হবে?

শিক ঃ পূর্বেই বলেছি। এবার বিদায় নিচ্ছি।

আবু জেহেল ঃ উস্তাদ, আরেকটি কথা বলে যান।

শিক ঃ বলো।

আবু জেহেল ঃ আমাদের যে কাফেলা বাণিজ্যে যাচ্ছে, তাদের ব্যাপারে কোন আশংকা আছে?

শিক পুনরায় আয়নার দিকে তাকালো। বললো, কাফেলার কোন অসুবিধা হবে না। তবে রক্তবন্যা বইবে এদের কারণে। এখন গরম বেশী পড়ছে। আমি অপারগ। আর বেশী কিছু বলতে পারবো না। আসি।

শিক চলে গেলেন। আবূ জেহেল বললো ঃ আস্ত পাগল টাইপের লোকটা। কিছু কথা সঠিক বলে আবার কিছু উল্টাপাল্টা।

আবু সুফিয়ান ঃ ঠিক নয়। এ লোক ভবিষ্যদ্বাণী বিষয়ে পাকা অভিজ্ঞ। বর্তমান কালের অধিকাংশ ভবিষ্যদ্বক্তা তাকে এ বিষয়ে পারদর্শী মনে করেন।

উমাইয়া ঃ হতে পারে আমাদের আক্রমণের পর এমন কোন সময় আসতে পারে যেমনটি শিক বলেছেন। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, এটা মুসলমানদের হাতে হবে না। কারণ, তারা খুবই দুর্বল। তাদের কোন শক্তিই নেই। তাছাড়া তাদের কোন মদদগারও নেই। তবে হতে পারে আমাদের হামলায় কোন শক্তিশালী কেউ মারা যাবে। সে গোত্র আমাদের কাছ থেকে কিসাস বা রক্তপণ আদায় করতে প্রস্তুত হতে পারে। এটা প্রতিরোধ করার পন্থা হলো একমাত্র মুসলমানদের ছাড়া অন্য কেউর উপর আক্রমণ করা হবে না।

আবু জেহেল ঃ ভুল হয়েছে। শিক–এর নিকট সব কথা খুলে জিজ্ঞেস করা হয়নি। যাই হোক, পরবর্তীতে হলেও জিজ্ঞেস করা যাবে।

কুরয ঃ তোমরাও প্রস্তুতি নাও। ভাই আবু সুফিয়ান! জাতির পুঁজি তোমার কাছে সোপর্দ করা হলো। আমাদের সিদ্ধান্ত হলো, যে পরিমাণ পুঁজি তুমি নিয়ে যাচ্ছো, ফিরে এলে তার অর্ধাংশ রণপ্রস্তুতিতে ব্যয় করা হবে। মুসলমানদের গোষ্ঠীশুদ্ধ খতম করার জন্য মদীনায় আক্রমণ করবো।

আবু সুফিয়ান ঃ যে যুদ্ধের কথা তোমরা বলছো, আমরা যে পুঁজি নিয়ে বাণিজ্যে রওয়ানা হলাম তার লাভটুকুই এর প্রস্তুতির জন্য যথেষ্ট।

আবু জেহেল ঃ তাইলে তো আরো ভালো। আচ্ছা, তাহলে কবে রওয়ানা করতে চাচ্ছেন?

আবু সুফিয়ান ঃ ইচ্ছে তো ছিলো পরশু রওয়ানা করবো। কিন্তু প্রস্তুতি অবশ্য আগেই হয়ে গেলো। আগামীকালই সূর্যোদয়ের সাথে সাথে রওয়ানা করবো।

আবু জেহেল ঃ বেশ ভালো। একটু তাড়াতাড়ি আসার চেষ্টা করবেন। মুলকে শামের চিত্তাকর্ষক দৃশ্য যেন আপনাকে আকৃষ্ট করে দীর্ঘ দিন সেখানে অবস্থান করতে বাধ্য না করে।

আবু সুফিয়ান ঃ পূর্ণ বিশ্বাস রেখো, প্রশান্ত থেকো, আমি খুব শিগগির প্রত্যাবর্তন করবো।

সূর্যের তাপ বৃদ্ধি পাচ্ছে। তাই সবাই উঠে চলে গেলো। সেদিনই মক্কায় ঘোষণা হলো—বাণিজ্যিক কাফেলা আগামীকাল রওয়ানা হচ্ছে। এই কাফেলার সাথে যারা যেতে আগ্রহী তারা সবাই আজকেই শহরের বাইরে চলে গেছে। যাবার ইচ্ছে থাকলে তাদের সাথে মিলিত হোন।

আরবের রজনী। চাঁদনী রাত। খুব চিত্তাকর্ষক। দিনভর প্রবাহিত উষ্ণ হাওয়া রাতে নাতিশীতোষ্ণ হয়ে উঠে। চাঁদনী রাতে ঠাণ্ডা হাওয়া খুবই আনন্দদায়ক। রাতে এরা ময়দানে বিছানা বিছিয়ে ঘুমিয়ে পড়লো। চন্দ্র তার কক্ষপথ অতিক্রম করছে। এমনিভাবে সকাল হলো। খানায়ে কাবায় ঘন্টা বাজতে আরম্ভ করলো। ফুৎকার দেয়া হলো শংখে। যেই খোদার ঘর হযরত ইবরাহীম (আঃ) তৈরী করেছিলেন বিশ্বের তাওহীদবাদীদের হজের জন্য, ইবাদতের জন্য তাতে রাখা হয়েছে বহু প্রতিমা। সে বাণিজ্যিক কাফেলার সাথেও ছিলো ছোট ছোট অনেক মূর্তি। তারা ঘন্টা ও শংখ বাজালো। প্রতিমার পূজা-অর্চনা করলো। তৈরী হলো রওয়ানার জন্য।

উষ্ট্রির পালগুলো রওয়ানা হলো সারিবদ্ধ হয়ে। ১০ সহস্রাধিক উট।[১] এ কারণেই দুটি সারি করতে হয়েছিলো। কিছু উটের উপর বোঝাই আসবাবপত্র আর অবশিষ্টগুলোর উপর আরোহী বিনোদনের উপকরণ লোকজন। কাফেলা এত দীর্ঘ হলো যে, দুপুর পর্যন্ত শুধু রওয়ানাই হতে থাকলো। সর্বশেষ উটটি যাত্রা করলো ঠিক দ্বিপ্রহরে। ৫ জন পিছনে থেকে গেলো। তারা ঘুরে ফিরে এদিক ওদিক দেখলো কিছু পিছনে রয়ে গেলো কিনা। দেখলো কিছু নেই। শেষে তারাও যাত্রা করলো।

৩
আতিকা

কাফেলা রওয়ানা হয়ে গেলো। তার পরদিন এক আরব যুবতী খানায়ে কাবার দরওয়াযা দিয়ে বেরিয়ে বনূ হাশেম মহল্লার দিকে যাচ্ছিলো। চেহারা তার উন্মুক্ত। উজ্জ্বল গোধুমী তার গায়ের রং। কিন্তু রক্তিম বর্ণটাই প্রবল।

টীকা ঃ ১. এ ব্যাপারে ভিন্ন মতও রয়েছে।—অনুবাদক।

সাজসজ্জা আকর্ষণীয়। চোখগুলো ডাগর কৃষ্ণ। প্রশস্ত ললাট। চাঁদের ন্যায় বক্র ভ্রু। চমৎকার মানানসই নাসিকা। তুলতুলে নরম গণ্ডদ্বয়।

তৎকালীন যুগের পোশাক তার দেহে। ঢিলেঢালা সেলোয়ার। গায়ে আরবী আলখাল্লা জাতীয় লেবাস। তবে গলা থেকে বুক পর্যন্ত ফাড়া।[১] চালচলন শানদার। হেরেমের দরজা থেকে বেরিয়ে মাত্র কয়েক কদম চলতেই তার সামনে এলো এক বৃদ্ধা। বললো ঃ কে? আতিকা? যুবতীর নাম ছিলো আতিকা।

আতিকা বললো ঃ উম্মে রবী'আ? হাঁ, আমি আতিকা!

সে দুর্বল বৃদ্ধা মহিলার নাম ছিলো উম্মে রবী'আ।

দুর্বল চক্ষুযুগল তুলে আতিকার দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে তিনি বললেন ঃ আমার চোখের দৃষ্টি কমজোর হয়ে গেছে। তবে তোমার রূপ, তোমার শান-শওকত, তোমার চালচলনই এমন যে দূর থেকেই চেনা যায়।

আতিকা মুচকি হাসলো।

উম্মে রবী'আ ঃ তুমি আরো কিছু শুনেছো?

আতিকা ঃ কী?

উম্মে রবী'আ ঃ এক দিক হয়ে দাঁড়াও। বলছি।

আতিকা এবং উম্মে রবী'আ হেরেম শরীফ থেকে সামান্য দূরে এরূপ এক নির্জন স্থানে গিয়ে দাঁড়ালো যেখানে তৃতীয় কেউ ছিলো না। আতিকা বললো ঃ এবার বলুন।

উম্মে রবী'আ এদিক সেদিক তাকিয়ে বললেন ঃ আল্লাহই জানেন, কমবখত আবু জেহেলের কি হলো।

আতিকা ঃ কি হয়েছে? সে কি আরো কোন ফিতনা করতে চাইছে?

উম্মে রবী'আ ঃ হাঁ, বেটি! সবাই জানে মুহাম্মাদ ইবন আবদুল্লাহর উপর এই পাষণ্ড এত মারাত্মক জুলুম-নির্যাতন চালিয়েছে যে বেচারা শেষতক অপারগ হয়ে আপন মাতৃভূমি, আত্মীয়-স্বজন সর্বস্ব ছেড়ে ইয়াসরিবে হিজরত করেছে।

আতিকা ঃ আপনি চুপিসারে কেন বলছেন। জলদি বলুন, সে কি কি অপকর্ম করেছে।

উম্মে রবী'আ ঃ আব্বাসের বোন! এখন কি করা যায় তুমি বলো। আমি বলবো না। এটা আমার অভ্যাস।

আতিকা ঠোঁটে চমৎকার হাসি ফুটিয়ে বললো ঃ আরে, আপনার অভ্যাস পাল্টে ফেলুন। আপনি যা বলতে চান বলে ফেলুন। আতিকা আব্বাস ইবন

টীকা ঃ ১. এখানে এক লাইন বাদ দেয়া হয়েছে।—অনুবাদক।

আবদুল মুত্তালিবের সহোদরা বোন। বনু হাশেম গোত্রের মেয়ে। হযরত আব্বাস (রাঃ) ছিলেন প্রিয়নবী (সাঃ)এর চাচা। অতএব আতিকা হচ্ছেন রাসূলে আকরাম (সাঃ)এর ফুফু। তখনও আব্বাস ও আতিকা কেউ ইসলাম গ্রহণ করেননি। তা সত্ত্বেও তারা প্রিয়নবী (সাঃ)কে অত্যাধিক ভালবাসতেন। প্রিয়নবীর হিজরত তাদের মনে প্রচণ্ড আঘাত হানলো। হিজরত তাদের মনে ভীষণ পীড়া দিলো।

তাদের সামর্থ্য থাকলে প্রিয়নবী (সাঃ)কে মক্কা ছেড়ে যেতে দিতেন না। এতে কোন সন্দেহ নেই যে, প্রিয়নবী (সাঃ)–এর বংশ, মান, সম্মান ও আভিজাত্যের দিক দিয়ে ছিলো অন্যসবের ঊর্ধ্বে। তবে তারা বিপুল ধন–ঐশ্বর্যের অধিকারী ছিলেন না। অর্থ বিত্তের অধিকারী ছিলো তারা যারা অভিজাত হলেও স্বভাবগতভাবে ছিলে নীচু ধরনের। ধনসম্পদের কারণে লোকজন তাদের সমীহ করে চলতো। তাদের ভয় করতো। তবে বনী হাশেমকে সবার ঊর্ধ্বে সম্মান প্রদর্শন করে চলতো।

উম্মে রবী'আ বললেন ঃ তুমি কুরয ইবন জাবিরকে চেন?

আতিকা ঃ নাম শুনেছি।

উম্মে রবী'আ ঃ স্বচক্ষে দেখেছো?

আতিকা ঃ হয়তো দর্শন লাভও হয়েছে।

উম্মে রবী'আ ঃ আরে সে তো তোমাকে ভাল করেই চেনে দেখি। তোমার খুব প্রশংসা করে।

আতিকা ঃ হয়তো। কুরয ইবন জাবের কি করেছে?

উম্মে রবী'আ ঃ আবু জেহেল তাকে শক্তভাবে ধরেছে। তাকে বলেছে তুমি যেয়ে মদীনার চারণভূমিতে আক্রমণ করে উট বকরী ছিনতাই করে হাঁকিয়ে নিয়ে আসবে। আতিকা ভীষণ উদ্বিগ্ন হলো। সে বললো ঃ দুর্ভাগা এটাকে গণীমত মনে করলো না যে, তাদের উপর প্রচুর জুলুম অত্যাচার করেছে এবং তারা এই জুলুম নির্যাতনকে ভুলে গেছে। প্রতিশোধ নেবার কল্পনাও করেনি। এবার শুনলাম, আল্লাহর ফযলে তাঁদের দলও ভারী হয়েছে। ইচ্ছে করলে প্রতিশোধ নিতে পারবে।

উম্মে রবী'আ ঃ বোন! আমি আরেকটি কথা বলছি। মুহাম্মাদ ইবন আবদুল্লাহ একদম সরল ও সৎ লোক। এটা আলাদা ব্যাপার যে, সে আমাদের উপাস্যগুলোর নিন্দা করে। এটাকে আমরাও ভাল নজরে দেখি না। তবে সে যে ভালো ও সরল লোক তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই। এখন তো সে এখানে অবস্থান করছে না। তার সাথে এখন আমাদের আর কোন সংশ্লিষ্টতা না থাকা উচিত। তাকে এখনো কষ্ট–তকলীফ দেয়া খুবই খারাপ।

আতিকা ঃ মনে হচ্ছে আবু জেহেল স্বদেশ ও জাতিকে বিপদে ফেলতে চাইছে। যদিও আমি আমার ভাতিজার উপর ঈমান আনিনি, এখনও আমাদের দেব–দেবীর প্রতিই ভক্তি–ভালোবাসা রয়েছে, যাদের পূজা–অর্চনা আমাদের পিতা–প্রপিতারা করে আসছেন, তা সত্ত্বেও আমি অবশ্যই জানি এবং মানি আমার ভাতিজা খুবই সৎ, ঈমানদার ও দয়াপ্রবণ, রহমদিল। তাঁর প্রতি নিষ্ঠুর আচরণ করা হয়েছে। মরদূদ আবু জেহেল তাঁকে পাথর মেরে জখম করেছে, তার প্ররোচনায় লোকজন তাঁর পথে কাঁটা বিছিয়েছে। তার পিঠে নামাযরত অবস্থায় উটের আতুড়ী, ময়লা ইত্যাদি ফেলেছে, তাঁর গলায় চাদর পেঁচিয়ে টেনে হিচড়ে বেড়িয়েছে, যার ফলে তার চক্ষু বের হবার উপক্রম হয়েছে। তাঁর সাথী–সঙ্গীদের উপর বিভিন্ন প্রকার নির্যাতন চালিয়েছে, কাউকে শুইয়েছে মরুভূমির উত্তপ্ত বালুর উপর। কারো উপর নেযা ছুড়ে জখম করা হয়েছে। কারো বুকের উপর ভারী পাথর চাপা দেয়া হয়েছে। কাউকে করা হয়েছে বেত্রাঘাত। কাউকে খঞ্জর ও ছুরির আঘাতে ক্ষতবিক্ষত করা হয়েছে। কয়েক বৎসর পর্যন্ত ভাতিজাকে তাঁর সাথীদের সহ শি'আবে আবী তালিবে বয়কট করে আবদ্ধ করে রাখা হয়েছে। সেখানে তারা ক্ষুধার্ত ও তৃষ্ণার্ত থেকেছে। এসব হৃদয় বিদারক জুলুম–নির্যাতন তারা দৃঢ়তার সাথে বরদাশত করেছে। তাদের কারো চেহারায় ভাঁজও প্রকাশ পায়নি। শেষ পর্যন্ত নিরুপায় হয়ে তারা এখান থেকে বেরিয়ে যায়। বদবখত এখনো তাদের পিছু ছাড়েনি। দুর্বলকে তো পিপড়েও দংশন করে। যাই হোক, তারাও তো মানুষ। এমন যেন না হয় যে তারা উল্টো প্রতিশোধ নিতে প্রস্তুত হয়, এরূপ যুদ্ধের সূচনা হয় যার আগুন গোটা জাতিকে জ্বালিয়ে ছারখার করে দেয়।

উম্মে রবী'আ ঃ তুমি সত্য বলেছো। শিকও এ কথাই বলেছিলেন।

আতিকা ঃ কোন শিক? সে গণক–ভবিষ্যদ্বক্তা যে এক হাতে আয়না অপর হস্তে মাথার খুলি নিয়ে ঘুরে বেড়ান?

উম্মে রবী'আ ঃ হাঁ, তিনিই।

আতিকা ঃ তিনি কি বলেছিলেন?

উম্মে রবী'আ ঃ তিনি বলেছিলেন, যার উপর তোমরা আক্রমণ করতে মনস্থ করেছো সে তোমাদের দুশমন নয়। তোমরা তার দুশমন। তোমাদের এই আক্রমণ সফল হবে। তবে পরবর্তীতে ভয়ানক রক্তারক্তি হবে। তাতে মক্কার নামকরা লোকজন প্রাণ হারাবেন।

আতিকা ঃ বাস্তবেই তিনি এরূপ বলেছেন?

উম্মে রবী'আ ঃ তাহলে? আমি তো তাই শুনেছি।

আতিকা ঃ তিনি কাকে এ কথা বলেছেন?

উম্মে রবী'আ ঃ আবু জেহেল এবং অন্যান্য নেতৃবৃন্দের কাছে।

আতিকা ঃ তারা কি একথা শিককে বলে দিয়েছিলেন যে, মুহাম্মাদ ও তার সাথীদের উপর তারা আক্রমণ করতে মনস্থ করেছেন?

উম্মে রবী'আ ঃ না। তাকে তারা কিছুই বলেননি। বরং জিজ্ঞেস করেছিলেন যে, আপনি বলুন, আমরা কি বিষয়ে এতক্ষণ আলোচনা করেছিলাম। তারা ইতিপূর্বেই কুরয ইবন জাবেরকে মদীনায় আক্রমণ করার জন্য উস্কানি দিয়ে প্রস্তুত করেছিলো। তাদের প্রশ্নের উত্তরে শিক এসব কথা বলেছিলেন।

আতিকা ঃ স্বয়ং আমারও এই ধারণা। তাদের চারণভূমিতে যদি আক্রমণ করা হয়, তাহলে মহাযুদ্ধের সূচনা ঘটবে এবং এ যুদ্ধ হয়তো হেজায, আরব ছাড়িয়ে যেতে পারে। হায়, তাদের যদি বুদ্ধি ফিরে আসতো! তারা যদি এ আক্রমণ থেকে বিরত হতো!

উম্মে রবী'আ ঃ আবু জেহেল, আবুল বাখতারী, উমাইয়া, কুরয সহ আরো কিছু লোক অবশ্য আক্রমণ করিয়ে ছাড়বেন। পরিণতি শিক যা বলেছেন তাই হবে আর কি? হয়তো তারা মক্কার উপর আক্রমণ করবে অথবা অন্য এরূপ কোন পরিস্থিতির উদ্ভব হবে যার ফলে খুনোখুনি হবে। এই রক্তারক্তিতে জানি না কারা কারা নিহত হয়। খুব সম্ভব তোমার ধারণাই সঠিক হবে। সারা গোত্রে যুদ্ধের আগুন ছড়িয়ে পড়বে। কারণ, মক্কা থেকে ইয়াসরিব পর্যন্ত যতগুলো গ্রাম আছে তন্মধ্যে অধিকাংশ গোত্রই মক্কাবাসীদের বন্ধু, আবার অনেকে ইয়াসরিববাসীর মিত্র। এরা পরস্পরে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়বে। হায়, যদি লাত, উযযা এই বালা প্রতিরোধ করে দিতেন!

আতিকা ঃ কিন্তু এই বিপদ তো তারা নিজ হাতেই ডেকে আনছে।

উম্মে রবী'আ ঃ তুমি একটা কাজ করো। তোমার সহোদর আব্বাসকে বলো, সে যেন গণ্যমান্যদের পঞ্চায়েত ডেকে এই আক্রমণ থেকে তাদের বিরত রাখে।

আতিকা ঃ উম্মে রবী'আ! তারা আব্বাসের কথা কেন মান্য করবে?

উম্মে রবী'আ ঃ এতো আমিও জানি। তবে চেষ্টা করো। হয়তো মেনে যাবে।

আতিকা ঃ ভাইয়াকে আমি অবশ্যই বলবো।

উম্মে রবী'আ ঃ কিন্তু আজই বলতে হবে। কুরয হয়তো কাল রওয়ানা করবে।

আতিকা ঃ আজই বলবো। অতঃপর তারা দুজন নীরবে নিজ নিজ পথে চলে গেলো।

৪

আবু জেহেলের দম্ভ

সেদিন দুপুরে আতিকা স্বীয় রুমে বসে আছে। তখনি আব্বাসের আগমন হলো। এসে বললেন ঃ বাণিজ্যিক কাফেলা রওয়ানা হয়েছে। তাতে আমাদের মালও আছে। আর আতিকা! তোমার সম্পদও রয়েছে। আজকে আমি গণক–ভবিষ্যদ্বক্তা খুযাইমার সাথে সাক্ষাত করেছিলাম। তিনি বলছিলেন ঃ এই কাফেলার রওয়ানার সময় এরূপ একটি তারকার উদয় ঘটেছে যার প্রভাব বিচিত্র ধরনের।

আতিকা ঃ জানিনা, এই ভবিষ্যদ্বক্তা কেন এত অধিক ভবিষ্যদ্বানী করতে আরম্ভ করেছেন।

আব্বাস ঃ মূলতঃ মুহাম্মাদের জন্মের পূর্ব থেকেই ভবিষ্যদ্বাণীর এই ধারাবাহিকতা চালু হয়েছে এবং এখনো দিন দিন উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে।

আতিকা ঃ খুযাইমাকে আপনি জিজ্ঞেস করেছিলেন, না তিনি নিজেই বলেছিলেন?

আব্বাস ঃ না। আমি নিজেই তাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম।

আতিকা ঃ তিনি কি বলেছিলেন?

আব্বাস ঃ তিনি বলেছিলেন ঃ আক্ষেপ, যদি এই কাফেলা রওয়ানা না হতো! তিনি হিসাব করে বললেন, এই কাফেলার কারণে মারাত্মক খুনোখুনি হবে। এই যুদ্ধে মক্কার নামজাদা লোকজন মারা যাবেন।

আতিকা ঃ আশ্চর্য! প্রায় এ ধরনের ভবিষ্যদ্বাণীই তো শিক করেছেন।

আব্বাস ঃ তাহলে কি শিকের সাথে তোমার সাক্ষাত ঘটেছিলো?

আতিকা ঃ না। উম্মে রবী'আ বলেছিলেন।

আব্বাস ঃ উম্মে রবী'আ কে? তিনি ভাবছিলেন। অতঃপর বললেন, অহো, চিনতে পেরেছি। হাঁ, তো তিনি কি বলেছিলেন?

আতিকা ঃ তিনি বলেছিলেন, কাফেলার গায়ে আঁচড় লাগবে না। তবে আবু জেহেল কুরযকে মদীনাবাসীদের চারণভূমিতে আক্রমণ করার জন্য প্ররোচিত করেছে। শিক ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন, এর প্রতিক্রিয়া স্বরূপ মক্কাবাসীর উপর বিপদ আপতিত হবে। রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ হবে। তাতে মক্কার নেতৃবৃন্দ নিহত হবেন।

আব্বাস ঃ এ কারণেই তো দুই ভবিষ্যদ্বক্তার মধ্যে বিরোধ হয়ে গেছে। একজন বলছেন, কুরযের আক্রমণের ফলে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ হবে। আরেকজন বলেছেন, কাফেলার কারণে রক্ত ঝরবে।

আতিকা ঃ আপনি ঠিক বলেছেন। তবে একটি বিষয়ে তো উভয়ই একমত। তা হচ্ছে খুনোখুনি হবে অবশ্যই। হতে পারে চারণভূমিতে ছিনতাই আক্রমণের ফলে মুসলমানরা নাখোশ হবে। ফলে কাফেলাকে ক্ষতিগ্রস্ত করার প্রচেষ্টা চালাবে। ইতোমধ্যে মক্কাবাসী জানতে পেরে কাফেলার সাহায্যে এগিয়ে যাবে। পরিণতি হবে এর ভয়াবহ–রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ।

আব্বাস ঃ তোমার ধারণা যথার্থ মনে হচ্ছে। আতিকা! এভাবে ভবিষ্যদ্বক্তাদের ভবিষ্যদ্বাণী বাস্তবরূপ লাভ করতে পারে।

আতিকা ঃ না। আসলে আবু জেহেল, আবুল বাখতারী, উমাইয়া, ওয়ালীদ ছাড়াও তাদের আরো দুচারজন সহযোগী গোমস্তা আমাদের বনু হাশেমের সাথে বিরোধে লিপ্ত। তারা আমাদেরকে মুসলমানদের মিত্র মনে করে। তাদের কোন পরামর্শে আমাদের অংশীদার বানায় না। এজন্য আমরা কোন কিছুই জানতে পারি না।

আবু জেহেল কুরয ইবন জাবিরকে মদীনা যেয়ে মুহাম্মাদ–এর চারণভূমিতে হামলা করার জন্য উস্কানী দিয়ে তৈরী করে ফেলেছে। আপনি হয়তো শুনেছেন, মদীনাবাসী মুহাজিরদেরকে কুবা এলাকার দিকে একটি চারণভূমি দান করেছে। এই চারণভূমিতে মুহাম্মাদ ও তার সাথীরা উট, বকরী চরায়।

আব্বাস ঃ এটা আমি জানি।

আতিকা ঃ এতে কি বোঝা যায় না যে, মদীনাবাসীদের উপর শুধু আক্রমণ করাই লক্ষ্য–উদ্দেশ্য নয় বরং উদ্দেশ্য মুসলমানদেরকে ক্ষতিগ্রস্ত করা।

আব্বাস ঃ আমি তা বুঝি। তবে এতে আবু জেহেল হোক বা অন্য কেউ, কারো দোষ মনে করি না। কারণ, মুহাম্মাদ উপাস্য–প্রতিমাগুলোর বিরুদ্ধে কথা বলে গোটা আরবকে নিজের প্রতিপক্ষে পরিণত করেছে। এমন কোন আরব আছে যে উপাস্যের নিন্দা শুনতে প্রস্তুত? শত শত বছর থেকে যেসব মূর্তিপূজা চলছে, গোটা আরবের যেগুলো উপাস্য সেগুলোর বিপক্ষে মুহাম্মাদ বক্তব্য রাখছে। সে বলছে ঃ আল্লাহ নাকি বলেছেন ঃ তোমরা এবং আল্লাহ ছাড়া তোমরা যাদের উপাসনা করছো সবাই জাহান্নামের ইন্ধন।—সূরা আম্বিয়া।

আচ্ছা তুমি বলো দেখি, এটা কি আরব ও তাদের উপাস্যগুলোর চরম অবমাননা নয়? আর এই অবমাননার ক্রুদ্ধ প্রতিক্রিয়ায় শত্রুতে পরিণত হওয়া কি যুক্তিযুক্ত নয়?

আতিকা ঃ আপনি আমাকে জিজ্ঞেস করছেন?

আব্বাস ঃ হাঁ।

আতিকা ঃ এসব প্রতিমা উপাস্য কি না–এ সম্পর্কে স্বয়ং আমারই সংশয় হচ্ছে। অধিকাংশ সময়ই আমার মনে সন্দেহ জাগে আমরা এবং আমাদের মুরুব্বীরা ভ্রান্ত উপাস্যেরই উপাসনা করছি কি না?

আব্বাস ! মুহাম্মাদের প্রতি যে কালাম অবতীর্ণ হয়েছে তাতে তার ভাষা অত্যন্ত সুমধুর। তাতে বলা হয়েছে ঃ

আলহামদু লিল্লাহি রাব্বিল আলামীন। আর রাহমানির রাহীম। মালিকি ইয়াও মিদ্দীন।......।

আব্বাস ঃ তুমি সত্য বলেছো। আতিকা! মুহাম্মাদ যখন থেকে তার দ্বীনের দাওয়াত ও প্রচার আরম্ভ করেছে এবং এক আল্লাহর রব তুলেছে, তখন থেকে আমি দোদুল্যমানতায় ভুগছি। শুধু আমি নই, গোটা আরব এই সংশয়ে পড়ে গেছে। এই পুণ্যভূমিতে পূর্বেও নবী–রাসুলের আগমন ঘটেছে। বিচিত্র নয়, মুহাম্মাদও তো নবী হতে পারে। একটি বিষয় সুনিশ্চিত, সে সৃষ্টিকর্তার উদ্ধৃতি দিয়ে যেসব কথা বলছে তাতে রয়েছে খুবই মিষ্টতা, ভীষণ প্রভাব। যেই শুনে সেই ঈমান গ্রহণ করে। দেখো না উমর ইবন খাত্তাবের ন্যায় পাষাণ হৃদয়, হামযার ন্যায় সুসভ্য ব্যক্তিও ইসলাম গ্রহণ করে ফেলেছেন। আমি নিজেও ভাবছি–ইসলাম কি তাহলে সত্য ধর্ম?

আতিকা ঃ আচ্ছা ঠিক আছে, এ বিষয়ে পরে ভাবা যাবে। তবে এখন জরুরী ভিত্তিতে কুরযের বিষয়টি নিয়ে মাথা ঘামান।

আব্বাস ঃ কুরযের বিষয়ে আমরা কি করতে পারি?

আতিকা ঃ আপনি আবু জেহেল, আবু বাখতারী, উমাইয়া, শায়বা এবং কুরযকে বলুন, মুহাম্মাদ যেহেতু মক্কা ছেড়ে ৩০০ মাইল দূরে চলে গেছে, সেহেতু এখন আর তাকে উত্যক্ত করে লাভ কি? এখন আর তোমরা তাকে কষ্ট দিচ্ছ কেন?

আব্বাস ঃ আতিকা! তুমি জাননা। এখন আর আমার কথায় কোন জোর নেই, যদিও সমাজ আমাকে সম্মান প্রদর্শন—করে সমীহ করে চলে। আমাদের তেমন অর্থ বিত্ত নেই। আছে খান্দানী আভিজাত্য, উচ্চ বংশীয় গৌরব। কিন্তু জনসাধারণ তো ধনদৌলত, অর্থসম্পদের প্রতি নজর করে থাকে। তারা আবু জেহেল, আবুল বাখতারী, উমাইয়াদের ন্যায় নেতাদের দেখে। তাদের কথায় উঠে বসে।

আতিকা ঃ আমি কখন বললাম, আপনি জনসাধারণকে কিছু বলুন? আমি তো বলছি, আপনি আবু জেহেল ও অন্যান্যদের বলুন।

আব্বাস ঃ কোন লাভ হবে না। অরণ্যে রোদন আর কি? সে বড়

দাম্ভিক–অহংকারী। আমি ভালোর জন্য তাকে কিছু বলবো, আর সে ভাববে আমি ভাতিজার পক্ষে সুপারিশ করতে আসছি। এসব ভেবে আমায় দোষারোপ করবে।

আতিকা ঃ তার মন–মানসিকতা তো অনুরূপই। কিন্তু আমরা তো স্বজাতিকে বাঁচাতে চাইছি। স্বীয় দায়িত্ব পালন করুন। মানুক না মানুক সেটা তাদের এখতিয়ার।

আব্বাস ঃ আচ্ছা ঠিক আছে, আবু জেহেলকে আমি বলবো।

আতিকা ঃ কবে?

আব্বাস ঃ আগামীকাল।

আতিকা ঃ কাল নয় আজই। কাল তো কুরযের রওয়ানা হবার কথা।

আব্বাস ঃ আচ্ছা, আজই যাচ্ছি।

সেদিনই বিকেলে পড়ন্ত বেলায় আব্বাস খানায়ে কাবায় উপস্থিত হলেন। সেখানে তখন আবু জেহেল, হারিস ইবন আমের, ইবন নওফাল, শায়বা ইবন রবী'আ, যামআ ইবন আসওয়াদ উপস্থিত বসা। আবু জেহেল টিটকারীচ্ছলে বললো ঃ আসুন হাশেমী যুবক!

আব্বাস তার তাচ্ছিল্যের প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করে বসে গেলেন। আবু জেহেল বললো ঃ বলুন, কি ভেবে এলেন?

আব্বাস ঃ আসলাম। শুনতে পেলাম, কুরযকে নাকি তোমরা মদীনার চারণভূমিতে আক্রমণ করার উদ্দেশ্যে পাঠাচ্ছো। এটা করো না। এমন যেন না হয় যে, তাদের মধ্যে উত্তেজনা সৃষ্টি হয় এবং একটি মামুলি বিষয়ের কারণে দেশ ও জাতি উচ্ছন্নে যায়।

আবু জেহেল অট্টহাসিতে ফেটে পড়লো। বললো ঃ লাত উযযার শপথ, আমি জানতাম আপনি অবশ্যই আসবেন। এতে আপনার ভাতিজা ক্ষতিগ্রস্ত হবে। কিন্তু আফসোস! ভাতিজার খেয়াল তো এতটুকু করলেন কিন্তু স্বধর্মের প্রতি তো এতটুকুও সহানুভূতি নেই। আমি জানি, আপনার মনে বেদ্বীনী রোগের অনুপ্রবেশ ঘটেছে। যাক, যাই হোক, আমরা সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছি। আক্রমণ সুনিশ্চিত।

আব্বাস হাশেমী বংশের সন্তান। এতক্ষণে তার মধ্যে গতি সঞ্চারিত হয়ে গেছে। তিনি বলতে লাগলেন, আমি বুঝতাম তুমি দম্ভ ও অহংকারের ফলে আমার কথা কানে তুলবে না, দেশ ও জাতির সর্বনাশ ঘটাবে। কিন্তু আমার অন্তরে দেশ ও জাতির দরদ আছে। আমি আমার দায়িত্ব সম্পাদন করতে এসেছি। তুমি শিকের ভবিষ্যদ্বাণী শুনেছো। তার বাস্তবরূপ দর্শনের ইন্তেজার করো। আব্বাস ক্রুদ্ধ অবস্থায় উঠলেন। আবু জেহেল নরম হয়ে

গেলো। সে বললো, আরে ভাই! বসুন। ক্ষিপ্ত হবেন না। আব্বাস বসলেন না। তিনি বললেন, আমি বলতে এসেছি বলেছি। এবার সময় নষ্ট করে কি লাভ?

তিনি চলে গেলেন। আবু জেহেল বললো ঃ হাশেমীদের দেখলে?

যামআ ঃ দেখেছি। ক্ষুব্ধ হয়ে চলে গেছেন। যেতে দাও। ওদের পরোয়া করো না। এরপর দীর্ঘক্ষণ এরা এ বিষয়ে আলোচনা করলো।

৫
উত্তম উপদেষ্টা

বিকেল বেলা। সূর্যাস্তের আরো চার ঘন্টা বাকি। কুরযের দোতলা বাড়ীতে এক রুমে বসে গল্প করছে কুরয কন্যা রাফিদা, অর্ধাঙ্গিনী নাসিরা। নাসিরা বলছিলেন ঃ (কন্যাকে সম্বোধন করে) তোমার কথাবার্তায় সন্দেহ হচ্ছে, তুমি যেন ইসলামকে সত্যধর্ম বলে মনে করছো। তোমার বাপ যদি জানে তোমার এ মনোভাব তাহলে কি করবে জানো?

রাফিদা ঃ মেরে ফেলবে। তিনি তো আমার পূর্বে অনেক কন্যাকে হত্যা করেছেন। আমাকেও কতল করবেন আর কি?

নাসিরা ঃ কমবখত! তোর যখন জন্ম হয়েছিলো, তখন তোর রূপ দেখে আমি অভিভূত হয়ে পড়েছিলাম। হাজার মান্নত আর বহু খোশামোদ–তোষামোদ করে তোর আব্বুকে বাধ্য করেছিলাম তোকে জীবিত রাখতে।

রাফিদা এখন অপূর্ব সুন্দরী। বেহেশতী হুরের নমুনা। উর্বষী রূপসী গোলগাল চেহারা। বড়ই আকর্ষণীয়া। সুপ্রশস্ত ললাট। ড়াগর চক্ষু। চিত্তহারী চোখের পুতুল। কালো ঘন বক্র ভ্রু। খাড়া নাক। মানানসই ঠোঁটদ্বয়। কামানের ন্যায় ঈষৎ বাঁকা নরম চিবুক। গায়ের রং একেবারে গোধুমী নয়, উজ্জ্বল, কান্তিময়। বয়স আঠার ছুই ছুই।

রাফিদা মুচকি হাসলো। বলল ঃ এর জন্য তো আমি কৃতজ্ঞ। তবে আন্তরিক ধ্যানধারণা অন্তরে জন্ম নেয়। এ ব্যাপারে আমার করণীয় কি?

নাসিরা ঠাণ্ডা শ্বাস নিয়ে বললো ঃ হাঁ, তুমি আর করবে কি? কুরাইশে বরং তাদের মধ্যেও অভিজাত বংশ হাশেমী খান্দানে মুহাম্মাদের জন্ম হয়েছে। সে পিতাকে পুত্রসন্তান হতে, ভাইকে ভাই থেকে, স্বামীকে স্ত্রী হতে, বোনকে ভাই থেকে, ভাইকে বোন থেকে, কন্যাকে পিতা হতে, বন্ধুকে বন্ধু হতে পৃথক করে দিয়েছে। জানিনা সে কি যাদু করে। যেই তার ধর্ম গ্রহণ করে, না থাকে তার সাথে তার পৈতৃক ধর্মের কোন সম্পর্ক, না আত্মীয়–স্বজন, দোস্ত–আহবাবদের সাথে কোন যোগসূত্র। সবার সে হয়ে উঠে দুশমন।

রাফিদা ঃ ব্যাপারটা এরূপ নয় আম্মু! আসলে যারা মুসলমান হন তারা কারো দুশমন হন না। অন্যরাই তাদের শত্রু হয়ে উঠে।

নাসিরা ঃ দুশমন ঠাওরাবে না কেন? তারা আমাদের উপাস্যদের মন্দ বলতে আরম্ভ করে। অথচ শত শত বৎসর থেকে আমাদের মুরুব্বীরা এসব উপাস্যের পূজা–অর্চনা করে আসছেন।

রাফিদা মুচকি হাসলো। বললো ঃ আম্মাজান! খারাপ মনে না করলে আমি একটা কথা বলতে পারি।

নাসিরা ঃ বলে ফেল কি বলবি। খারাপ মনে করলেও বা কি তোকে মেরে ফেলতে পারবো? একে তো তুই আমার দুষ্টু মেয়ে, দ্বিতীয়তঃ তুই হচ্ছিস আমার আদরের দুলালী।

রাফিদা ঃ আমি জিজ্ঞেস করছি, এসব মূর্তি আসলে কি?

নাসিরা ঃ খোদা! আবার কি?

রাফিদা ঃ খোদা? নাকি.....।

নাসিরা ঃ হাঁ, হাঁ, খোদা।

রাফিদা ঃ এবার চিন্তা করুন, প্রতিটি গোত্রের খোদা আলাদা আলাদ। আশ্চর্য আশ্চর্য রূপ এক এক খোদার। নায়েলা নারীরূপী। ইয়াগুছ সিংহরূপী। ইয়াউক অশ্বরূপী। নাসর গাধারূপী। তাছাড়া লাত, উযযা, সুহাইলের রূপও স্বতন্ত্র। তাহলে কি এসবই খোদা?

নাসিরা ঃ পাগলী বলিস কি? এগুলো সবই খোদা।

রাফিদা ঃ তার মানে যেন প্রতিটি গোত্রের স্বতন্ত্র খোদা। প্রতিটি খোদার রূপও আলাদা।

নাসিরা ঃ হাঁ, তাতে অসুবিধা কি? এতে দোষের কি আছে?

রাফিদা ঃ ভাল–মন্দ তুমি বলবে। তবে বলতো এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড কে সৃষ্টি করেছেন?

নাসিরা ঃ দুষ্ট কোথাকার, আমি এসব উল্টাসিধা প্রশ্নের উত্তর দিতে পারবো না।

রাফিদা ঃ আম্মু! আমায় ক্ষমা করো। জবাব দিবেই বা কিভাবে? এরা সবাই যদি বিশ্বস্রষ্টা হতো, তাহলে তাদের মধ্যে পরস্পরে বিরোধ হতো না?

নাসিরা ঃ ঝগড়া–বিবাদ হবে কিভাবে?

রাফিদা ঃ কেউ বলতো, আমি এ স্থানকে বালুকাময় মরুভূমি বানাবো। কেউ বলতো, না সমুদ্র বানাবো। কেউ বলতো, মরুভূমিও নয় সমুদ্রও নয়; বানাবো পাহাড়। কেউ বলতো, তোমরা অজ্ঞ, এখানে শষ্য শ্যামল এলাকা তৈরী করবো। এসব বিষয়ে কি ঝগড়া হতো না?

নাসিরা ঃ জানিনা। তুই কোত্থেকে এসব মাথায় ঢুকিয়েছিস।

রাফিদা ঃ এবার তোমাকেও এসব বিষয় ভেবে দেখতে হবে। আগে বলো ঝগড়া হতো কিনা?

নাসিরা ঃ হাঁ, সম্ভব তো অবশ্যই।

রাফিদা ঃ গম্ভীরভাবে ভেবে দেখো তো আম্মি! এতো খোদা আমাদেরই দেশে কেন এলো?

নাসিরা ঃ পাগলী তুই আমার দেমাগ খারাপ করবি। অবশেষে তোর মতলবটা কি?

রাফিদা ঃ আমার উদ্দেশ্য খোদা একজনই হয়, সহস্র নয়। বাস্তবে সৃষ্টিকর্তা একজনই। অদৃশ্য তিনি। আজ পর্যন্ত এ ধরায় কেউ তাকে দেখেনি। তিনি এত সুন্দর যে, পৃথিবীর কোন মানব চোখই তাকে (এ জগতে) দেখতে সক্ষম নয়। এই নিখিল বিশ্ব ও এর সব কিছুই তার সৃষ্টি। উপাসনার যোগ্য একমাত্র তিনিই। মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তারই রাসূল। তিনি পৃথিবীতে আগমন করেছেন বিশ্ববাসীকে ভ্রান্ত পথ থেকে পথের সন্ধান দিতে, গোমরাহী থেকে মুক্তি দিতে। যে তার বাণীর প্রতি আস্থা ও বিশ্বাস স্থাপন করবে সেই মুমিন—সেই মুসলমান। যারা মুসলমান হয় তারা প্রস্তর মূর্তিকে এমন অক্ষম বস্তুই মনে করে যা কারো কোন উপকার অপকার কিছুই করতে পারে না।[১]

নাসিরা ঃ তাহলে তাদেরকে দেব-দেবী কেন বানানো হয়েছে? এর মানে কি আমাদের মুরুব্বীরা বেওকূফ ছিলেন?

রাফিদা ঃ এর বিবরণ শুনুন। আমার উস্তাদ যিনি আমাকে লেখাপড়া শিখিয়েছেন, তার নাম তো মনে আছে? যায়দ ইবন আমর। তিনি একদিন আমাকে বলেছিলেন ঃ এখন থেকে প্রায় ৪০০ বৎসর পূর্বে হেজাযের সম্রাট ছিলেন আমর ইবন তাই ইবন হারিসা ইবন ইমরাউল কাইস। 'হুবল' নামক একটি মূর্তি তিনিই প্রতিষ্ঠা করেছিলেন কাবা ঘরের ছাদে। যমযমের নিকট স্থাপন করেছিলেন 'ইসাফ' ও 'নায়েলা' নামক দুটি প্রতিমা। জনগণকে উৎসাহিত করেছিলেন এগুলোর পূজা করতে। সম্রাটের সন্তুষ্টি অথবা ভয়ে লোকজন এগুলোর উপাসনা করতে আরম্ভ করে। তারপর ক্রমশঃ যখন এগুলোর প্রতি আস্থা জমলো তখন প্রতিটি গোত্র তাদের জন্য স্বতন্ত্র উপাস্য তৈরী করে নিলো। এক গোত্র অপর গোত্রের দেব-দেবীর পূজা করতো না। এভাবেই প্রত্যেক গোত্রের আলাদা আলাদা প্রতিমা-মূর্তি তৈরী হয়ে গেলো।

টীকা ঃ ১. তারীখে ইসলাম ঃ আকবর শাহখান নাজীবাবাদী—১/৬০।

নাসিরা ঃ তুই মুসলমান হয়ে যাসনি তো?

রাফিদা ঃ আমি সুস্পষ্ট ভাষায় বলছি, আম্মি! তুমি আমাকে মুসলমান হতে বলছো?

নাসিরা ঃ তুই দেখি আমার আকীদা-বিশ্বাসও খারাপ করে দিলি। যা এবার তুই চুপ কর। যে বিষয়ে বকবক করছিস ওগুলো বাদ দে। রুমে যেয়ে আরাম কর।

রাফিদা ঃ অহো! সময়ের কথা খেয়ালই নেই। কথায় কথায় সময় কাটালাম। তৎক্ষণাৎ সে উঠলো। পানির পাত্র একটি নিয়ে রুমে প্রবেশ করলো। প্রথমে ওযু করলো। তারপর চুপিসারে তাকিয়ে দেখলো আম্মু কি করছেন। নাসিরা তখন বারান্দায় কাজে ব্যস্ত।

রাফিদা পিছনে সরে একটি কাপড় বিছিয়ে নামায আরম্ভ করলো। সে ইসলাম গ্রহণ করেছিলো। কিন্তু তার মাতাপিতা এই সংবাদ জানে না। সে জলদি নামায পড়ে নিলো। দু'আ করলো। অতঃপর নিচে চলে এলো। এখনো সে সিঁড়িতে। শুনলো তার মাতাপিতা আলাপ করছে। নাসিরা বলছে ঃ রাফিদা তো আজকাল নিজ থেকে যুক্তিতর্কের অবতারণা করে কথা বলতে শিখেছে।

কুরয ঃ কিরূপ কথা?

নাসিরা ঃ সে বলে এসব মূর্তি ইত্যাদি নাকি খোদা নয়।

কুরয ঃ উত্তেজনায় খেকিয়ে উঠে। কি বলে?

রাফিদা তখন সংযত। তার জানা আছে, তার পিতা পাষণ্ড, বড় জালেম।

নাসিরাও ভীত সন্ত্রস্ত। সে তাকিয়ে দেখছে কুরযের চেহারা। ক্রোধে তার চেহারা লাল হয়ে উঠেছে। চোখগুলো যেন বেরিয়ে পড়ছে। নাসিরা বললো ঃ তওবা, তুমি আমাকে ভীত সন্ত্রস্ত করে তুললে?

কুরয ঃ এটা কি ভীত সন্ত্রস্ত হবার মত বিষয় নয়? সে অনুরূপ কথা বলেছে?

নাসিরা এবার কথা পাল্টে বললেন ঃ তার বিশ্বাস এটা নয়। বলছিলো আর কি মুসলমানরা এরূপ বলে।

কুরয ঃ আরে মেয়েটা তোমার আদরের দুলালী। বলেছিলো এসব মূর্তি খোদা নয়? খোদা অদৃশ্য? কেউ তাকে দেখেনি? দুনিয়াতে দেখতে পাবেও না? কোথায় রাফিদা?

নাসিরা সংযত হয়ে গেলেন। কারণ, কুরয এখন অবশ্যই তাকে ডেকে এসব জিজ্ঞেস করবে। আর রাফিদা তো মিথ্যা বলার মতো মেয়ে নয়।

তাহলে কি কিয়ামতই না ঘটে যায় তা আল্লাহই জানেন। সর্বনাশ! তাই তিনি বললেন ঃ রাফিদা হাতীমে কাবায় গেছে। এখানে নেই।

হাতীম কাবা ঘরেরই একটি অংশ ছিলো। (পরে সেটাকে বাইতুল্লাহ থেকে বাদ দেয়া হয়েছে।)

কুরয ঃ তার প্রতি খেয়াল রেখো। অসতর্কতা বশতঃ সে যদি বেদ্বীন হয়ে যায় তাহলে গোটা হেজাযে আমার নাক কান কাটা যাবে।

নাসিরা ঃ তুমি দৃঢ়বিশ্বাস রেখো সে বেদ্বীন হবে না।

কুরয ঃ আমি তাকে ডেকে জিজ্ঞেস করবো।

নাসিরা ঃ এখন নয়। মদীনা থেকে ফিরে এসে জিজ্ঞেস করলেই হবে।

রাফিদা সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে মা-বাবার এই সংলাপ এতক্ষণ শুনছিলো। এরপর নীরব পদক্ষেপে সে দোতলায় চলে গেলো।

৬
পাষণ্ড পিতা

সূর্যাস্তের পরপরই কুরয বাইরে বেরিয়ে গেলো। রাফিদা মাগরিবের নামায রুমে আদায় করলো। নামায শেষে এল সিঁড়িতে। গোপনে বাপের সংবাদ নিলো। নাহ! কোন সাড়া শব্দ নেই। তাই সে নীচে নেমে এলো। নাসিরা তখনও আঙ্গিনায় বসে আছে। রাফিদাকে দেখেই মা নাসিরা বলে উঠলেন, রাফিদা! আমি একটি ভুল করে ফেলেছি। রাফিদা যদিও পূর্বেই জেনে গেছে কোন ভুলের প্রতি আম্মু ইঙ্গিত করতে চাচ্ছেন, তা সত্ত্বেও শুধালো, কি ভুল হয়েছে আম্মু?

নাসিরা ঃ তুই যখন উল্টা সিধা কথাবার্তা বলছিলি, তখন এসে গেছিলেন তোর আব্বা। আমার বেওকুফী হয়ে গেছে। মুখ থেকে অলক্ষ্যে বেরিয়ে গেছে, রাফিদা বলে ঃ মূর্তি দেবতা নয়। এটুকু শুনেই তিনি ক্রোধে ফেটে পড়েছেন, উত্তেজনায় ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেছেন। তিনি জিজ্ঞেস করেছেন, রাফিদা কোথায়? আমি মিথ্যা বলেছি, সে হাতীমে গেছে।

রাফিদা ঃ আম্মু! তুমি ভালই করেছো। আব্বুর কানে কথা তুলে দিয়েছো। হয়তো তিনিও ভাববেন। পরিণতিতে পেতে পারেন সরল পথের সন্ধান।

তার কথায় নাসিরা হতভম্ব। বিস্ময়ের দৃষ্টিতে তাকিয়ে তাকে বললো ঃ সঠিক পথে এসে যাবেন মানে? মুসলমান হয়ে যাবেন?

রাফিদা ঃ হাঁ।

নাসিরা ঃ উযযা তোর প্রতি সদয় হোন। তুই কি মুসলমান হয়ে গেছিস?

রাফিদা দৃঢ়চিত্তে দৃপ্তকণ্ঠে বললো ঃ আম্মু! মার আর ছাড় আমি ইসলামের ছায়ায় আশ্রয় গ্রহণ করেছি। একেবারে সুনিশ্চিতভাবে। এ কথা শুনে যেন নাসিরার কলিজায় মুষ্টাঘাত পড়লো। দু'হাতে মাথা ধরে তিনি বসে গেলেন। রাফিদা নাসিরার দিকে তাকিয়ে রইলো। তার ধারণা ছিলো আম্মু বিগড়ে যাবেন। কিন্তু না। নাসিরা বিগড়ায়নি। মুখে টু শব্দটিও করেনি। চুপচাপ বসে রইলো। রাফিদা তার কাছে যেয়ে বসলো। মাকে জিজ্ঞেস করলো, আম্মু! আমি কি ভুল করেছি?

নাসিরা ধীরে ধীরে মাথা থেকে হাত আলাদা করে রাফিদার দিকে তাকালো। চেহারায় তার আশংকা ও উদ্বেগের ছাপ সুস্পষ্ট। রাফিদা! তুই এ কথা শুনানোর পূর্বে যদি আমার বুকে বর্শা বিদ্ধ করে দিতি, তাহলে মোটেও আমার কোন দুঃখ হতো না। এ কি করলি তুই?

রাফিদা ঃ আমি এমন একটি কাজই করেছি যা করা প্রয়োজন প্রতিটি সমঝদার ব্যক্তির। আমি শিরক ও গোমরাহীর পথ ত্যাগ করেছি। একত্ববাদের আঁচলে আশ্রয় নিয়েছি। সে নাসিরার গলায় বাহু জড়িয়ে বললো ঃ আম্মু! ভেবে দেখতো, আমরা মূর্তিপূজা করছি, তাদের উপাস্য মানছি, তাদের কাছে প্রার্থনা করছি। অথচ এ মুর্তিগুলো কি শোনা ও দেখার কোন ক্ষমতা রাখে? এগুলো কি নড়াচড়াও করতে পারে? কিছু দিতে পারে? আমাদের মুরুব্বীরা ওগুলোকে যেখানে স্থাপন করেছেন সেখানেই তো ওগুলো পড়ে আছে। যেখানে তারা উঠিয়ে রাখে ওগুলো সেখানেই পড়ে থাকে। এগুলো আবার খোদা হয় কি ভাবে? খোদা তো তিনি যিনি সর্বময় ক্ষমতাশীল ও অদৃশ্য।

নাসিরা ঃ পাগলী মেয়ে! তুই বলিস খোদা সর্বময় ক্ষমতাশীল অথচ অদৃশ্য। কিন্তু অন্য এমন কোন বস্তু কি আছে যেগুলো বিদ্যমান কিন্তু দৃশ্যমান নয়?

রাফিদা ঃ আম্মু! তুমি তো প্রায় সময় খেজুর বাগানে যাও। সেখানে উন্মুক্ত ফুল দেখ। ফুলের ঘ্রাণ মোহিত করে। কিন্তু ঘ্রাণ কি কখনো দৃশ্যমান হয়?

নাসিরা ঃ আমি তোর সাথে বহস করতে চাই না। তুই তোর বাপকে চিনিস না? তোর বাপ যদি এসব জানে তাহলে তোকে জিন্দা ছাড়বে না।

রাফিদা ঃ আমি জানি। আমার পিতা বড়ই পাষণ্ড। আমার কতগুলো বোনকে তিনি হত্যা করেছেন, জীবন্ত পুঁতে ফেলেছেন। আমাকেও তিনি মেরে ফেলবেন আর কি?

তৎকালীন সময় অর্থাৎ, সর্বশেষ রাসূল, মানব জাতির গর্ব হযরত

মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রেরিত হবার পূর্বে আরবরা কন্যাদের জন্মের সময়ই মেরে ফেলতো। অথবা যখন মিষ্টি মিষ্টি কথা বলতে শুরু করতো তখন জীবন্ত পুঁতে ফেলতো। এরূপ পাশবিক নির্যাতনমূলক কাজ করে আবার বুক ফুলিয়ে গর্ব করতো। খুব কম লোকই কন্যা সন্তানকে জীবিত রাখতো। অনেক সময় এরূপ হতো যে, যখন দেখতো কন্যা সন্তান প্রসব হচ্ছে তখনই দাঈকে টাকা পয়সা দিয়ে রাজী করিয়ে নিতো যে, তুমি বলবে, সন্তান মৃত হয়েছে। তাই মাটিতে পুঁতে ফেলা হয়েছে। এই কৌশলে কোন প্রতিপালনকারিণী নারীর কাছে সে কন্যা সন্তানটিকে সোপর্দ করতো। সে তার প্রতিপালনের দায়িত্ব নিতো।

নাসিরা ঃ তোর তো দেখছি মৃত্যুর ভয় নেই।

রাফিদা ঃ আম্মু! মৃত্যু তো অবশ্যম্ভাবী। একদিন তা অবশ্যই আসবে। জীবন আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে আমানতস্বরূপ।

নাসিরা ঃ তুই ভেবেছিস কেন তোকে এত স্নেহ করি?

রাফিদা ঃ আমি তোমাদের ভালবাসি আম্মু! এজন্য তোমরা আমায় স্নেহ করো।

নাসিরা ঃ এটা সত্য। আমি জানি তুই আমাকে ভালবাসিস। বেটি! আমার কথা শোন। ইসলাম ফিসলাম ছেড়ে দে।

রাফিদা ঃ আম্মু! আমি তোমাদের যে কোন হুকুম তামিল করতে দু'পায়ে খাড়া। এমনকি জান পর্যন্ত দিতে প্রস্তুত। তবে...।

নাসিরা ঃ ইসলাম ত্যাগ করতে পারবি না?

রাফিদা ঃ ইসলাম ত্যাগ করার বস্তুই নয়।

নাসিরা ঃ বেটি! জানিনা, এটা কিসের সাজা আমি ভুগছি। বস্তুতঃ আমি সে পরিবার নিয়ে হাসি ঠাট্টা করতাম যে পরিবারের কেউ মুসলমান হয়েছে। পরিবারের লোকজন তাকে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করতো। আমি বলতাম, এটা কেমন বেওকুফ যে মুসলমান হলো। আমি ঘুর্ণাক্ষরেও জানতাম না এই মহামারী আমার ঘরেও প্রবেশ করবে। "কি মহামারী?" বলে অকস্মাৎ ভয়ংকর চিৎকার করে উঠলো কুরয। আওয়াজ শুনে নাসিরা রাফিদা উভয়ই সংযত হয়ে গেলো।

কুরয কাছে এসে পুনরায় জিজ্ঞেস করলো, কিরূপ মহামারী আমার ঘরে প্রবেশ করেছে?

নাসিরা ঃ তোমার এই আদরের দুলালী রেশমী কাপড় এনে দেয়ার বায়না ধরেছে।

কুরয ঃ আমাকে বিভ্রান্ত করো না। জীবনের এতটুকু সময় অতিক্রম করে

এসেছি অনর্থক? সত্য করে বলো কি হয়েছে?

নাসিরা ঃ কিছু হলেই তো বলতে পারবো।

কুরয ঃ ভালো দামী কাপড়ের বায়না কখনো মহামারী নয়। আসল কথা তুমি লুকাচ্ছো কেন?

নাসিরা ঃ তোমার কাছে আমি কোন কথা গোপন রাখি?

কুরয ঃ কন্যার প্রতি স্নেহ-মমতাই তার বেদ্বীনীর উপর আবরণ ফেলতে তোমাকে বাধ্য করেছে। ব্যাপারটা তাই নয়? নাসিরার চেহারা একদম ফ্যাকাশে হয়ে গেলো। চোর ধরা পড়লে যেমন তার চেহারা বিবর্ণ হয়ে যায় ঠিক তেমনি অবস্থা। নিঃশ্বাস যেন তার সরছে না। কুরয গর্জন করে উঠলো, ব্যাপারটা তাই নয় কি?

নাসিরা ঃ না।

কুরয ঃ মিথ্যে বলো না।

নাসিরা ঃ তোমার সাথে আমি কখনো মিথ্যে বলেছি?

কুরয রাফিদার দিকে ইঙ্গিত করে বললো ঃ যাকে লালন পালন করে এত বড় করেছো তার খাতিরে মিথ্যে বলা যায়। শোন নাসিরা! যদি আমার নাক কেটে থাক, তাহলে এর কুখ্যাতি ছড়িয়ে পড়ার পূর্বে আমার নাক কর্তনকারীর নাক কি আমি কেটে ফেলবো না? রাগ ও ক্ষোভের আতিশয্যে ঝাপিয়ে পড়লো সে আপন কন্যার দিকে। রাফিদার নম্র ও স্পর্শকাতর হাত তার লৌহ পাঞ্জায় শক্ত করে ধরে চিৎকার করে শুধালো রাফিদা। সত্য কথা বল, তুই কি বেদ্বীন হয়ে গেছিস?

রাফিদার চেহারায় অটলতার ছাপ সুস্পষ্ট। প্রতিউত্তর করলো সে দৃঢ়চিত্তে—বেদ্বীন হইনি আমি, সত্য ধর্ম গ্রহণ করেছি।

কুরয ঃ ক্রোধ ও ক্ষোভে কাঁপছিলো আর বলছিলো ঃ তুই মুসলমান হয়েছিস?

রাফিদা ঃ হাঁ।

হাঁ, বলতেই কুরয সজোরে এক চপেটাঘাত করলো তাকে। কুরযের পাঁচটি আঙ্গুলই রাফিদার গণ্ডদেশে বসে গেলো। সহস্র তারা যেন নর্তন-কুর্তন করতে লাগলো তার সামনে। কুরয রাফিদার আরেক গালে মারলো আরেক থাপ্পর। সেটি প্রতিহত করলো সে তার এক হাত দিয়ে। ভেঙ্গে গেলো তার হাতের কয়েকটি চুড়ি। একটি চুড়ি বিদ্ধ হলো কুরযের হাতে। গোস্বা তার আরো বৃদ্ধি পেলো। রাগে উন্মত্ত হয়ে ধরলো রাফিদার সুগন্ধিযুক্ত চুলের মুঠি। ধমাধম ঘুষি মারতে আরম্ভ করলো তাকে। রাফিদা বড় ঘরের ষোড়শী যুবতী সন্তান। সে কাঁপতে লাগলো। মুখ থেকে তার আপনা আপনিই বেরিয়ে এলো

'ইয়া আল্লাহ!'

মুশরিক কাফির কুরযের ক্রোধ আরো বেড়ে গেলো। সে বলে উঠলো, কমবখত নির্লজ্জ মেয়ে কোথাকার! এটাই সে বাক্য যা কোন আত্মমর্যাদাশীল আরব কখনো বরদাশত করতে পারে না—শুনতে পারে না। এতো আমাদের উপাস্যগুলোর অবমাননা। হয়েছে তোর আচ্ছা শায়েস্তা! দেমাগ খারাপ হয়েছিলো তোর। এবার দুরস্ত হয়েছে কি না? বল, বেদ্বীনী থেকে তওবা করেছিস কি না?

রাফিদা ঃ প্রিয় আব্বু! না।

না বলতেই নির্দয় কুরয পুনরায় তাকে জমিনে আছাড় মারলো। এবার যেন রাফিদার আত্মাই বেরিয়ে গেলো।

নাসিরা এই অবস্থা দেখে উন্মাদের ন্যায় সে মৃতপ্রায় রাফিদাকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে লাগলো। বলতে লাগলো ঃ হায় আমার আদরের সন্তান! কলিজার টুকরা কন্যা!

কুরযের গোস্বা থামেনি। আরো বৃদ্ধি পাচ্ছে। নাসিরার হাত ধরে সে ধাক্কা মারল। সে ছিটকে পড়লো গিয়ে দূরে। কুরয খঞ্জর বের করলো। ঝাপটে ধরলো তাকে জবেহ করার জন্য। নাসিরা এই কিয়ামত দেখে দৌড়ে এসে চিৎকার করে কাঁদতে লাগলো। বলতে লাগলো, আমার স্বামী! আমার মাথার মুকুট! আমার প্রতি তুমি দয়া করো। রাফিদার মৃত্যুর আগেই আমি মরে যাবো। কুরয তাকে সরিয়ে দিতে দিতে বললো, যা তুই সরে যা। কোন পরোয়া নেই তুইও মরে যা। খোশামোদ-তোষামোদ করে করে তুই একে জিন্দা রেখেছিস বেদ্বীন হয়ে আমার নাক কান কাটানোর জন্য।

নাসিরা ঃ আমার একটি আরয শোনো।

কুরয ঃ কি?

নাসিরা ঃ এখন সে বেহুঁশ। এ অবস্থায় তাকে মেরে পরে অনুতপ্ত হবে। হুঁশ ফিরলে হয়তো সে তওবা করে ফিরে আসতেও পারে।

কুরয ঃ কি বলছিস তুই। আমার জানা নেই, যারা মুসলমান হয় তারা আর কখনো স্বধর্ম ত্যাগ করে ফিরে আসে না। বদবখত মুসলমান খোদাই জানে কি যাদু করে। ইসলাম গ্রহণের পর মার খেয়ে খেয়ে মরে যায় কিন্তু ইসলাম ছাড়ে না।

নাসিরা ঃ দেখো রাফিদা একেবারে বেহুঁশ বা মরেই গেছে। মৃত্যুই যদি হয়ে থাকে তাহলে আর জবেহ করে লাভ কি? জীবিত থাকলে আমি তাকে বুঝাবো। যদি সে অগত্যা নাই মানে, জিদ ধরে অটল থাকে, তাহলে তখন জবেহ করে ফেলো যাও।

কুরয ঃ আচ্ছা যাও। এবার তোমার কথা মঞ্জুর করলাম। আমি যেয়ে উপরে শোব। তুমি এর দেখাশোনা করো।

এ কথা বলেই কুরয যেয়ে বাড়ীর দোতলায় শুয়ে পড়লো। বিলাপরত অবস্থায় নাসিরা রাফিদার দেহের উপর ঝুকে পড়ে রইলো।

৭

কন্যার প্রতি স্নেহ-মমতা

নাসিরা দেখলো, রাফিদা বেহুঁশ। দীর্ঘক্ষণ পর পর শ্বাস আসছে। নাসিরা প্রথমে হাত দিয়ে চেক করলো। তারপর তার বুকের উপর কান রাখলো। তার দৃঢ় বিশ্বাস হলো রাফিদা জীবিত আছে তবে মৃতপ্রায়। চিৎকার করে সে কাঁদতে লাগলো। কুরয উপর তলা থেকে মাথা উঁচিয়ে দেখলো। বললো ঃ মরে গেছে? পাপ মোচন হয়েছে?

নাসিরা ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে আর বলছে, মরেনি, মরবে। তুমি কি করলে? আমার ১৮ বৎসরের কামাই তুমি শেষ করে দিলে?

কুরয ঃ তুমি আহমক! এই সাপটিকে কেন জীবিত থাকতে দিলে? ভালই হয়েছে। সে তার ইসলাম গ্রহণের কথা ফাঁস করে দিলে আমার চেহারা কলংকিত হতো। চোখ মেলে দাঁড়াতে পারতাম না। মাথা নত করে বাঁচতে হতো।

মনের ব্যথায় নাসিরার দিল ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেছে। সুন্দরী যুবতী মেয়ে তারই সামনে মৃতের ন্যায় পড়ে আছে। স্বামীর প্রতি তার মনে প্রচণ্ড ঘৃণা পুঞ্জিভূত হয়েছে। নিজের জীবনকে অসার মনে হচ্ছে। ঝাঁঝালো কণ্ঠে বললো ঃ তুমি রাফিদাকে কখনো ভালবাসোনি। তোমার স্নেহ-মমতা থেকে আজীবন সে বঞ্চিত। আর সর্বশেষ আজ তাকে মেরেই ফেললে। এবার কলজে ঠাণ্ডা হয়েছে তো? মুখ উজ্জ্বল হয়েছে তো? এবার তো মাথা উঁচু করে চলতে পারবে। সহপাঠী সহকর্মীদের সাথে চোখ মিলাতে পারবে।

কুরয ঃ নাসিরা! আমি রাফিদাকে স্নেহ প্রদর্শন করতে চেয়েছিলাম ; কিন্তু করতে পারিনি। সে এরূপ সুন্দরী যুবতী ছিল যে, যে কারো স্নেহের দৃষ্টি সে কেড়ে নিতো। কিন্তু তাকে দেখলেই আমার মনে আত্মমর্যাদাবোধ মাথা চাড়া দিয়ে উঠে। যখন মনে পড়ে তার ফলে কেউ আমার জামাতা হবে তখন আমি লজ্জায় মরে যাই। নাসিরা! তুমি জান, আমি কিরূপ আত্মমর্যাদাবোধসম্পন্ন লোক। এটাকে আমি কিভাবে বরদাশত করবো?

তৎকালীন যুগে আরবদের মধ্যে এই বর্বরতা ও মূর্খতা কাজ করছিলো।

তারা কাউকে নিজের জামাতা বানাতে পছন্দ করতো না। এটাকে নিজের আত্মমর্যাদা পরিপন্থী কাজ মনে করতো। ফলে কন্যা সন্তানদের তারা হত্যা করতো। জীবিত রাখতো ছেলেসন্তানদের।

নাসিরা বললো ঃ বোধ হয় তোমার নানা আত্মমর্যাদাবোধসম্পন্ন ছিলেন না। এজন্য তোমার মাকে জীবিত রেখেছিলেন। তাকে বিয়ে দিয়েছিলেন। তোমার বাপকে বানিয়েছিলেন আপন জামাতা। তার ঔরস থেকে তোমার জন্ম হয়েছে। ভেবে দেখো, গোটা আরব যদি তোমার ন্যায় আত্মমর্যাদাবোধ সম্পন্ন (?) হয়ে যায় তাহলে তাদের বংশ পরিক্রমা টিকে থাকবে কিভাবে? আহ! তুমি যদি তাকে স্নেহ দান করতে! তার যৌবনের প্রতি দয়া প্রদর্শন করতে?

কুরয ঃ বকবক করো না। এটা মরে গেলে প্রতিবেশীদের কিছু দিয়ে মাটিতে পুঁতে ফেলো। আমাকে ঘুম থেকে জাগাবে না। আর যদি বেঁচে যায় তাহলে সকালে তার খবর নিবো। তাকে জিন্দা রাখা আমার বরদাশত হয় না। কমবখত অসভ্য মুসলমান হয়েছে। মনে চায় নিচে এসে তাকে টুকরো টুকরো করে ফেলি। তবে তোমার মনে আর বেশী কষ্ট দিতে চাই না।

নাসিরা ঃ না। তোমার মনের এই আশাটুকুও পূরণ করে যাও। রাফিদা এবং আমাকে উভয়কেই টুকরো টুকরো করে যাও। আর বন্ধু-বান্ধবদের যেয়ে বুক ফুলিয়ে বলবে, আমি আমার স্ত্রী-কন্যা দুটোকেই জবাই করে এসেছি।

কুরয ঃ আমি তাও করতাম। কিন্তু লোকজন সামনে না হলেও পেছনে বলবে, 'বোধহয় স্ত্রী কন্যা দুটোই ইসলাম গ্রহণ করেছিলো। এজন্য উভয়কে হত্যা করেছে।' এই অবমাননা আমার পক্ষে অসহনীয়। কন্যা হত্যা করেছি সমাজে এই সংবাদ ছড়িয়ে পড়বে। জনগণ আমার প্রশংসা করবে। আমার প্রতি সুদৃষ্টিতে তাকাবে। আমার আত্মমর্যাদাবোধের তারিফ করবে।

নাসিরা ঃ তোমার আত্মমর্যাদাবোধের ঢোল পেটাও। লোকজন দিয়ে প্রশংসা করাও। কিন্তু এই মেয়ের লাশও সাথে নিয়ে ঘুরো। যাতে সমাজ এই নিষ্পাপ রূপসী সন্তানটিকেও দেখে এবং তোমার নির্দয়তার উপর লানত দেয়।

কুরয ঃ কন্যার মায়া তোমার দেমাগ খারাপ করে দিয়েছে। এই বলে সে পিছে সরে বিছানায় যেয়ে ধরাস করে পড়লো। অল্প কিছুক্ষণের মধ্যে তার নিদ্রা এসে গেলো। একেবারে নাক ডাকতে আরম্ভ করলো। যেন কিছুই হয়নি।

নাসিরা এখান থেকে উঠে যেয়ে একটি কাঠের পেয়ালায় করে সামান্য পানি আনলো। রাফিদার চোখে মুখে ছিটিয়ে দিলো। মুখে দিলো পানি। আর একটু একটু করে নাড়াচাড়া দিতে আরম্ভ করলো।

চন্দ্র তখন উদিত হয়েছে। চাঁদের স্নিগ্ধ আলোর চাঁদর চতুর্দিকে বিছিয়ে আছে। রাফিদার চেহারার উপর চন্দ্রালোক চুমু খাচ্ছে। নাসিরা ভাবছে আরব কত নিকৃষ্ট দেশ—যেই দেশে মেয়েদের কোন স্থান নেই। কন্যাদের জীবন্ত কবর দেয়া হয়। নির্দয়ভাবে তাদের হত্যা করা হয়। একটি মেয়ে মারা গেলে একটি কুকুর মারা যাওয়ার সমানও আফসোস হয় না। এ দেশে নারীর কোন সম্মান নেই, কদর নেই। নারী জাতির এ অসহায়ত্বের জন্য নাসিরা আপন মনে কাঁদছে। অঝোর ধারায় চোখের অশ্রু ঝরছে।

কাঁদতে কাঁদতে অর্ধ রাত হয়ে গেলো। রাফিদা তখন একটু যেন নড়াচড়া দিতে লাগলো। নাসিরার দেহে যেন প্রাণ সঞ্চারিত হলো। ক্ষীণকণ্ঠে ডাক দিলো, রাফিদা!

রাফিদা চোখ খুললো। পানি চাইলো। নাসিরা তাকে পানি পান করালো। দৌড়ে গেলো দুধ আনতে। রাফিদা স্বস্থানে পড়ে রইলো। কিছুক্ষণের মধ্যেই সে দুধ হাজির করে বললো ঃ রাফিদা! নে, তাড়াতাড়ি একটু পান কর। রাফিদা দুধ পান করলো। ক্রমশঃ তার গায়ে একটু শক্তির সঞ্চার হলো। এতক্ষণ সে ছিলো জমিনে শায়িত। এবার খুব কষ্টে উঠে বসলো। বসেই বললো ঃ আব্বু কোথায়? নাসিরার মনে কিছুটা স্বস্তি এলো। সে বললো ঃ বেটি! তুই তোর আব্বুকে ভালবাসিস কিন্তু তোর প্রতি তার কোন স্নেহ-মমতা নেই। তোর এক দশমাংশ মায়া-মমতাও যদি তার অন্তরে থাকতো! আহ! তোর আব্বু শুয়ে আছেন।

রাফিদা ঃ আমি জানি তিনি আমাকে ভালবাসেন না। আমার প্রতি তার বরং ঘৃণা রয়েছে। সুনজরে তিনি আমাকে দেখেন না। আমি তার সেবা করে স্নেহ-মমতা অর্জন করতে চেষ্টা করেছি। ব্যর্থ হয়েছি আমি। আমি আব্বুকে ভালবাসি। আমৃত্যু আমার এই ভালবাসা থাকবে। তিনি আমার জনক।

নাসিরা ঃ আহ! বাপ যদি কথা শুনতেন, দেখতেন যে আব্বুর প্রতি কন্যার কি দরদ ও মায়া .....!

রাফিদা ঃ আম্মু! আমি তার নিকট আমার অবদান জাহির করতে চাই না।

নাসিরা ঃ কি আদুরে কন্যা! হায়! তুই যদি এরূপ দেশে জন্মগ্রহণ করতি, যেখানে কন্যাদের কদর করা হয়। কিন্তু আমি শুনেছি কোন দেশেই নাকি কন্যা, জায়া, জননীর কোন মূল্য নেই, সম্মান নেই।

রাফিদা ঃ আমার মন বলছে, ইসলামে নারীদের ইযযত হবে। ইসলাম মাতৃজাতিকে সম্মানের উচ্চাসন প্রদান করবে।

নাসিরা ঃ তুই এখনো ইসলামের উপর অটল?

রাফিদা ঃ আমৃত্যু অটল থাকবো আম্মু!

নাসিরা ঃ তাহলে ভেবে দেখ, তোর জীবন শুধু এই রজনীটুকু। সকালে তোর আব্বা তোকে জিজ্ঞেস করবেন, তুই বে-দ্বীনী ত্যাগ করেছিস কি না? না সূচক উত্তর দিলে নিশ্চিত তোকে জবাই করেই ফেলবে।

রাফিদা ঃ জীবনের পরোয়া আমার নেই আম্মু! আমি আল্লাহকে পেয়েছি। তাকে আর বর্জন করতে পারছি না।

নাসিরা ঃ তাহলে তোর উপর কে যাদু করেছে?

রাফিদা ঃ আমার উপর যাদু করবে কে? ইসলামই এক যাদু। এটা যার মনে অনুপ্রবেশ করবে সে যে কোন বিপদ-আপদের কোনই পরোয়া করবে না। ইসলামের জন্য জীবন বাজি রাখতে তার কোন আপত্তি নেই। জান কুরবান করতে প্রস্তুত।

নাসিরা ঃ আম্মু বলছি। তুই আমার কথায় ইসলাম ত্যাগ কর।

রাফিদা ঃ আম্মু! এটা অসম্ভব।

নাসিরা ঃ আচ্ছা তাহলে তুই একটা কাজ কর। ইসলাম ছাড়িস না শুধু তোর আব্বুর সান্ত্বনার জন্য মুখে বল 'আমি ইসলাম ত্যাগ করেছি।'

রাফিদা ঃ আম্মু! তাই যদি হতো, তাহলে যারা ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করেছেন তারা এত কষ্ট স্বীকার করতেন না। তারা বলতে পারতেন আমরা ইসলাম গ্রহণ করিনি। ফলে মুসীবতের পাহাড় তাদের উপর চেপে বসতো না। কেউ তাদের কষ্ট দিতো না। তাদের হত্যা করতো না। যারা ইসলাম গ্রহণ করেন তারা কখনো মুসলমান পরিচিতিকে অস্বীকার করেন না। যে করে সে তো পাক্কা মুসলমান নয়।

নাসিরা ঃ তাহলে হবে কি? তোর আব্বু তো চরম পাষণ্ড। ভয়ংকর নির্দয়। সকাল হলেই তোকে জবাই করে ফেলবে।

রাফিদা ঃ চিন্তা করো না আম্মু! আমার মৃত্যুর সময় যদি এসে থাকে, তাহলে তাঁর সামনে প্রতিরোধের কোন শক্তি নেই। কেউ একে ফেরাতে পারবে না।

নাসিরা ঃ বেটি! সন্তানের প্রতি মায়ের কি স্নেহ তুই এখনো তা অনুধাবন করতে পারিসনি। একজন মা তার সন্তানের জন্য জানও উৎসর্গ করতে পারে। আমার মাথায় ধরছে না কি করবো, কিভাবে তোকে বাঁচাবো।

রাফিদা ঃ তুমি আমাকে বাঁচাতে চাইলে মদীনায় পাঠিয়ে দাও।

নাসিরা ভাবতে লাগলো। কিছুক্ষণ পর বললো, তোর কথা আমি বুঝতে পেরেছি। অবশ্যই আমি তোকে বাঁচানোর চেষ্টা করবো। তুই এখানে চুপচাপ বসে থাক। আমি ক্ষণিকের মধ্যেই আসছি। এ কথা বলেই নাসিরা বেরিয়ে

গেলো। রাফিদা অপেক্ষমান। অনেকক্ষণ পর নাসিরা ফিরে এলো। এসে বললো ঃ প্রতিবেশী একজনকে ঠিক করেছি। সে সব ব্যবস্থা করবে। প্রতিবেশীটি হলো মাসউদ। খুবই ভালো ছেলে। সৎ যুবক। তার উষ্ট্রিতে করে সে তোকে মদীনা নিয়ে যাবে। দূরে চলে গেলেও তুই জিন্দা থাকবি। কখনো না কখনো হয় তো দেখা হবে। এবার তুই তৈরী হ।

রাফিদা ঃ কিন্তু আব্বুকে তুমি কি জবাব দিবে আম্মু!

নাসিরা ঃ আব্বু বলেছিলেন ঃ ও মরে গেলে রাত্রেই দাফন করে ফেলো। আমি তাকে বলবো ঃ ও মরে গেছে। তাকে দাফন করে ফেলেছি। তুই চুপ থাক। উঠে তাড়াতাড়ি প্রস্তুতি নে। কয়েক জোড়া কাপড় সাথে নে। আমি তোকে কিছু নগদ অর্থ দিচ্ছি।

রাফিদা উঠে রুমে গেলো। কয়েক জোড়া কাপড় চোপড় নিয়ে যখন সে বেরিয়ে এলো, তখন নাসিরাও এসে উপস্থিত। টাকার একটি থলে তার হাতে তুলে দিলেন। নিঃশব্দে দুজন বেরিয়ে এলো। কয়েক কদম এগুতেই দেখলো, উষ্ট্রি দাঁড়িয়ে আছে। উষ্ট্রিচালক উট বসালো। রাফিদাকে আরোহণ করিয়ে উষ্ট্রি নিয়ে সে চম্পট দিলো। নাসিরা কবরস্থানে গেলেন। একটি কবরে মাটি তুলে এরূপ বানিয়ে দিলেন যেন নতুন কবর। কৃত্রিম কবর তৈরী করে সে প্রত্যাবর্তন করলো।

৮

কুরযের অভিযাত্রা

রাফিদার বিরহ বেদনায় নাসিরা অস্থির। বহু আদর যত্ন করে চোখে চোখে রেখে এই সন্তানকে তিনি লালন পালন করেছেন। সে এক নাজনীন। চোখে তুলে রাখার মত সম্পদ। মুহূর্তের জন্যও নাসিরা তাকে চোখের আড়াল হতে দেননি। সর্বদাই কাছে রেখেছেন। আকস্মিক আজ তাকে বিদায় জানাতে হলো। অনির্দিষ্ট কালের জন্য তার বিচ্ছেদ। কে জানে তার সাথে আবার দেখা হবে, না হবে না। যদি তাকে পার করে না দেয়া হতো, তাহলে তো আরো বিপদ ছিলো। সকালবেলায় তার পিতা তাকে অবশ্যই জবাই করে ফেলতো। মৃত্যু থেকে বাঁচিয়ে তাকে অসহায় অবস্থায় খোদার প্রশস্ত জমিনে ছেড়ে দিয়েছেন। আশা কেবল এটুকু–হয়তো জীবনে কখনো দেখা হবে। মেরে ফেললে তো এই আশাও তিরোহিত হয়ে যেতো। এই আশা বুকে বেঁধে হয়তো নাসিরা কদিন বেঁচে থাকতে পারবে।

ভোর পর্যন্ত নাসিরার চোখে নিদ্রা নেই। চোখে তার কান্না আর কান্না।

কুরয প্রত্যুষে ঘুম থেকে জাগলো। নাসিরাকে কান্নারত দেখে বললো ঃ তুমি এখনো কাঁদছো?

নাসিরা ডুকরে কেঁদে উঠে বললো ঃ আমার কপালে এবার আছে শুধু কান্না।

কুরয ঃ রাফিদার কি হয়েছে?

নাসিরা ঃ মরে গেছে।

কুরয ঃ ভালো হয়েছে। তুমি কাঁদছো? নাসিরা! তোমার আনন্দিত হওয়া উচিত। সে মুসলমান হয়ে গিয়েছিলো। আমি আর তুমি তাকে যতই বুঝাতাম, সতর্ক করতাম সে কখনো ইসলাম ত্যাগ করতো না। আমাদের খুবই দুর্ণাম হতো। ভাল হয়েছে। তার লাশ........।

নাসিরা ঃ তুমি তো বলেছিলে দাফন করে ফেলতে। আমি তাই করিয়েছি। গোরস্থানে যেয়ে দেখে এসো।

কুরয ঃ আমি কবর দেখে আসবো? তোমাকেও নির্দেশ দিচ্ছি, কখনো এই বেদ্বীনের কবরের পাশেও যেও না। অন্যান্য কন্যাদের ব্যাপারে যেমন ধৈর্য ধারণ করেছো, এটার ব্যাপারেও তাই করো। সন্তান আরো কত হবে।

নাসিরার অশ্রু থামেনি। ডুকরে ডুকরে তিনি কাঁদছেন।

কুরয ঃ ব্যাস। এবার কান্না থামাও। তুমি জানো, আজকে আমি একদিকে রওয়ানা করছি।

নাসিরা ঃ জানি। রাফিদা শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগের পূর্বেও বলেছিলো, আব্বুকে মদীনা যেতে দিও না।

কুরয ঃ আবার রাফিদার নাম মুখে উচ্চারণ করলে। ভবিষ্যতে আর কখনো তার নামও উচ্চারণ করো না। আবু জেহেল, উমাইয়া এবং এ ধরনের গণ্যমান্য বড় বড় নেতাদের সামনে আমি স্বীকার করেছি মদীনা যাবো। যাবো আমি অবশ্যই।

নাসিরা ঃ আমি হাত জোড় করে অনুরোধ করছি যেয়ো না, যেয়ো না।
মূলতঃ নাসিরার আশংকা ছিলো কুরয কিনা রাফিদাকে হাতের নাগালে পেয়ে যায়। অথচ নাসিরা উষ্ট্রিচালককে পূর্বে বলে দিয়েছিলো উষ্ট্রি খুব দ্রুত চালাবে। কারণ, তোমাদের পশ্চাতে কিন্তু কুরয আসছেন। কুরয যেন রাফিদাকে দেখতে না পান। যদি দেখতে পাও কুরয নিকটবর্তী এসে পৌঁছেছেন, তাহলে ভিন্ন পথ অবলম্বন করবে। তা সত্ত্বেও নাসিরার ভয়, না জানি উষ্ট্রিচালক ভুল করে ফেলে এবং কুরয রাফিদাকে দেখে ফেলেন। তার জানা আছে কুরয রাফিদাকে পেলে তৎক্ষণাৎ জবাই করে ফেলবেন। এজন্য তিনি কুরযকে মদীনা যেতে বারণ করেছিলেন।

কিন্তু কুরয কি স্ত্রীর কথা শুনার মত ব্যক্তি? সে মুখ ভেংচিয়ে বললো ঃ বকবক করো না। যেতে হবে। যাওয়া আমার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত।

নাসিরা সশব্দে কেঁদে বললেন ঃ তোমার মর্জি।

কুরয প্রয়োজন শেষে কাবা ঘরের দিকে রওয়ানা হলো। সেখানে তখন সমস্ত বড় বড় নেতৃবৃন্দ বসা। কুরযকে দেখেই আবু জেহেল বললো ঃ কুরয এখনো তৈরী হয়ে আসোনি?

কুরয ঃ প্রস্তুতই মনে করুন। আমি একটি শুভ সংবাদ শুনাতে এসেছি।

আবু জেহেল ঃ কি?

কুরয ঃ আমার এক কন্যা ছিলো নাম তার রাফিদা। হয়তো আপনি দেখেছেন।

আবু জেহেল ঃ হয়তো কি, বহুবার দেখেছি। কি হয়েছে? কোন অসুখ হয়েছে?

উমাইয়া ঃ রোগ নয়। রাত্রে আমি জানতে পারলাম সে মুসলমান হয়ে গেছে।

কুরয কড়া দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললো ঃ কার কাছে শুনেছো তুমি?

উমাইয়া ঃ এক মহিলা এসে বললো।

কুরয ক্রোধান্বিত হয়ে বললো ঃ সে মহিলাটি হবে তোমার স্ত্রী, যে সর্বদা থাকে নগ্ন। উমাইয়াও ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলো। বললো ঃ কুরয! তুমি মারাত্মক শক্ত কথা বলে ফেলেছো। ক্ষমা চাও। না হয় তলোয়ার দিয়ে তোমার গর্দান উড়িয়ে দেবো। উমাইয়া এই বলে তলোয়ার উন্মুক্ত করলো। ফলে কুরযও কালবিলম্ব না করে তার তলোয়ার কোষমুক্ত করলো। হুংকার ছেড়ে বললো ঃ আমার হাতেও তলোয়ার আছে। আমি সত্য বলছি। নির্লজ্জ তোমার স্ত্রী। তোমার সামনে সে উলঙ্গ হয়ে আসে।

উমাইয়া নিজেকে আর নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারেনি। করলো কুরযের উপর তলোয়ারের আক্রমণ। কুরয যদি দ্রুত সরে না দাড়াতো, তাহলে ভুড়ি বের হয়ে যেতো। সেও পাল্টা আক্রমণ করলো। উমাইয়া তাড়াতাড়ি লাফিয়ে সটকে পড়ে প্রাণ বাঁচালো। আবু জেহেল ও অন্যান্য নেতৃবৃন্দ দৌড়ে এসে দুজনের মাঝখানে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ালো। আবু জেহেল উপস্থিত ভাষণ দিলো—

অত্যন্ত দুঃখজনক! আমাদের অজ্ঞতা আজও দূর হয়নি। এখনো আমরা সাধারণ বিষয় নিয়ে পরস্পরে যুদ্ধ আরম্ভ করি। লড়াই করে মরতে থাকি। অথচ এখনই হচ্ছে সর্বদলীয় ঐক্যের বেশী প্রয়োজন। আমাদের মোকাবিলা মুসলমানদের বিরুদ্ধে। মুসলমানদের খতম করতে হবে। তোমাদের জানা নেই,

মুসলমানদের মধ্যে কি সুদৃঢ় ঐক্য? আমার কাছে শুন, কোন একজন মুসলমানের উপর কোন বিপদ আসলে সবাই বে-চাইন হয়ে পড়ে। আমরা নিজেদের কারো বিপদে উদ্বিগ্ন না হলেও অন্ততঃ পারস্পরিক সংঘর্ষ থেকে তো দূরে থাকতে পারি।

কুরয ঃ ঝগড়ার সূচনা করেছে সে।

উমাইয়া ঃ আমি যা শুনেছি তাই বলেছি। গালি দিয়েছো তুমি।

শায়বা ঃ ভাই! ছোটখাট সাধারণ বিষয়ে হুট করে আমাদের তলোয়ার কোষমুক্ত হয়ে যায়। এটাকে আমরা মনে করি বীরত্ব ও সাহসিকতা। অথচ এটা হলো অজ্ঞতা ও মূর্খতা। বিবেক খরচ করে কাজ করা উচিত। হাঁ, ভাই কুরয! রাফিদা সম্পর্কে তুমি কি বলতে চেয়েছিলে?

কুরয ঃ আফসোস! তারা আমার পূর্ণ বক্তব্য শ্রবণ করেননি। ধন্যবাদার্হ একটি কৃতিত্ব আমি দেখিয়েছি। শুনতে এসেছি এর জন্য প্রাপ্য মুবারকবাদ। আর তারা কিনা এর পূর্বেই বাকবিতণ্ডা আরম্ভ করে দিয়েছে।

আবু জেহেল ঃ আগে তুমি বসো। শান্ত চিত্তে কথা বলো।

সবাই বসে পড়লো। আবু জেহেল বললো ঃ এবার তোমার কৃতিত্বের বিবরণ দাও। রাফিদা রাত্রে আমাকে ইয়াসরিব না যেতে অনুরোধ জানিয়েছিলো। সে বলেছিলো শিক এ ব্যাপারে অশুভ ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন। এই কমবখত মেয়েটি আমাকে খুবই ভালবাসতো। ক্ষুব্ধ হয়ে আমি তাকে ছুড়ে মেরেছিলাম। ফলে তার প্রাণবায়ু উড়ে যায়। এর পূর্বেও আমি কয়েকটি কন্যা হত্যা করেছি। এটাই ছিলো আমার সর্বশেষ এবং যুবতী মেয়ে।

উমাইয়া খুব আনন্দিত হলো। প্রফুল্লচিত্তে বললো ঃ লাত, উযযার শপথ! তবে তো তুমি মহাগর্বের কাজ করেছো। আমি খুবই খুশী হলাম।

আবু জেহেল ঃ বাস্তবিক, তোমার এই কৃতিত্ব ধন্যবাদার্হ। প্রথমতঃ আমাদের মুরুব্বীরা দীর্ঘকাল থেকে কন্যাদের হত্যা করে এবং জীবন্ত কবর দিয়ে আসছেন। এখন তো এ বিষয়টি আরো অধিক আবশ্যকীয় হয়ে পড়েছে। কারণ, মুহাম্মাদ যা বলবে তার সম্পূর্ণ বিরোধিতা করা উচিত। এরূপ না করলে আমরা তো তাদেরই অনুরূপ হয়ে গেলাম।

হারিস ঃ আবু জেহেল ঠিকই বলেছেন। মুহাম্মাদ আমাদের উপাস্যদের দুশমন। আমরা তার ও তার শিক্ষা-দীক্ষার শত্রু। সে যা শিক্ষা দিচ্ছে আমাদের উচিত তার বিরোধিতা করা। কুরযের কৃতিত্ব শুনে আমি যারপরনাই খুশী হলাম। সত্যিই সে বিরাট গর্বের কাজই করেছে।

আবু জেহেল ঃ লাত যদি চান, তাহলে মদীনার চারণভূমিতে প্রচণ্ড

আক্রমণ চালানোর মাধ্যমে তার দ্বিতীয় কৃতিত্ব প্রকাশ পাবে।

হারিস ঃ কুরয! তোমার সাথীরা মক্কার বাইরে পৌঁছে গেছে। তারা তোমার অপেক্ষা করছে। আমরা যাচ্ছি। তুমিও এসে পড়ো।

কুরয ঃ আপনারা সবাই যান। বাড়ী হয়ে আমি আসছি।

কুরয সেখান থেকে সোজা বাড়ীতে চলে গেলো। নাসিরা তখনো ঘরে বসে বসে কাঁদছে। ঘরে প্রবেশ করেই সে নাসিরাকে বললো ঃ বেওকুফ মেয়ে কোথাকার। তুমি তো কাঁদতে কাঁদতেই মরে যাবে।

নাসিরা ঃ কি করবো? মনে সান্ত্বনা খুঁজে পাচ্ছি না। মনকে স্থির করতে পারছি না।

কুরয ঃ তুমি তো ঘরের কোণায় থাকো। তুমি জান না, রাফিদা হত্যাকে শহরের গণমান্য লোকজন রণাঙ্গনের প্রথম কৃতিত্ব হিসাবে স্বীকৃতি দিয়েছেন। সবাই প্রশংসা করেছেন। ধন্যবাদ জানিয়েছেন। আমার কলিজাটা কয়েক বিঘত বড় হয়ে গেছে।

নাসিরা ঃ ধন্যবাদ তোমার কলিজাকে। আমিও তোমাকে মুবারকবাদ দিচ্ছি। হুররূপী কন্যাকে তুমি হত্যা করতে পেরেছো। অথচ, চেহারায় একটু ভাজও পড়লো না।

কুরয ঃ আমি পুরুষ।

নাসিরা ঃ আর আমি তো মেয়ে। বাধ্য, অসহায় এক প্রাণী।

কুরয ঃ হলো তো। এবার কান্নাকাটি একটু বন্ধ করো না। আমি যাচ্ছি।

নাসিরা বাধ্য হয়েই চোখের অশ্রু মুছলো। কুরয সশস্ত্র অবস্থায় ঘর থেকে বেরিয়ে পড়লো। অশ্বের উপর জিন বাঁধলো। রওয়ানা হলো আরোহণ করে। মক্কার বাইরে বেরিয়ে গেলো। কিছুদূর যাবার পর সাক্ষাৎ মিললো তার ৩০০ উষ্ট্রারোহী সাথীর সঙ্গে। তাদের নিকট অশ্বারোহী আবূ জেহেল, উমাইয়া, শায়বা, হারিস প্রমুখ নেতৃবৃন্দ দাঁড়িয়ে আছে। আবু জেহেল বললোঃ খুব দ্রুত সফর করবে। মুসলমানরা যেন তোমাদের আগমন সম্পর্কে টেরও না পায়। আকস্মিক তাদের উপর আক্রমণ করবে। যা কিছু পাবে নিয়ে চলে আসবে। আক্রমণ আমরা এজন্য করতে চাচ্ছি, যেন মুসলমানরা বুঝতে পারে "আমরা ৩০০ মাইল দূরে অবস্থান করেও নিরাপদ নই।" এটা তাদের উপর প্রভাব বিস্তার করবে। আমাদের বাণিজ্যিক কাফেলার দিকে চোখ তুলে তাকাতেও সাহস করবে না।

কুরয ঃ সব বুঝতে পেরেছি।

ঘন্টা ও রণ দামামা বাজিয়ে তখন কুরয সহযোদ্ধাদের নিয়ে রওয়ানা হলো।

৯

সফরে রওয়ানা

রাফিদা উটনীর উপর আরোহণ করে চলছে। উটনীর উপর ছোট্ট একটি হাওদা বাঁধা ছিলো। উটনী চালক মাসউদ সামনে আরোহী। সে বসেছে রথের দরওয়াজার ন্যায় তৈরী হাওদার একাংশে। উটনী দ্রুতবেগে চলছে। শুষ্ক পাহাড় অতিক্রম করে খোলা ময়দানে যেয়ে পৌছেছে। রাস্তার দু'ধারে টিলা। দুর্বার গতিতে পথ অতিক্রম করে যাচ্ছে তারা।

রাতের প্রথম প্রহর আরম্ভ। সৃষ্টিকুল নীরব নিস্তব্ধ। পাতাল থেকে আকাশ পর্যন্ত খামোশ। আকাশে চাঁদ এখনো উদিত হয়নি। তারকা আকাশে সাতার কাটছে। আকাশ কিছুটা ফর্সা। মৃদু বাতাস বইছে। তনুমন শীতল হয়েছে। রাফিদা এদিক ওদিকের পর্দা সরিয়ে দিয়েছে। পেছন দিকে ঠেস লাগিয়ে সে বসে আছে। জন্মভূমি ছেড়ে এসেছে তাই মনটি বিষন্ন। চেহারা কিছুটা ফ্যাকাশে। তা সত্বেও তাকে বেশ সুন্দরী মনে হচ্ছে। ভাবনার ভিতর দিয়ে সে পথ চলছে। চোখ দুটো তার কোন উজ্জ্বল তারকার উপর পড়ে আছে। গতরাত সে ঘুমায়নি। তাই চোখ বুজে আসছে। ক্রমশঃ তন্দ্রাচ্ছন্ন হলো। শুয়ে পড়লো সে। সময় পেরিয়ে যাচ্ছে। ভীষণ ঘুম হচ্ছে তার। দীর্ঘ সময় ঘুমালো। হঠাৎ চোখ খুললো। চোখ মেলে দেখে উটনী থেমে আছে। সোজা হয়ে সে বসলো। ও বাবা সকাল হয়ে গেছে! আকাশে তারকা এখনো দেখা যায়। পূর্বাকাশে শুভ্রতা বাড়ছে। নেহায়েত আনন্দঘন পরিবেশ। রাফিদা মাথা তুলে দেখলো, মাসউদ নামায পড়ছে। রাফিদা খুব আনন্দিত হলো সে মুসলমান। মাসউদ নামায শেষ করলে রাফিদা তাকে প্রশ্ন করলো ঃ আপনি কি মুসলমান?

মাসউদ উটনীর কাছে এসে বললো ঃ হাঁ, আমি মুসলমান।

রাফিদা ঃ আমি ভীষণ খুশী হলাম। উটনীটিকে একটু বসিয়ে দিন আমি নামবো।

মাসউদ উটনী বসিয়ে দিলো। রাফিদা উটনীর উপর থেকে অবতরণ করলো। শীতল বালুর উপর দিয়ে হেঁটে বালুর উঁচু টিলার পেছনে চলে গেলো। জরুরত সেরে এলো। এসে মাসউদের নিকট থেকে পানি নিলো। একপাশে যেয়ে সে পবিত্রতা অর্জন করলো, ওযু করে নিলো। কাপড় চাইল মাসউদের কাছে। নামায আদায় করে নিলো কাপড় বিছিয়ে। চাঁদের টুকরোর ন্যায় এই যুবতীর দিকে মাসউদ বিস্ময়ের দৃষ্টিতে তাকালো। নামায শেষে তাকে প্রশ্ন করলো মাসউদ ঃ তুমি কবে ইসলাম গ্রহণ করেছো?

রাফিদা ঃ অনেক দিন হলো। আপনি কবে মুসলমান হয়েছেন?

মাসউদ ঃ প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হিজরতের কিছুদিন পূর্বে।

রাফিদা ঃ আপনিও হিজরত করলেন না কেন?

মাসউদ ঃ কয়েকবার মনস্থ করেছিলাম। মক্কার কিছু সংখ্যক বদমাশ লোকের সংশয় জেগেছিলো, আমি মুসলমান হয়ে গেছি। পলায়নের চেষ্টায় আছি। তারা আমার পেছনে পড়লো। কড়া নজর রাখতে আরম্ভ করলো। আমি তাদের ভোলাবার চেষ্টা করেছি। কিন্তু আমার কৌশল কোন কাজে আসেনি। মূলতঃ সব কাজ নির্ধারিত সময়েই সম্পাদন হয়ে থাকে। আমার হিজরতের সময় হয়নি। আল্লাহ তা'আলা রাত্রিতে হিজরত করার ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। কিন্তু রাফিদা.... ! ক্ষমা করবে আমি তোমার নাম নিয়েছি। তুমি একজন নেতার কন্যা। আমি একজন শ্রমিক। আমার মুখে শোভা পায় না তোমার নাম উচ্চারণ করা। তোমার আম্মু যখন আমার নিকট এসেছিলেন, তখন তিনি আমাকে বলেননি তুমি আমার সাথে হিজরত করবে। মনে করেছি কোন বাঁদী হয়তো পাঠাবেন।

রাফিদা মনোহারী দৃষ্টিতে মাসউদের দিকে তাকাচ্ছিলো। সে বললো ঃ আগে উটনীটিকে বসান। আমি আরোহণ করি আপনিও সওয়ার হোন। পথ চলতে চলতেই কথা বলা যাবে।

মাসউদ ঃ ঠিক বলেছো। তোমার আম্মু আমাকে বলেছিলেন কোথাও না থামতে। আমার পিছু ধাওয়া করার সম্ভাবনা আছে।

রাফিদা ঃ পশ্চাত ধাওয়ার ধারণা আমার নেই। কিন্তু আমার আব্বু সসৈন্যে আসছেন। তাদের সম্মুখে যেন না পড়ি।

মাসউদ ঃ হাঁ, আমি শুনেছিলাম। তারা কোন গুরুত্বপূর্ণ কাজে যাবেন। নিশ্চিত থাক, আমি এরূপ পথ ধরবো, তারা আমাদের মুখোমুখী হবে না। তারা আমাদের নাগাল পাবে না। মাসউদ উটনী বসালো। রাফিদা বুদ্ধিমতী যুবতী। দ্রুত সে উটনীর উপর আরোহণ করলো। মাসউদও উঠে বসলো। উটনীর লাগাম ধরে ইশারা করলো। উটনী চলতে আরম্ভ করলো।

রাফিদা ঃ রাত্রে সৌভাগ্যক্রমে আমাদের ঘরে কোন বাঁদী ছিলো না। ছিলাম আমি আর আম্মু।

মাসউদ ঃ কিন্তু তোমার আম্মু তোমাকে মদীনা কেন পাঠালেন?

রাফিদা ঃ আমি ইসলাম গ্রহণ করেছি—এই সংবাদ আমার আব্বু জানতে পেরেছেন। আব্বু আমার প্রতি অসন্তুষ্ট। অথচ আমি তাকে খুব ভালবাসতাম। তার সেবা করতাম। তিনি প্রায় সময় আম্মুকে বলতেন, কন্যা জীবিত রাখা ঠিক নয়। আম্মু আমাকে খুব আদর করতেন। তিনি তাকে বুঝাতেন। আমার

আফসোস! আমি তাকে ভালবাসতাম কিন্তু তিনি আমাকে মোটেই বরদাশত করতেন না—ভালবাসতেন না। রাত্রে তিনি জানতে পারলেন আমি ইসলাম কবুল করেছি। ক্রুদ্ধ হয়ে তিনি আমাকে জমিনে ছুড়ে মারলেন। আমি বেহুঁশ হয়ে পড়লাম।

১০

নতুন পথ

মাসউদ ভিতরের টিলাগুলোর দিকে ঢুকছিলো। কিছু দুর যেয়ে সে তার উটনী থামিয়ে দিলো। উটনী থেকে দ্রুত সে নেমে পড়লো। রাফিদা তাকে বললো, উটনী বসান। মাসউদ ইশারায় উটনী বসালো। রাফিদা দ্রুত নেমে পড়লো। মাসউদ বললো ঃ তুমি নামতে সতর্কতা অবলম্বন করবে। রাফিদা চিত্তাকর্ষক দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললো, কেন?

মাসউদ ঃ কারণ, তোমরা স্পর্শকাতর জাতি।

রাফিদা ঃ অতঃপর?

মাসউদ ঃ যদি ঝটকা লেগে যায়।

রাফিদা ঃ অনিচ্ছাসত্বেও হেসে উঠলো। সে বললো, ঝটকা শুধু মেয়েদেরই লাগে, ছেলেদের গায়ে লাগে না?

মাসউদ ঃ ছেলেদের দেহ শক্ত, মেয়েদের নরম।

এই সময় মাসউদ উটনীর গর্দান ডান দিকে ফিরিয়ে তার পাগুলোকে বেঁধে বসিয়ে ফেললো। বললো, এবার নেমে পড়ো। রাফিদা নেমে পড়লো। মাসউদ বললোঃ তুমি এখানেই দাঁড়াও। আমি কোন টিলার আড়ালে বসে দেখছি, এরা কারা।

রাফিদা ঃ আমি এখানে কেন বসবো? আমিও আপনার সাথে যাবো।

মাসউদ ঃ আমাকে যদি তারা দেখে ফেলে এবং আমি পাকড়াও হই, তাহলে তুমি বেঁচে যাবে। তারা চলে গেলে তুমি উটনী খুলে চম্পট দেবে।

রাফিদা ঃ আমরা তো লুকিয়ে দেখবো। পাকড়াও এর তো কোন প্রশ্নই আসে না।

মাসউদ ঃ আমার সাথে যাবে—এটাই জেদ ধরেছো।

রাফিদা ঃ এতে জেদের কি আছে?

মাসউদ ঃ মূলতঃ তোমার মত মেয়েদের জেদ হয়ে থাকে। আচ্ছা ঠিক আছে চলো। উভয়েই পায়ে হেঁটে চললো।

বিপরীত দিকের উঁচু টিলার নীচ দিয়ে তারা চলতে লাগলো। রাস্তার

নিকটে পৌছে গেলো। একটি টিলার উপর আরোহণ করতে আরম্ভ করলো মাসউদ। রাফিদাও উঠতে লাগলো। মাসউদ বললো, একটু ধীরস্থিরে উপরে উঠো। টিলা খাড়া। যেন পদস্খলন না হয়।

রাফিদা ঃ আল্লাহ মালিক। আপনিও সতর্ক থাকুন।

মাসউদ ঃ আমার চিন্তা করো না।

রাফিদা ঃ বালু উত্তপ্ত হচ্ছে।

মাসউদ ঃ এজন্যই বলেছিলাম, টিলার ছায়ায় ঠাণ্ডায় বসে থাকো। কষ্ট করলে না?

রাফিদা ঃ বিশেষ কোন কষ্ট তো নয়।

তারা দু'জন টিলার মাঝখানে পৌছে গেলো। মাসউদ কখনো উপর দিকে তাকাচ্ছে, কখনো রাফিদাকে দেখছে, কখনো তাকাচ্ছে নীচের দিকে। একবার রাফিদার দিকে তাকাচ্ছিলো এমতাবস্থায় তার পা পিছলে গেলো। সামনের দিকে ঝুকে নিজেকে সামলানোর কোশেশ না করে দাঁড়িয়ে গেলো। এরূপে দাঁড়িয়ে যাওয়ার ফলে দেহের ভারসাম্য রক্ষা করতে পারলো না। গড়িয়ে পড়তে লাগলো। রাফিদা অনিচ্ছাকৃতভাবে হাসতে লাগলো। হাসতে হাসতে তার চেহারা গোলাপ ফুলের চেয়ে লাল হয়ে গেলো। পানি ছল ছল করতে লাগলো চোখে। মাসউদ গড়াগড়ি খেতে খেতে নীচে যেয়ে দম নিল। গায়ে তার গোস্বা। বিড়বিড়াতে লাগলো সে। আল্লাহই জানেন রাগ কি রাফিদার উপর, না বালুর উপর, না নিজের উপর। নীচে পড়ে সে দাঁড়ালো। ঝেড়ে ফেললো কাপড়গুলো। আবার উপরে আরোহণ করার জন্য উদ্যত হলো। রাফিদা ওখানে দাঁড়িয়েছিলো, যেখানে সে গড়িয়ে পড়েছে। মাসউদ উঠে দ্রুত উপর দিকে আরোহণ করতে লাগলো। রাফিদা বললো, দ্রুত লাফালাফি করবেন না। সতর্ক থাকুন, আবার যেন পড়ে না যান।

মাসউদ পরীরূপী সে যুবতীর কাছে এসে পৌছলো। রাফিদা তাকে দেখে এখনও মুখ চেপে হাসছে। সে বললো,এই শক্তির অহংকারই তো আপনাদের।

মাসউদ ঃ আরে এটা তো আকস্মিক ব্যাপার। ঘটনাক্রমে পা পিছলে পড়ে গেছি।

রাফিদা ঃ আচ্ছা, চেহারা পরিস্কার করে নিন। সারা চেহারায় বালু আটার মত লেগে আছে।

মাসউদ কাপড় তো ঝেড়ে ফেলেছিলো কিন্তু চেহারা এবং দাড়ি এবং মাথার চুল ঝাড়তে পারেনি। সে জুব্বার আঁচল দিয়ে চেহারা এবং চুল পরিস্কার করলো। অতঃপর উভয়ই টিলার উপর দিকে আরোহণ করতে লাগলো।

রাফিদা খুব উচ্ছল মেয়ে। কখনো সে হাসে আবার কখনো প্রাণবন্ত দৃষ্টিতে মাসউদের দিকে তাকিয়ে দেখে। মাসউদ কিছুটা অপ্রকৃতিস্থ।

যাহোক, উভয়ই টিলার উপর পৌঁছে গেলো। বসলো দু'জন টিলার শৃঙ্গে। তারা দেখলো মক্কার দিক থেকে বিশাল উটের পাল খুব দ্রুত এগিয়ে আসছে। তন্মধ্যে কতগুলো অশ্বও রয়েছে যেগুলো উটের সাথে সাথে সমান তালে পাল্লা দিয়ে এগুচ্ছে।

তারা দু'জন মাথা নীচু করে বসলো। শৃঙ্গে এদিক ওদিক থেকে মাথা তুলে ঘটনা প্রত্যক্ষ করতে লাগলো। তারা এমন জায়গায় বসেছিলো যাতে পথিকরা তাদের দেখতে না পায়। কিন্তু তারা ঠিকই পথিকদের দেখতে পাচ্ছিলো।

মাসউদ বললো ঃ এরা হচ্ছে, তোমার পিতা ও তার সাথী–সঙ্গী।

রাফিদা ঃ আমিও চিনতে পেরেছি।

উটের পাল তাদের সামনে দিয়ে অতিক্রম করছে। তারা আশংকা করছিলো, কখন না জানি তারা আমাদের দেখে ফেলে। তবে উষ্ট্রারোহীরা এদিক ওদিক না তাকিয়ে সোজাসুজি পথ অতিক্রম করার কারণে তাদের সে শংকা কেটে গেলো।

প্রতিটি উটের উপর দু'জন করে আরোহী। তারা বেদুঈন। গায়ে তাদের আলখাল্লা। আস্তিন লম্বা লম্বা। সে আস্তিনের ভিতর একটি বকরির বাচ্চা স্বভাবতই ঢুকে যেতে পারে। মাথায় পেঁচানো পাগড়ী। তার উপর জালিওয়ালা রুমাল। মাথা এবং গর্দানোর উপর রুমালগুলো ঝুলছে।

এই লেবাস সাধারণত বেদুঈনরা পরে থাকে।

রাফিদার পিতা কুরযের পরনেও ছিলো লম্বা জুব্বা এবং সালোয়ার। জামা তার টাখনু পর্যন্ত প্রলম্বিত। কোমরে রেশমী রুমাল বাঁধা। মাথায় উঁচু পাগড়ী। সে অশ্বারোহী। তার সাথে আছে তলোয়ার, নেযা, তিরকাশ, ঢাল। ধনুক স্কন্ধের উপর পড়ে আছে। খঞ্জর ঝুলে আছে বুকের উপরে আড়াআড়িভাবে। আরবের গণ্যমান্য সম্মানিত ব্যক্তিরাই এরূপ পোশাক পরিধান করে থাকেন। মাসউদ ও রাফিদার পথ তারা অত্যন্ত দ্রুত অতিক্রম করে গেলো। মাসউদ বললো ঃ আল্লাহর শোকরিয়া। তারা আমাদের দেখতে পায়নি।

রাফিদা ঃ সত্য। আসলে আল্লাহ তা'আলাই তাদের চোখের উপর পর্দা দিয়ে রেখেছেন। এবার আশা করি ইনশাআল্লাহ অবশ্যই আমরা ইয়াসরিব পৌঁছে যাবো।

মাসউদ ঃ ইনশাআল্লাহ। চলো, এবার আমরা নীচে নেমে পড়ি।

দু'জন নীচে নামতে আরম্ভ করলো। রাফিদা ছলনাময়ী কণ্ঠে বললো,

আবার যেন নীচে গড়িয়ে না পড়েন।

মাসউদ ঃ তুমি বড়ই প্রাণোচ্ছল রাফিদা!

রাফিদা দুষ্টুমী করে বললো, আপনি আমার হাত ধরে নিন। না হয় অবশ্যই পড়ে যাবেন।

মাসউদ ঃ যেন তুমি আমাকে ধরে রাখবে।

রাফিদা ঃ কেন নয়। আপনি তো মাতৃজাতির নিন্দা করেছেন এবং পুরুষ জাতির প্রশংসা করেছেন। আল্লাহর ফয়সালা—আপনি সঠিক পথের উপর নন।

মাসউদ ঃ বলো। এখন তো তোমার বড় কথা বলার সুযোগ হয়েছে।

এবার দু'জন নীচে নেমে এলো। টিলার নীচ দিয়ে চলতে চলতে এসে পৌঁছলো উটনীর কাছে। মাসউদ উটনী খুলতে চাইলো। রাফিদা বললো, দাঁড়ান।

মাসউদ অপরূপ হুরের দিকে তাকিয়ে বললো ঃ কেন? কোন নতুন দুষ্টুমী মাথায় খেলছে?

রাফিদা ঃ না। আপনার সাথে বুঝাপড়া করতে হবে।

মাসউদ ঃ কি?

রাফিদা ঃ আল্লাহই জানেন আমি এবং আপনি কতক্ষণ পর্যন্ত এক সাথে চলবো। এজন্য আমি চাই, আপনি আমার ভাই হয়ে যান।

'ভাই হয়ে যাবো?' মাসউদ বিস্ময়ের দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে বললো।

রাফিদা গুরুগম্ভীর কণ্ঠে বললো ঃ হাঁ, ভাই।

মাসউদ ঃ কিন্তু আমি তো এর যোগ্য নই। আমি একজন শ্রমিক। আর তুমি একজন শাহজাদী।

রাফিদা ঃ কিন্তু আমি তো বলেছি। এখন আমি একজন সাধারণ মেয়ে। যদিও আমি শাহজাদী। যদি আমার ধনদৌলত পুনরায় পেয়ে যাই অথবা পিতা মুসলমান হয়ে আমাকে ডেকে নেন, তখনও আমি আপনাকে আমার ভাই মনে করবো।

মাসউদ ঃ স্বীকার করছো?

রাফিদা ঃ আল্লাহকে হাযির রেখে স্বীকৃতি দিচ্ছি।

মাসউদ ঃ দেখো, তুমি নিজেই আমাকে এ সম্মান দান করছো।

রাফিদা ঃ না, আমি তো দরখাস্ত করছি।

মাসউদ ঃ মনজুর।

রাফিদা আনন্দে আটখানা। তার চেহারা প্রফুল্ল হয়ে উঠলো। চোখগুলো চমকাতে লাগলো। সে বললো ঃ আপনার শোকরিয়া। মাসউদ! আমার কোন

ভাই নেই। আপনি আমার ভাই হয়ে গেছেন।

মাসউদ ঃ আমার কোন বোন নেই। আমিও আনন্দিত যে, অত্যন্ত হাসিমুখ, প্রাণোচ্ছল, দুষ্টুমীপ্রবণ, কৌতুকী আমার একটি বোন হলো।

রাফিদা ঃ সেটা আমার ভুল হয়ে গেছে। বড় ভাইয়ের সাথে আমার কৌতুক করা উচিত হয়নি।

মাসউদ ঃ দেখো! তুমি যদি দুষ্টুমী এবং কৌতুক ছেড়ে দাও তাহলে আমার মন ছোট হয়ে যাবে। তুমি আমার সাথে অনুরূপ ব্যবহারই করো যা পূর্বে করেছিলে।

রাফিদা ঃ দুষ্টুমীর হাসি হেসে বললো ঃ ঠিক আছে।

মাসউদ উটনীর রশি খুললো। রাফিদা প্রথম সওয়ার হলো। অতঃপর উটনী দাঁড়িয়ে গেলো এবং চলতে আরম্ভ করলো। টিলা অতিক্রম করে উটনী এসে পড়লো রাস্তায়। হাওয়া তখন প্রবলগতিতে প্রবাহিত। সূর্য উত্তপ্ত হয়ে উঠলো। বালু গরম। মাসউদ বললো ঃ রাফিদা লূ হাওয়া আসছে। পর্দা নামিয়ে ফেলো।

রাফিদা পর্দা নামিয়ে ফেললো। মাসউদ তার চেহারা রুমাল দিয়ে এভাবে ঢেকে ফেললো যে, চোখের পুতুলগুলো ছাড়া আর কিছুই দেখা যাচ্ছিলো না। এভাবে তারা ধীরে ধীরে পথ চলতে লাগলো।

১১

লুটতরাজ

কুরয তার সাথী–সঙ্গীদের নিয়ে পথ চলছিলো। সে মনস্থ করেছিলো, মুসলমানরা যেন জানতে না পারে এমতাবস্থায় অতর্কিতে তাদের চারণভূমিতে হামলা করে উট, বকরী ছিনিয়ে আনবে। সে কোন জনপদে অবস্থান করেনি। বরং জনপদ থেকে দূরে ময়দানে অবস্থান করছিলো। তার উদ্দেশ্য ছিলো, যেন জনপদবাসী তাদের কোন সাথী–সঙ্গীর মুখ থেকে ঘটনাক্রমেও তাদের উদ্দেশ্যের কথা জানতে না পারে যে, তারা মুসলমানদের চারণভূমির উপর আক্রমণ করতে যাচ্ছে। হতে পারে সে জনপদবাসী মুসলমানদের বিষয়টি জানিয়ে দিবে।

গ্রীষ্মকাল। সূর্যোদয়ের কিছুক্ষণের মধ্যেই উত্তপ্ত হাওয়ার সূচনা হয়। সূর্য যতই উপর দিকে উঠে গরম তত বাড়তে থাকে। দুপুরের পূর্বেই পরিবেশ এত উত্তপ্ত হয়ে উঠে যে, সূর্যের তাপ অসহনীয় হয়ে পড়ে। বাতাস এত উত্তপ্ত হয়ে যায় যে, গায়ে লাগলে শরীর ঝলসে যায়। একেবারে দ্বিপ্রহরের সময় তাপ

থাকে সর্বাধিক। হাওয়া ভীষণ গরম হয়ে পড়ে। মানুষ ধ্বংসের জন্য এ বাতাস যথেষ্ট। এজন্য একে বলা হয় বাদে সামূম তথা উত্তপ্ত লূ হাওয়া।

কিন্তু আরবরা খুবই শক্ত দিল হয়ে থাকে। এই প্রচণ্ড গরমেও তারা সমানভাবে সফর করতে থাকে। যদিও বালু এতো উত্তপ্ত হয়ে পড়ে যেন চুলায় গরম করা। বাতাসে বালু গায়ের উপর এসে পড়লে গায়ের সে অংশ ঝলসে যায়। আগুনের মত মনে হয়। কিন্তু সফর থেকে তারা বিরত হয় না।

অতএব, কুরযও সফর করছিলো। কিন্তু সে বিগত সময়ে রজনীতেই সফর আরম্ভ করতো এবং দুপুরের সময় কোথাও অবস্থান করতো। সে চেষ্টা করেছিলো কোন খেজুর বাগানে যেয়ে অবস্থান করবে। খেজুরের বাগান হতো আরব অঞ্চলে শস্য–শ্যামল গুলশান। অথচ সাধারণতঃ খেজুরের বাগানে থাকে কিছু খেজুরের গাছ, কিছু ফুলের চারাগাছ। এক দুটো কুয়া। কূপের আশে পাশে পানির কারণে কিছু জায়গা থাকতো শস্য–শ্যামল। ভারতীয় উপমহাদেশে এ ধরনের খেজুর বাগানকে গার্ডেন হিসাবে কেউ পছন্দ করবে না। কিন্তু আরব এলাকা যেখানে অধিকাংশই বালুকাময় সেখানে এ ছাড়া আর কিই হতে পারে। কুরয যদি কোন খেজুর বাগান না পেতো, তাহলে কোন টিলার ছায়ায় হাওয়ার গতি পরিবর্তন করে অবস্থান করতো। উটগুলোকে বসিয়ে দিতো। ওগুলোর উপর কম্বল টানিয়ে কৃত্রিম ছায়া তৈরী করতো। যদিও এ কৌশলে বাতাস থেকে নিরাপদ থাকা যেতো এবং সূর্যের উত্তপ্ত রশ্মি থেকে আশ্রয় পাওয়া যেতো, কিন্তু গরমের তীব্রতা তখনও অনুভব হতো।

কুরয দাওয়ান পর্যন্ত পৌছে গেলো। এই স্থানটি মক্কা এবং মদীনার মধ্যখানে। কুরয যেই জনপদগুলোতে এবং যেই গোত্রেই যেয়ে পৌছতো, সেখানেই মুসলমানদের সম্পর্কে কিছু তথ্য অর্জন করতো। দাওয়ান এসে সে জানতে পারলো, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ স্থান পর্যন্ত সমস্ত গোত্রগুলোর সাথে একটি চুক্তিতে আবদ্ধ হয়েছেন এবং গোত্রপতিরা এই চুক্তিনামায় দস্তখতও করেছেন। কুরয এক বৃদ্ধকে জিজ্ঞেস করলো ঃ এই চুক্তি কি ধরনের? বৃদ্ধ জবাব দিলো, এই সন্ধি নিরাপত্তার চুক্তি। তার কিছু শর্ত নিম্নরূপ ঃ

১। যেসব গোত্র মুসলমানদের বিরোধী তাদের সাথে তারা কোন সম্পর্ক রাখবে না। মুসলমানদের শত্রুদেরকে নিজেদের শত্রু মনে করবে।

২। মুসলমানদের কোন শত্রুকে তারা আশ্রয় দিবে না এবং মুসলমানদের ভিতরে গোয়েন্দাগিরিও চালাবে না।

৩। প্রতিটি গোত্র ধর্মীয় ব্যাপারে স্বাধীন। কেউ কারো ধর্মীয় ব্যাপারে

কোন প্রকার হস্তক্ষেপ করবে না।

৪। বহিরাগত কোন শত্রু মুসলমান অথবা মুসলমানদের মিত্রদের উপর আক্রমণ চালালে সবাই মিলে ঐক্যবদ্ধভাবে এর মোকাবিলা করবে।

৫। মদীনার উপর কেউ আক্রমণ চালালে এই চুক্তিনামায় শরীক গোত্রগুলো সহযোগিতা করবে।

এ ধরনের আরো অনেক শর্ত আছে। সবগুলো এখন আমার স্মরণ নেই।

এসব কথা শুনে কুরয উত্তেজিত হয়ে পড়লো। সে মনে মনে ধারণা করলো, এমন একটি লোক যাকে তার স্বজাতি দেশান্তর করে দিয়েছে, যার ধনসম্পদ, শান–শওকত, হুকুমত বলতে কিছুই ছিলো না, সে কি না ইয়াসরিবে এসে সম্রাট বনে গেছে। সে নিজেকে আর নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারলো না। সে বলে ফেললো, তোমরা কি মুহাম্মাদকে শাসক বানিয়ে নিয়েছো?

বৃদ্ধ ঃ না। কিন্তু আমার দৃঢ় বিশ্বাস তিনি গোটা আরবের সম্রাট হয়ে যাবেন।

কুরয ঃ তুমি কি মুসলমান হয়ে গেছো?

বৃদ্ধ ঃ না। তবে আমার ধারণা, একদিন গোটা আরব ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করবে।

কুরয উত্তেজিত কণ্ঠে বললো ঃ এ দুটোর কোনটিই হবে না। মুহাম্মাদ যাদুর জোরে লোকদেরকে তার অনুগত বানিয়ে নেয়। তবে এই কাগজের নৌকা বেশী দিন চলবে না।

বৃদ্ধ ঃ আপনার ধারণা ভুল। তিনি যাদুকর নন। তার উপর বাস্তবিকই আল্লাহর কালাম নাযিল হয়। আমি আমার কথা বলছি। আমি যখন শুনেছি যে, মুহাম্মাদ ইবন আবদুল্লাহ নতুন ফিতনা খাড়া করিয়েছেন, আমাদের উপাস্যগুলোর নিন্দাবাদ করছেন, আমাদের ধর্ম সম্পর্কে উপহাস করছেন, একটা নতুন ধর্ম চালু করেছেন, তখন তার প্রতি আমার অন্তরে শত্রুতা সৃষ্টি হলো। আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম, যদি কোন সময় মুহাম্মাদের বিরুদ্ধে মোকাবিলা হয়, তাহলে আমি তাকে হত্যা না করে ছাড়বো না!

ঘটনাক্রমে একদিন তিনি এই চুক্তির ব্যাপারে আমাদের এখানে আসলেন। আমি তার কাছে পৌছলাম। কি বলবো আপনাকে, আমার কল্পনা ছিলো, আমি তাকে পেলে হত্যা করে ছাড়বো। কিন্তু রূপ দেখেই তাঁর প্রতি আমার ভালবাসা সৃষ্টি হয়ে গেলো। অনেক বৃদ্ধ তাঁর খেদমতে বসেছিলেন। আমি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি কি শিক্ষা দেন? তিনি মৃদু হেসে বললেন, আমি বলি ঃ আল্লাহ এক। আমি তাঁর রাসূল। আল্লাহ তা'আলা আমার উপর তাঁর কালাম অবতীর্ণ করেছেন। তার

কালামের কিছু অংশের অনুবাদ এই ঃ

"বলুন, এসো, তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের জন্য যা নিষিদ্ধ করেছেন তোমাদেরকে তা পড়ে শুনাই ; তা এই ঃ "তোমরা তার সাথে কোন অংশীদার বানাবে না, পিতামাতার প্রতি সদ্ব্যবহার করবে। দারিদ্রের জন্য আপন সন্তানদের হত্যা করবে না। আমিই তোমাদেরকে ও তাদেরকে রিযিক দিয়ে থাকি। প্রকাশ্য হোক কিংবা গোপন, অশ্লীল আচরণের নিকটও যাবে না ; আল্লাহ যার হত্যা নিষিদ্ধ করেছেন যথার্থ কারণ ব্যতীত তাকে হত্যা করবে না। তোমাদেরকে তিনি এই নির্দেশ দিলেন যেন তোমরা অনুধাবন করো। ইয়াতীম বয়ঃপ্রাপ্ত হওয়া পর্যন্ত সদুদ্দেশ্য ছাড়া তার সম্পত্তির নিকটবর্তী হয়ো না এবং পরিমাণ ও ওজন ন্যায্যভাবে পুরোপুরি দিবে। আমি কাউকেও তার সাধ্যাতীত ভার অর্পণ করি না ; যখন তোমরা কথা বলবে তখন ন্যায্য বলবে স্বজনের সম্পর্কে হলেও এবং আল্লাহকে প্রদত্ত অঙ্গীকার পূর্ণ করবে। এভাবে আল্লাহ তোমাদেরকে নির্দেশ দিলেন যেন তোমরা উপদেশ গ্রহণ করো।"

—সূরা আনআম ঃ ১৫১, ১৫২।

এই কালাম শুনে আমার অন্তরাত্মা কেঁপে উঠলো। আমি আশংকা করলাম, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হয়তো আমার ইচ্ছার কথা জেনে ফেলেছেন যে, আমি তাকে কতল করতে চাই। আমি তাড়াতাড়ি তাঁর সামনে থেকে উঠে চলে এলাম এবং এক ব্যক্তির মাধ্যমে তাঁর কাছে অনুরোধ জানালাম, যে কালাম তিনি পাঠ করছিলেন তা যেন আমাকে লিখে দেন। তিনি লিখে আমার কাছে পাঠিয়ে দিলেন। আমি তা মুখস্থ করে নিলাম। আমি উঁচু পর্যায়ের বড় বড় কবি–সাহিত্যিকদের কথা শুনেছি, তাদের বক্তব্য পড়েছি। কিন্তু এত সুন্দর কথা আজ পর্যন্ত আমি শুনিওনি, দেখিওনি। সেদিন থেকে আমার দৃঢ় বিশ্বাস হলো, তিনি একদিন গোটা আরবের রাজা হয়ে যাবেন। গোটা আরব তাঁর ধর্ম গ্রহণ করে নিবে। স্বয়ং আমিও মনস্থ করেছি, ইসলাম গ্রহণ করে ফেলবো।

কুরয সেদিনই সেখান থেকে সামনে অগ্রসর হলো। সে তার সাথী–সঙ্গীদের বললো, তোমরা খুব সতর্ক থেকো। এখানের গোত্রগুলো মুসলমানদের মিত্র হয়ে গেছে। বিভিন্ন মনযিল অতিক্রম করতে করতে একদিন দুপুরের আগে সে মুসলমানদের এক চারণভূমিতে যেয়ে পৌঁছলো। সেখানে কয়েকজন লোক জন্তুগুলোর হেফাজতে নিয়োজিত ছিলো। কিন্তু তখন উপস্থিত ছিলো শুধুমাত্র একজন লোকই। বাকিরা সবাই শহরে কোন কাজে গিয়েছিলো।

কুরযের সুবর্ণ সুযোগ হস্তগত হলো। সে ওখানে আক্রমণ চালালো। শুধুমাত্র এক ব্যক্তি তাদের আর কি মোকাবিলা করবে। কারণ, শত্রু পক্ষের

লোক তিনশত। সে পালিয়ে যেয়ে লুকিয়ে রইলো।

কুরয চারণভূমির সমস্ত উট, বকরী ছিনতাই করে নিয়ে গেলো। যেহেতু সে জানতো, এই ছিনতাইয়ের সংবাদ আজকেই মুসলমানদের কাছে পৌঁছে যাবে এবং তারা অবশ্যই আমাদের পশ্চাদ্ধাবন করবে, এজন্য সে তখনই মক্কার দিকে রওয়ানা হবার ইচ্ছা করলো। এক ব্যক্তি বললো ঃ আমরা দীর্ঘ সফর করলাম অথচ মুসলমানদের বিরুদ্ধে মোকাবিলা না করে এমনিই ফিরে যাবো—এটাতো সঙ্গত মনে হয় না।

কুরয ঃ আমরা তো এসেছিলাম শুধুমাত্র চারণভূমিতে আক্রমণ করে ছিনতাই এর জন্য। লাত, উযযা আমাদের হামলা সফল করেছেন। যদি দুশমন এখানে পাওয়া যেত তাহলে আমরা অবশ্যই তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতাম। এখন এখানে অনর্থক অপেক্ষা করা বেওকুফী বৈ নয়। আমাদের এই আক্রমণে মুসলমানদের উপর প্রভাব বিস্তার করবে ও ভীতি সঞ্চার করবে। তারা অনুধাবন করবে যে, তিনশত মাইল দূরে এসেও আমরা নিরাপদ নই। মক্কাবাসী ইচ্ছে করলে আমাদের নাস্তানাবুদ করে দিতে পারবে।

আরও কয়েকজন বললো ঃ আমাদের সাথে বিশাল একটি দল রয়েছে। ইয়াসরিবে মুসলমানরা সংখ্যালঘু, অল্প কয়েকজন। তাদের অতর্কিত আক্রমণ চালিয়ে সমূলে উৎখাত করে যাবো।

কিন্তু কুরয ছিল সুচতুর, অভিজ্ঞ অফিসার। সে বললো, আমরা যদি ইয়াসরিবে হামলা চালাই তাহলে তারা মুক্তমনে সিংহবিক্রমে আমাদের বিরুদ্ধে লড়বে। তার পরিণতি কি হয় তা আমার জানা নেই। ফিরে যাওয়াই সঙ্গত মনে হচ্ছে। অতএব তারা সবাই লুটতরাজের মাল নিয়ে খুব দ্রুত প্রত্যাবর্তন করলো। মনে হলো যেন তাদের কেউ পশ্চাদ্ধাবন করছে।

১২
পশ্চাদ্ধাবন

কুরয যখন মুসলমানদের চারণভূমিতে আক্রমণ চালিয়ে উট, বকরী ইত্যাদি হাঁকিয়ে নিয়ে গেলো তখন যে বেদুঈন লুকিয়েছিলো সে বেরিয়ে এলো। সে দেখলো, কাজের যত ভাল ভাল উট সবগুলোই তারা ছিনতাই করে নিয়ে গেছে। রোগাক্রান্ত, দুর্বল, অকেজো উটগুলো রেখে গেছে। সে খুব আফসোস করলো। অতঃপর সেখান থেকে মদীনা মুনাওয়ারার দিকে দ্রুত রওয়ানা করলো। চেহারায় তার উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা ছিলো সুস্পষ্ট। অতএব, রাস্তায় যে সব লোকের সাথে দেখা হতো প্রথম সাক্ষাতেই তার উদ্বেগের কারণ জিজ্ঞেস

করতো। কাউকে সে বলতো আর কাউকে কিছু না বলেই সামনে হাঁটা দিতো।

বেদুঈন মদীনায় প্রবেশ করেই মসজিদে নববীতে পৌঁছলো। তখন মসজিদে নববীতে অনেক আরবের সমাগম। বেদুঈন বললো ঃ আগিছনী ইয়া রাসূলাল্লাহ! আগিছনী ইয়া রাসূলাল্লাহ অর্থাৎ ফরিয়াদ হে আল্লাহর রাসূল! ফরিয়াদ!

উপস্থিত আরবগণ চোখ তুলে বেদুঈনের দিকে তাকালেন। তাদের মাঝেই ছিলেন সারওয়ারে কায়েনাত মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। তাঁর আলোকজ্জ্বল চেহারায় বিস্ময়কর শান এবং মাহাত্ম্য প্রকাশ পাচ্ছিলো। গোটা সমাবেশে তাঁর শির উঁচু মনে হচ্ছিলো। নূরানী চেহারা ছিলো তাঁর লাল শুভ্র। দেহে তাঁর এমন লাবণ্য ও আকর্ষণ ছিলো যে, প্রতিটি দর্শক বারবার তাঁর দিকে তাকাতে বাধ্য। মাথা মুবারক তুলনামূলক বড়। প্রশস্ত ললাট। ভ্রুগুলো মিলানো কামানের মত বক্র। চোখগুলো সুরমা মিশ্রিত কৃষ্ণ। পলক দীর্ঘ। উঁচু দীর্ঘ নাক। ঠোঁটগুলো নেহায়েত সুন্দর। দাঁত মুবারক শ্বেত শুভ্র। বিদ্যুত এবং খাঁটি মোতির চেয়েও যেন আরও সাদা চমৎকার। কথা বলার সময় দাঁতের ফাঁক দিয়ে জ্যোতি বের হতো। তিনি যখন মৃদু হাসতেন তখন যেন বিদ্যুৎ খেলা করতো। দাড়ি মুবারক ছিলো ঘন লম্বা। পুরো সিনা ঢেকে ফেলতো। তিনিই হচ্ছেন আমেনার আদরের সন্তান, মুসলমানদের মহান রাহবর, আল্লাহর প্রিয় পয়গাম্বর হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আগন্তুক বেদুঈনের দিকে চোখ তুলে তাকালেন। বেদুঈন কাছে এসে বললো ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! মুসলমানদের চারণভূমি ছিনতাই হয়ে গেছে, লুটপাট হয়ে গেছে।

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিনম্র কণ্ঠে বললেন ঃ কে লুট করেছে?

বেদুঈন ঃ কমবখত, বদমাশ কুফফারে মক্কা।

সবাই বিস্ময়ের দৃষ্টিতে বেদুঈনের দিকে নজর করলো। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ কুরাইশ কি এত দূরে এসেও আক্রমণ চালিয়েছে?

বেদুঈন ঃ জ্বি, হাঁ।

রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঃ বিস্তারিত শুনাও। তুমি কি দেখেছো?

বেদুঈন ঃ আমি চারণভূমিতে ছিলাম। উট ছেড়ে দিয়েছিলাম চষে বেড়াবার

জন্য। অকস্মাৎ কয়েকশত উট এবং উষ্ট্রারোহী চারণভূমির বাইরে এসে থামলো। আমি মনে করলাম, কোন কাফেলা মদীনা আসছে। আমি ছিলাম একা। খেজুর গাছের পিছনে যেয়ে আমি লুকালাম। তারা এই সুযোগে চারণভূমিতে ঢুকে পড়লো এবং উটগুলোকে ছিনতাই করে হাঁকিয়ে নিয়ে গেলো। আমি সে অধিনায়ককে চিনতাম। নামটি ভুলে গেছি। হাঁ, হাঁ, স্মরণ হয়েছে, তার নাম কুরয ইবন জাবির। সেই নির্দেশ দিচ্ছিলো আর লোকজন তামিল করছিলো তার হুকুম। তারা সব ভালো ভালো এবং কাজের উট, বকরীগুলো জমা করে নিয়ে গেলো।

সে সমাবেশে ছিলেন হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ), উমর ফারুক (রাঃ), উসমান (রাঃ), আলী (রাঃ), আবু আইয়ুব আনসারী (রাঃ), উবাই ইবন সাবিত (রাঃ), হযরত সাআদ ইবন মাআয (রাঃ) এবং অন্যান্য সাহাবায়ে কেরাম।

উমর ফারুক (রাঃ) বললেন ঃ কুরাইশের হস্তক্ষেপ সীমা অতিক্রম করে গেছে। তারা মক্কা থেকে তিনশ মাইল দূরে এসে আমাদের চারণভূমিতে আক্রমণ চালিয়ে আমাদের হুমকি দিলো যে, আমরা মদীনায় অবস্থান করেও নিরাপদ নই। আল্লাহর কসম! আমাদের মজলুমী এবং অসহায়ত্ব শেষ প্রান্তে এসে পৌছেছে। কতদিন পর্যন্ত আমরা তাদের জুলুম–নির্যাতনের লক্ষ্যবস্তু হয়ে থাকবো? আমরা কি মানুষ নই? আমরা কি আরব নই? আমাদের শিরাগুলোতে কি সেই শোনিত রক্ত বহেনা যা কাফির–মুশরিক মক্কার কুরাইশদের শিরা–উপশিরায় প্রবাহিত?

রাসূলে কারীম (সাঃ) ঃ কেন নয়? আমরা আরব। আরবী রক্ত আমাদের শিরা–উপশিরায় প্রবাহিত। তবে তারা প্রতিমা পূজারী, মূর্তির উপাসক। আর আমরা এক আল্লাহকে স্বীকার করি। আমাদের ইচ্ছামতো কোন কাজ আমরা করি না। আল্লাহর হুকুমে করি। আল্লাহর মর্জি ছিলো আমরা ধৈর্য্য ধারণ করব, বিপদ বরদাশত করবো অটলতার সাথে। কষ্ট তাকলীফ সহ্য করবো। তিনি আমাদের পরীক্ষা নিচ্ছিলেন। তাঁর পরীক্ষায় আমরা উত্তীর্ণ হয়েছি। কাফিরদের পক্ষ হতে যেসব জুলুম–নির্যাতন আমাদের উপর হচ্ছিলো, সেগুলো দেখে আল্লাহর রহমতে জোয়ার এসেছে। আল্লাহ তা'আলা জিহাদের হুকুম অবতীর্ণ করেছেন। তিনি ইরশাদ করেছেন ঃ

কাতিলূ ফী সাবীলিল্লাহিল্লাযীনা ইউকাতিলূনাকুম।

অর্থাৎ, আর লড়াই করে আল্লাহর পথে তাদের বিরুদ্ধে যারা তোমাদের বিরুদ্ধে লড়ছে। —বাকারা ঃ ১৯০।

আবু বকর সিদ্দীক ঃ এই আয়াত নাযিল হওয়ায় আমরা আশান্বিত

হয়েছি। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস জন্মেছে, আমাদের পরীক্ষার সময় ফুরিয়ে গেছে। এবার ইটের জওয়াব পাটকেলে দেয়া হবে। আমরা নিরাপত্তা ও স্বস্তির নিঃশ্বাস গ্রহণ করতে পারবো।

আলী (রাঃ) ঃ মক্কার কাফিররা আমাদের চারণভূমিতে আক্রমণ করে আমাদের যুদ্ধ ঘোষণা শুনিয়ে গেলো। তাদের যুদ্ধ ঘোষণার চ্যালেঞ্জ আমাদের অবশ্যই গ্রহণ করা উচিত।

রাসূলে আকরাম (সাঃ) ঃ আমরা তাদের যুদ্ধের চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করলাম। ইনশাআল্লাহ! তারা খুব শীঘ্রই জানতে পারবে, এবার মুসলমানরা তাদের প্রতিটি কথার জবাব তুর্কী বতুর্কী দিতে সক্ষম। তারা যদি আমাদের উপর আক্রমণ চালাতে পারে, তাহলে আমরা তাদের সে কাফেলার উপর হামলা করতে পারবো, যে বাণিজ্যিক কাফেলা মদীনার নিকটবর্তী হয়ে মুলকে শাম যাতায়াত করে থাকে।

উমর ফারুক (রাঃ) ঃ প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যথার্থ বলেছেন। জবাব এটাই তাদের বাণিজ্যিক কাফেলাকে এদিক দিয়ে নিরাপদে যেতে দেয়া হবে না। এভাবে যখন তাদের ব্যবসা বাণিজ্য বন্ধ হয়ে যাবে তখন কদর বুঝতে পারবে।

আবু বকর (রাঃ) ঃ তাদের কয়েকটি কাফেলা শাম দেশে বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে গেছে। আমার জানা মতে দুটি কাফেলা ইতিমধ্যে বাণিজ্যে গেছে। এক কাফেলার নেতৃত্বে রয়েছে আমর ইবন আবদুল্লাহ হাযরামী। আর দ্বিতীয় কাফেলাটির কর্তৃত্বে রয়েছে আবু সুফিয়ান ইবন হারব। আবু সুফিয়ানের কাফেলাটিই বড়।

রাসূলে আকরাম (সাঃ) ঃ প্রথমে কুরযের পশ্চাদ্ধাবন করা উচিত। যদি তা না করা হয় তো কুরাইশের কাফিররা মনে করবে আমরা তাদের ভয়ে ভীত–সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছি। তাদের পিছু ধাওয়া করা আবশ্যক।

উমর ফারুক ঃ আমি নিজ থেকে সিদ্ধান্ত দিতে চাচ্ছি না। তবে আমার আন্তরিক ইচ্ছা হচ্ছে অবশ্যই কাফিরদের পশ্চাদ্ধাবন করা উচিত।

প্রিয়নবী ঃ ঠিক আছে। এক্ষুণি প্রস্তুতি নাও। উট যতগুলো পাওয়া যায় নিয়ে এসো।

সবাই উঠে দাঁড়ালো। মসজিদে নববীর সন্নিকটেই রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র সহধর্মিনীগণের জন্য হুজরা তৈরী করা হয়েছিলো। তিনিও তাঁদের হুজরায় তাশরীফ নিয়ে গেলেন। অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই সাহাবায়ে কেরাম উট নিয়ে আসতে লাগলেন। ত্রিশটি উট জমা হলো। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ষাট ব্যক্তিকে পশ্চাদ্ধাবন

করার জন্য নির্দেশ দিলেন। সবাই কোশেশ করতে লাগলো পশ্চাৎধাওয়া করতে যেতে। এক/দেড়শ সাহাবী প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আশেপাশে জমা হলেন। তাঁকে ঘিরে ধরলেন। আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) বললেন, আমার মাতাপিতা আপনার উপর কুরবান, সবাই এ গুরুত্বপূর্ণ অভিযানে যেতে চান। মেহেরবাণীপূর্বক আপনি বাছাই করে দিন।

প্রিয়নবী (সাঃ) ঃ আচ্ছা, ঠিক আছে। আমিই মনোনীত করছি। ফলে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ষাটজন আরবকে অভিযানে যেতে ঠিক করলেন। মুসলমানদের অস্ত্রহীনতা এবং অসহায়ত্ব ছিলো সীমাহীন। তাদের সবার কাছে হাতিয়ার ছিলো না। যুদ্ধাস্ত্র ইত্যাদির আলোচনাই বা কি। কারো কারো তো কাপড় চোপড়ও ভাল ছিলো না। অধিকাংশ জায়গায় ছেঁড়াফাড়া ছিলো। কাঁরো কারো কাপড় ছিলো তালিযুক্ত। অবশ্য তাদের মধ্যে কেউ কেউ ছিলেন মক্কার ধনী লোকদের অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু সমস্ত ধনসম্পদ মক্কায় রেখে তারাও হিজরত করে চলে এসেছেন। ইসলাম তাদের দুনিয়ার ধনসম্পদ থেকে বেপরোয়া করে দিয়েছে। তারা ছিলেন দৃঢ় বিশ্বাসী মুসলমান। অর্থাৎ, ঈমানী জোশ ও জযবা প্রকৃত অর্থেই ছিলো তাদের মধ্যে। আমাদের মত দুর্বল নন।

যাই হোক, যে ষাটজন মুসলমানকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নির্বাচিত করেছিলেন তারা ঢাল তলোয়ার নিয়ে উটের উপর আরোহণ করলেন। প্রতিটি উটের উপর দু'জন করে আরোহী। মুহূর্মুহূ আল্লাহু আকবার ধ্বনি দিয়ে তারা রওয়ানা হলেন। ইতিপূর্বে মুসলমানরা অন্য কোথাও এরূপ অভিযানে নামেননি। মদীনার মুশরিক এবং ইয়াহুদীরা বিস্ময়ের দৃষ্টিতে তাকাতে লাগলো। তারা জিজ্ঞেস করতে লাগলো, এরা কোথায় যাচ্ছে। তখন তাদের জানা হলো, মুসলমানদের শক্তি সঞ্চারিত হয়েছে। এবার তারা দুশমনদের বিরুদ্ধে মোকাবিলা করতে পারবে।

এরা মদীনা থেকে বেরিয়ে খুব দ্রুত সম্মুখপানে এগিয়ে চললেন। কুরযের সাথী সঙ্গীদের পদচিহ্ন তাদের নজরে আসতে থাকলো। তারা সম্মুখ পানে যেতে থাকলেন। সাফওয়ান নামক স্থান পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছলেন। সেখানে গিয়ে জানতে পারলেন, দুশমনরা চম্পট দিয়েছে। তারা সাফওয়ানও পেরিয়ে গেছে। সাহাবীরা আর আগে যাওয়া সঙ্গত মনে করলেন না। সেখান থেকেই প্রত্যাবর্তন করলেন।

১৩
নববী ফরমান

যেসব মুসলমান কুরয এবং তার সাথী–সঙ্গীদের পশ্চাদ্ধাবন করতে গিয়েছিলেন তারা সফওয়ান পর্যন্ত যেয়ে ব্যর্থ মনোরথ হয়ে মদীনায় ফিরে এলেন। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হয়ে তারা তাদের পশ্চাদ্ধাবনের কাহিনী শুনালেন। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শুনে নীরব রইলেন। সাহাবায়ে কেরাম মনে করলেন, আমরা সফওয়ান পর্যন্ত পশ্চাৎধাওয়া করে ফিরে চলে এলাম, এটা রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মনঃপুত হয়নি। তারা এজন্য দুঃখ করতে লাগলেন, আমরা কেন আরো অগ্রসর হলাম না। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দ্বিতীয় দিন মুসলমানদের ডেকে বললেন, হে মুসলমানগণ! আমি অনুভব করতে পারছি, তোমরা এজন্য আফসোস করছো যে, পশ্চাদধাওয়া করতে সফওয়ান থেকে কেন সম্মুখে অগ্রসর হলে না। মনে রেখো, আমরা সবাই আল্লাহর হুকুমের দাস। তার মর্জির খেলাফ কিছুই করতে পারি না। আল্লাহর ইচ্ছা যা হয় তাই বাস্তবায়িত হয়। তার ইচ্ছা ছিলো তোমরা সফওয়ান পর্যন্ত যেয়ে ফিরে আসবে, তাই আমি তোমাদের প্রতি অসন্তুষ্ট নই।

এতদশ্রবণে সাহাবায়ে কেরাম ভীষণ আনন্দিত হলেন। তাদের মনের উদ্বেগ ও চিন্তা দূরীভূত হলো। মূলতঃ সাহাবায়ে কেরাম সর্বদা লক্ষ্য রাখতেন যেন তাদের কোন কাজে প্রিয়নবী (সাঃ) অসন্তুষ্ট না হন। কারণ, রাসূলের অসন্তুষ্টিকে তারা আল্লাহর অসন্তুষ্টি মনে করতেন। অথচ আমরা আজকের যুগে মুসলমান নামধারণ করি, রাসূলের অসন্তুষ্টি দূরের কথা আল্লাহর অসন্তুষ্টিরও কোন তোয়াক্কা করি না। সবাই ভালো করে জানি যে, মুসলমান তিনিই যিনি ইসলামের মৌলিক বিষয়াবলীর উপর আমল করেন—নামায পড়েন, রোযা রাখেন, হজ করেন, যাকাত দেন, অথচ, আমাদের মাঝে এমন প্রচুর লোক রয়েছেন যারা বিশুদ্ধভাবে কালিমাও পড়তে জানেন না। নামায পড়তে যাওয়াকে নিজের শানপরিপন্থী মনে করেন। কোন আল্লাহর বান্দা যদি নামায পড়তে বলেন, তার প্রতি ক্রুদ্ধ হন, তাকে ঠাট্টা–বিদ্রুপ করেন। রোযা রাখেন না। রোযা রাখা তো দূরের কথা রমযান শরীফের প্রতিও সম্মান প্রদর্শন করেন না। জনসম্মুখে পান, বিড়ি, সিগারেট ইত্যাদি পান করেন এবং এটাকে গর্বের বিষয় বলে মনে করেন।

বিত্তশালী হওয়া সত্বেও যাকাত আদায় করেন না, হজ করেন না, অথচ

বিশ্বস্রষ্টা কুরআন মজীদে নামায সম্পর্কে কঠোর বাণী উচ্চারণ করেছেন ঃ

"ধ্বংস সেসব নামাযীদের জন্য যারা তাদের নামায সম্পর্কে উদাসীন।"

হযরত ইবন আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, 'ওয়াইল' হচ্ছে জাহান্নামের একটি গর্তের নাম যার লেলিহান শিখা এমনভাবে প্রজ্জ্বলিত হয়ে থাকে এবং তাতে এতো প্রচণ্ড উত্তাপ থাকে যার ফলে জাহান্নামবাসী প্রতিদিন সাতবার তা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করে। জাহান্নামের এই উপত্যকায় সেসব নামাযী প্রবেশ করবে, যারা নির্ধারিত সময় মত নামায আদায় করতো না। যারা নামায আদায় করে না তাদের কি শাস্তি হবে এবার তাই আন্দাজ করুন।

একটি বর্ণনায় এসেছে, যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃত এক ওয়াক্ত নামায পরিত্যাগ করবে সে তিন হুকবা পর্যন্ত জাহান্নামের আযাব ভোগ করবে। প্রতিটি হুকবার মেয়াদ হলো আশি হাজার বৎসর। সেই হিসাবে এক ওয়াক্ত নামায কাযা করলে দুইশত চল্লিশ হাজার বৎসর পর্যন্ত শাস্তি ভোগ করতে হবে।

এবার বুঝুন! যারা সারা জিন্দেগীতে নামাযই পড়ে না, তাদের কত দীর্ঘকাল জাহান্নামের আযাব ভোগ করতে হবে। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ইরশাদ করেছেন ঃ ইসলাম এবং কুফরের মাঝে পার্থক্য হলো নামায। কিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম নামায সম্পর্কে প্রশ্ন করা হবে।

বস্তুতঃ পরিপক্ক মুমিন তো তিনিই যিনি নামায পড়েন, রোযা রাখেন, সম্পদশালী হলে যাকাত ও হজ আদায় করেন।

যাইহোক, সাহাবায়ে কেরাম রাসূলে কারীম (সাঃ)এর মুখ থেকে যখন তার অসন্তুষ্ট না হওয়ার কথা শুনতে পেলেন, তখন তারা চরম উৎফুল্লিত হলেন। একদিন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপন ফুফাতো ভাই আবদুল্লাহ ইবন জাহাশকে ডেকে বললেন ঃ আমি তোমাকে একটি দায়িত্ব দিতে চাই, সে দায়িত্ব পালন করতে তোমার কোন কষ্ট হবে না তো? আবদুল্লাহ আরয করলেন, আমার কষ্ট হবে? না আনন্দ?

প্রিয়নবী (সাঃ) — হয়ত তোমাকে এমন স্থানে প্রেরণ করা হতে পারে যেখানে যাওয়া তোমার মনপুত হবে না।

আবদুল্লাহ ঃ ভূপৃষ্ঠে এমন কোন জায়গা নেই যেখানে আপনি হুকুম করবেন আর যেতে পারবো না। আল্লাহ তা'আলা ছাড়া আর কাউকে আমি ভয় করি না। আজকে যদি আপনি আমাকে মক্কায় প্রেরণ করেন যেখানকার প্রতিটি অনুকণা মুসলমানদের শত্রু সেখানেও আমার যেতে কোনরূপ দ্বিধা হবে না।

প্রিয়নবী (সাঃ) ঃ জাযাকাল্লাহ, মুসলমান মাত্রই মুজাহিদ হয়ে থাকে,

আর মুজাহিদের জীবনই উৎসর্গ হয়ে থাকে ধর্ম ও জাতির জন্য। আল্লাহর জন্যই তাদের জীবন মরণ। কোন মুমিন ভীতু হয় না। মরদে মুজাহিদ সেই যে আল্লাহ ছাড়া কাউকে ভয় করে না, পরোয়া করে না।

আবদুল্লাহ ঃ আল্লাহর শুকরিয়া, আমি একজন মুজাহিদ।

প্রিয়নবী (সাঃ) ঃ আল্লাহ তোমার জিহাদ কবুল করুন। আচ্ছা ঠিক আছে, তোমার সাথে আরো কয়েকজন সাহাবী নাও। এখনই রওয়ানা হয়ে যাও। আর আমার এই চিঠিটি তোমার নিজের কাছে রেখো। দুদিন পর্যন্ত এ চিঠি খুলবে না। তৃতীয় দিন এটি খুলে পাঠ করে সে মোতাবেক কাজ করবে।

আবদুল্লাহ চিঠিটি হাতে নিলো। তাতে চুম্বন করে আরয করলো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি জানেন, যখন থেকে জিহাদের হুকুম এলো তখন থেকে মুসলমানদের মধ্যে জান উৎসর্গের স্পৃহা বেড়ে গেছে। প্রতিটি কাজে, প্রতিটি অভিযানে সবাই অংশগ্রহণের মনোবাসনা পোষণ করেন। আমার সাথেও সবাই যাওয়ার দরখাস্ত করছেন। তাদের নির্বাচন করা আমার পক্ষে মুশকিল। যাকে সাথে নিবো না তিনিই অভিযোগ করবেন এজন্য আপনি তাদের বাছাই করে দিন। প্রিয়নবী (সাঃ) কয়েকজন সাহাবী বাছাই করে দিলেন।

আবদুল্লাহ ঃ আজকেই রওয়ানা হয়ে যাবো?

রাসূলে কারীম (সাঃ) ঃ আগামীকাল প্রত্যুষে ফজরের নামায পড়ে রওয়ানা হবে।

তখন আসরের আযান হলো। সবাই উঠে নতুন অযু করলেন। আযানের আওয়াজ শোনামাত্রই হাযির হয়ে গেলেন সবাই। জামাআত সহকারে নামায পড়ে যে যার কাজে চলে গেলো।

দ্বিতীয় দিন ফজরের নামায আদায় করে আবদুল্লাহ ইবন জাহাশ সাথী–সঙ্গীদের নিয়ে প্রিয়নবী (সাঃ)এর খেদমতে হাযির হলেন। আরয করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা রওয়ানা হচ্ছি।

প্রিয়নবী (সাঃ) ঃ আল্লাহ হাফেজ। মক্কার পথে যাবে।

আবদুল্লাহ ও তার সাথীগণ রাসূলে কারীম (সাঃ)কে সালাম করে মসজিদে নববী থেকে বেরিয়ে ময়দানে গেলেন। সেখানে তাদের উট বাধা এবং হাওদা প্রস্তুত ছিলো। সেখানে গিয়ে উট খুললেন। রওয়ানা হলেন ওখান থেকে। যেসব মুসলমান তার সাথে যাচ্ছিলেন না তারা অবাক দৃষ্টিতে তাদের দিকে তাকিয়ে রইলেন। যেন এঁরা কোন নেয়ামত অর্জন করতে যাচ্ছেন আর তারা হচ্ছেন বঞ্চিত।

এক এক উটের উপর দুজন করে অগ্র পশ্চাতে সওয়ার। একজন সাহাবী আরোহণ কালে পা পিছলে মাটিতে পড়ে গেলেন। তিনি দ্রুত উঠে দাঁড়ালেন।

আরেক জন সাহাবী তার পাশেই দাঁড়িয়েছিলেন। তার নাম রওয়ানাকারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলো না। তিনি তাড়াতাড়ি গিয়ে বললেন, ভাইয়া! কোন চোট লেগেছে? তিনি বললেন, না, আল–হামদুলিল্লাহ।

তিনি বললেন, আপনি যাবেন না। তার স্থলে আমাকে যেতে দিন। এই কথা বলে অস্থিরচিত্তে তিনি জবাবের অপেক্ষা করছিলেন। সে সাহাবী বললেন, ক্ষমা করবেন। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) আমাকে মনোনিত করেছেন। পিছে থেকে আমি দুর্ভাগাদের অন্তর্ভুক্ত হতে চাই না। ফলে অপর সাহাবী নিরাশ হলেন। সাহাবায়ে কেরাম রওয়ানা হলেন। ময়দানে যেসব মুসলমান দাঁড়িয়ে ছিলেন তারা আল্লাহু আকবার ধ্বনিতে গোটা মদীনার আকাশ বাতাস প্রকম্পিত করে তুললেন। ইয়াহুদী এবং মুশরিকরা চোখ তুলে তাকাতে লাগলো। যখন মুসলমানরা কোন দিকে রওয়ানা হতেন তখনই তাদের মনের সাপ নাড়াচাড়া দিয়ে উঠতো। পরস্পরে আরম্ভ করতো তারা চেঁচামেচি।

আবদুল্লাহ ইবন জাহাশ সাথী–সঙ্গীদের নিয়ে মদীনার বাইরে চলে এলেন। যাত্রা করলেন মক্কার দিকে। একাধারে দুদিন তারা চলতে থাকলেন। তৃতীয় দিনে অবতীর্ণ হলেন এক ময়দানে। তিনি সব সাথীদের ডেকে বললেন ঃ এবার আমি প্রিয়নবী (সাঃ)এর ফরমান খুলে পড়ছি। সবাই শুনুন। সবাই খুব গুরুত্ব দিয়ে শোনার জন্য প্রস্তুত হলেন।

আবদুল্লাহ সে চামড়াটি খুললেন। তাতে লেখা ছিলো প্রিয়নবী (সাঃ)এর ফরমান। তিনি পড়তে আরম্ভ করলেন। তাতে লিপিবদ্ধ ছিলো ঃ

“এক আল্লাহর প্রশংসার পর—আবদুল্লাহ ইবন জাহাশ! জেনে রাখবে, তোমরা বাতনে নাখলে অবস্থান কালে কুরাইশের অপতৎপরতার সন্ধান নিবে। সম্ভব হলে গোয়েন্দা পাঠাবে তায়েফে।”

বাতনে নাখল হলো তায়েফ এবং মক্কার মধ্যবর্তী একটি স্থানের নাম। আবদুল্লাহ ইবন জাহাশ স্বীয় সাথীদের সম্বোধন করে বললেন ঃ আপনারা ফরমান শুনেছেন? সবাই সমস্বরে বললেন, শুনেছি।

আবদুল্লাহ ঃ মনে হয় কুরাইশের অপতৎপরতা ব্যাপক আকারে অব্যাহত রয়েছে।

জনৈক সাহাবী ঃ মনে হচ্ছে অহীর মাধ্যমে প্রিয়নবী (সাঃ) কোন কিছু জানতে পেরেছেন।

আবদুল্লাহ ঃ কিংবা অন্তর্দৃষ্টির মাধ্যমে বুঝতে পেরেছেন।

প্রথমোক্ত সাহাবী ঃ তাও হতে পারে। তিনি আল্লাহর রাসূল।

আবদুল্লাহ ঃ এবার আমরা বাতনে নাখলের দিকে রওয়ানা হতে চাই। তবে তায়েফ থেকে দূর দিয়ে চলা উচিত হবে।

অপর সাহাবী ঃ তায়েফে যাবার কি প্রয়োজন? যাবো তো বাতনে নাখলে। এখনই যেতে চাচ্ছেন?

আবদুল্লাহ ঃ না, আগামীকাল সকালে ফজর নামায পড়ে।

সেদিন তারা সেখানে অবস্থান করলেন। পরদিন ফজরের নামায পড়ে খেজুর খেলেন। সামান্য করে পানি পান করলেন। উট প্রস্তুত করে সামানপত্র তুললেন। অতঃপর সবাই সওয়ার হয়ে রওয়ানা করলেন।

১৪
রহস্যপূর্ণ দুষ্টুমি

রাফিদা এবং মাসউদ দুজনেই সফর করছিলো। তাদের সর্বদা এই আশংকা তাড়া করছিলো যে, জনপদবাসীরা আবার তাদের মুসলমান মনে করে হস্তক্ষেপ করে কিনা। তারা খুব ভালো করে জানতো, মক্কার নিকটবর্তী জনপদবাসী কুরাইশের সাথে ঐক্যচুক্তিতে আবদ্ধ। যেহেতু কুরাইশ মুসলমানের শত্রু অতএব তারা তাদের প্রতি বৈরী হবে না কেন? তারা তো মুসলমানদের কষ্ট দিয়ে, নির্যাতন করে, হত্যা করে মক্কার কুরাইশদের সন্তুষ্টি অর্জনের চেষ্টা নিশ্চয়ই করবে। এজন্য তারা জনপদ থেকে দূরে অবস্থান করতো। কখনও কোন কিছুর প্রয়োজন হলে রাফিদাকে উটনীর কাছে বসিয়ে নিজে জনপদে যেয়ে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র ক্রয় করে নিয়ে আসতো। স্বয়ং রাফিদাও গ্রামে অবস্থান করাকে সঙ্গত মনে করতো না।

একদিন মাসউদ একটি গ্রামের দু–তিন মাইল দূরে অবস্থান করলো। বালুকাময় ময়দান। সারাদিন তেজ হাওয়া প্রবাহমান। জোহরের পর বাতাস কিছুটা স্বাভাবিক হয়ে এসেছে। বালুর উপর ঢেউ তৈরী হয়েছে। বালুর ঢেউগুলো দৃষ্টিনন্দন মনে হচ্ছে। রাফিদার মনে চায় বালুর উপর বসে ঢেউগুলো নিয়ে দেখতে। কিন্তু বালু এতই উত্তপ্ত যে, তার উপর বসা অসম্ভব।

মাসউদ এক টিলার পাদদেশে উটনী বসালো। টিলা থেকে উটনী পর্যন্ত টাঙ্গিয়ে দিলো একটি কম্বল। কিছু কম্বলের ছায়া, কিছু ছায়া টিলার। এইজন্য গ্রীষ্মে তাপ থেকে স্থানটি কিছুটা নিরাপদ। মাসউদ শুয়ে পড়লো, বসে রইলো রাফিদা। সে জিজ্ঞেস করলো, এখান থেকে বদর এখনো কতদূর?

মাসউদ ঃ বড়জোর এক মনযিল।

রাফিদা ঃ এতো সেই বদরই, যেখানে বাৎসরিক মেলা বসে?

মাসউদ ঃ হাঁ, সেই বদরই। কিন্তু তুমি জানলে কিভাবে?

রাফিদা ঃ আমার আব্বু ওকাজ বদরের মেলাগুলোতে অবশ্যই অংশগ্রহণ

করতেন। একবার আমি তার নিকট একটি পাতলা রেশমী কাপড়ের আবেদন করেছিলাম। আমাকে তিনি ধমকিয়েছিলেন।

মাসউদ ঃ কেন?

রাফিদা ঃ তিনি আমার কোন ফরমায়েশই পূরণ করতেন না। কয়েকবার আমি নিজ কানে শুনেছি তিনি আম্মুকে বলছেন, তুমি ভালো করোনি। রাফিদাকে এখনও জ্যান্ত রেখেছো।

মাসউদ ঃ এই পৌত্তলিক বড়ই নির্দয়, সন্ত্রাসী।

রাফিদা মুচকি হেসে বললো ঃ মুশরিক তো আপনিও ছিলেন।

মাসউদ ঃ বাস্তবিকই আমি মুশরিক ছিলাম। আল্লাহর অনুগ্রহে আমি ইসলাম গ্রহণ করেছি। এখন আমি প্রায় সময় চিন্তা করি। আমি যখন ইসলাম ও রাসূলে কারীম (সাঃ)এর আলোচনা শুনেছি তখনই সাথে সাথে কেন মুসলমান হলাম না।

রাফিদা ঃ আপনি শুনেননি প্রতিটি কাজেরই সুনির্দিষ্ট সময় রয়েছে? সময় যখন এসেছে তখন আপনি মুসলমান হয়েছেন। প্রথমে তো বোধহয় আপনিও বিরোধিতা করেছেন তাই না?

মাসউদ ঃ আল্লাহর শুকরিয়া। আমি রাসুলুল্লাহ (সাঃ)–এর বিরোধিতা করিনি। কারণ, প্রিয়নবী (সাঃ) সম্পর্কে দীর্ঘদিন থেকে আমার জানাশোনা আছে। তাঁর সম্পর্কে আমি ওয়াকিফহাল। তিনি সত্য বলেন, মিথ্যাকে ঘৃণা করেন। তিনি বড়ই আস্থাশীল, দিয়ানতদার। প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে চলেন। অনুপম, বিস্ময়কর এক সৎলোক। ইয়াতীম লা–ওয়ারিশদের প্রতি বড়ই সহানুভূতিশীল। আমি যখন শুনতে পেলাম তিনি নবুওয়তের দাবী করেছেন তখন আমার মনে কোন বিস্ময় ছিল না। আমার মন সাক্ষ্য দিতো একদিন তিনি সত্যিই মহামানবে পরিণত হবেন। একজন নবী অপেক্ষা বড় আর কে হতে পারেন?

রাফিদা ঃ আমি যখন তাঁর দর্শন লাভ করেছি তখন তাঁর ব্যক্তিত্বের প্রভাব আমার অন্তরে এরূপ হয়েছিলো যে, মনে চেয়েছে তাঁর উপর জান কুরবান করি। যখন তার জবান থেকে আল্লাহর কালাম শ্রবণ করেছিলাম তখন আমি নিয়ন্ত্রণহীন হয়ে পড়েছিলাম। তখনই আমি পাঠ করেছি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ।

মাসউদ ঃ আক্ষেপ সেসব লোকের উপর, যারা তার জীবন বিধান গ্রহণ করেনি। লানত সেসব লোকের উপর যারা তাঁদের উপর নির্যাতন চালিয়েছে, তাঁকে কষ্ট দিয়েছে।

রাফিদা ঃ কোন সন্দেহ নেই তারা অভিশম্পাতযোগ্য।

এবার মাসউদ উঠে বসে পড়লো। বাইরের দিকে তাকিয়ে বললো, এখন তো অনেক সুশীতল হয়েছে পরিবেশ। নাও, চলো, জনপদ থেকে ঘুরে আসি।

রাফিদা মুচকি হেসে বললো ঃ কি নেব?

মাসউদ ঃ দুষ্টু কোথাকার! মুখে মুখে কথা বলো?

রাফিদা ঃ তওবা, তওবা। কখন আমি আপনার মুখে মুখে কথা বললাম? এরূপ ধৃষ্টতা আমি কখনও দেখাতে পারি?

মাসউদ ঃ আচ্ছা, তোমার জন্য কি আনবো?

রাফিদা ঃ আমার নাম উচ্চারণ করছেন কেন? মনে যা চায় তা নিয়ে আসবেন।

মাসউদ ঃ আচ্ছা, ঠিক আছে।

এই বলে মাসউদ উঠে দাঁড়ালো। চলতে লাগলো। রাফিদা কম্বলের নিচ থেকে বাইরে এসে দেখলো, ছায়া উটনী থেকে আরেকটু সামনে অগ্রসর হয়েছে। সে মাসউদকে লক্ষ্য করে বললো ঃ টাকাকড়িও কিছু হাতে করে নিয়েছেন?

মাসউদ ঃ ও! খুব ভালো কথা স্মরণ করিয়েছো! একদম ভুলে গেছি।

অতঃপর মাসউদ কম্বলের ভিতর প্রবেশ করলো। রাফিদার মাথায় দুষ্টুমি চড়লো। সে টিলার দিক থেকে কম্বল টান দিলো। আল্লাহ্ মালুম টিলার উপর কিসে কম্বল চেপে রেখেছে। কম্বল টান দিতেই কতগুলো বালি এসে পড়লো।

ঘটনাক্রমে মাসউদ সেখানেই ছিলো। গা ঝাড়া দিয়ে কম্বল দূরে ছুড়ে মেরে রাফিদার কাছে এসে বললো ঃ দুষ্টু কোথাকার! কে বলেছে তোমাকে কম্বল টান দিতে?

রাফিদা খুব ভালো মানুষ হয়ে গম্ভীরভাবে বসে রইলো। যেন নিষ্পাপ সরল সোজা মেয়ে, কিছুই জানে না। স্বাভাবিকভাবেই সে বললো ঃ কম্বলে হাত লেগে গেছে, কমবখত বালি উপর থেকে পড়েছে।

মাসউদ ঃ জ্বি, হাত লেগে গেছে। এখন তো নিজেকে এমন বানিয়ে ফেলেছো যেন খুব সহজ সরল নিষ্পাপ।

রাফিদা খিলখিল করে হাসতে লাগলো। এ কারণে তার হাসি পেলো যে, মাসউদের চেহারায়ও বালি পড়েছে। মাসউদ বললো ঃ হাসছো না! তোমার দুষ্টুমি আমি ভালো করেই জানি।

রাফিদা ঃ দিন, আমি ঝেড়ে দিই। সে সহানুভূতির খেয়ালে ঝাড়তে আরম্ভ করলো। মাসউদ তার আঁচল, বালি পড়া তার মুখের দিকে ঝাড়া মারলো। তার চেহারাটা আরো চমকাতে লাগলো কিন্তু রাফিদার চুলগুলো সাদা হয়ে গেলো। মাসউদ তার এই রূপ দেখে হাসতে লাগলো। রাফিদা রুমালে চেহারা

পরিষ্কার করতে গিয়ে বললো ঃ মনে রাখবেন, এর প্রতিশোধ না নিলে আমি রাফিদা নই।[১]

উভয়ে চেহারা, মাথার চুল এবং কাপড় ঝেড়ে পরিষ্কার করলো। মাসউদ গ্রামের দিকে রওয়ানা হলো। রাফিদা দেখলো, বালুর উপর সুন্দর ঢেউ পড়ে আছে। তার মনে চাইলো সেখানে বসতে। ছায়া পৌঁছে গিয়েছে সেখান পর্যন্ত। সে বসলো যেয়ে বালুর ঢেউয়ে। মরুবালুর ঢেউয়ে খেলতে শুরু করলো। কেবলমাত্র বালুর ঢেউ নিয়ে খেলছিলো, হঠাৎ আওয়াজ এলো, বাহবা! আপনি বালুর ঢেউ নিয়ে খেলা করছেন?

রাফিদা একদম হকচকিয়ে গেলো। হরিণীর মতো সুদর্শন চোখ তুলে দেখলো, এক ষোড়শী বেদুঈন যুবতী তার সামনে দাঁড়ানো। ভয় কেটে গেলো। চেহারা হয়ে উঠলো ফর্সা। সে বললো, বোন বসো। মেয়েটি তার সামনে বসে গেলো। সুন্দর তার দেহসৌষ্ঠব। গায়ের রং গোধুমী। গোলগাল চেহারা। ততবেশী রূপসী নয়, কিন্তু যৌবন তাকে সুসজ্জিত করে তুলছে। ফলে একজন খুবসুরত সুন্দরী মনে হচ্ছে। সে বললো ঃ যদি আপনার তারিফ করি তো!

যুবতী ঃ মনে চায়। আপনি এতটাই রূপসী যে, আমাদের গ্রামের কবি দেখলে দেওয়ানা হয়ে যাবে।

রাফিদা ঃ আচ্ছা, তোমাদের জনপদে কবিও থাকেন নাকি?

যুবতী ঃ এক দুজন নয়, কয়েকজন।

রাফিদা ঃ কেউ তোমার প্রশংসা করেছে?

যুবতী ঃ আমি এর যোগ্য নই।

রাফিদা ঃ খুব ভালো করে লক্ষ্য করো তো তোমার সুরত কত সুন্দর মনে হচ্ছে।

যুবতী ঃ কথা বানাবেন না। আমার সুরত সম্পর্কে আমি খুব ভালো জানি। অবশ্য আপনি ....। বাস্তবেই আপনি পরী রাজ্যের পরী। আচ্ছা, তাহলে কোত্থেকে আসছেন?

রাফিদা ঃ মক্কা থেকে।

যুবতী ঃ মক্কায় এত রূপসী মেয়ে থাকে না।

রাফিদা ঃ তুমি কি দেখেছো?

যুবতী ঃ কেমন লাগে? কয়েকবার আমি আমার জননীর সাথে সেখানে গিয়েছি। আমার আম্মা আমীরদের শিশুদের দুধপান করান। দ্বিতীয় বৎসর উনি যান। শীর্ষস্থানীয় নেতাদের বাড়ীতে ঘুরে আসেন। হুবলের শপথ!

টীকা ঃ ১. এখানে দেড় লাইন বাদ দেয়া হয়েছে।—অনুবাদক।

আপনার মতো চাঁদ চেহারার কোন মেয়ে নজরে পড়েনি। কোথায় যাচ্ছেন আপনি?

রাফিদা ঃ মদীনায়।

যুবতী ঃ মদীনা বলবেন না, ইয়াসরিব বলুন।

রাফিদা ঃ শুনেছি এখন নাকি সেটা মদীনাতুন নবী হিসেবে সুপ্রসিদ্ধ হয়ে গেছে।

যুবতী ঃ সেখানে আপনার কোন আত্মীয়-স্বজন আছে কি?

রাফিদা ঃ না।

যুবতী ঃ তাহলে কার কাছে যাচ্ছেন?

রাফিদা ঃ হিজরত করে এসেছি।

যুবতী ঃ আরে আপনিও কি বেদ্বীন হয়ে গেছেন।

রাফিদা ঃ না, বরং ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করেছি।

যুবতী ঃ হুবল আপনার প্রতি দয়া করুন।

রাফিদা ঃ তুমি কি এই জনপদেই বসবাস করো?

যুবতী ঃ হাঁ, আজ রাত কি এখানেই অবস্থান করবেন?

রাফিদা ঃ হাঁ।

যুবতী ঃ গ্রামে আসছেন না কেন?

রাফিদা ঃ আমরা ময়দানেই অবস্থান করি।

এমনিভাবে আরো কতক্ষণ দুজনের সংলাপ চললো। ইতোমধ্যে মাসউদ এসে হাজির। মেয়েটি চলে গেলো। মাসউদ গ্রাম থেকে আনিত জিনিসগুলো রাফিদাকে দেখাতে লাগলো।

১৫

প্রথম গনীমতের মাল

আবদুল্লাহ ইবনে জাহাশ বাতনে নখলে যেয়ে পৌছলেন। এটি ছিলো সেই জায়গা যেখানে মক্কা থেকে তায়েফ এবং তায়েফ থেকে মক্কা গমনকারীদের অবশ্যই অবস্থান করতে হতো। আবদুল্লাহ সেখানে খেজুর বাগানের একদিকে অবস্থান করলেন এবং কুরাইশীদের অপতৎপরতার সংবাদ নেয়ার চেষ্টা করতে লাগলো।

একদিন সেখানে তায়েফ থেকে গমনকারী কয়েকজন লোক অবস্থান করলো। আবদুল্লাহ তাঁদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, তায়েফবাসীরা মুসলমানদের সম্পর্কে কি ধারণা পোষণ করে? তাঁদের মধ্য হতে একজন প্রতিউত্তর

করলো, আপনি জানেন, তায়েফের বিভিন্ন গোত্র লাতের পূজারী। সে শহরে বনী কুহতানের আবাস। তন্মধ্যে উমায়রের গোত্র সবচেয়ে বেশী সম্মানিত। সে পরিবারে আবদে ইয়ালীল ইবন উমর এবং আবদে ইয়ালীলের দু' ভাই মাসউদ এবং হাবীব কবীলার সরদার। এরা তিনজন মক্কার নেতা আবু জেহেল, উমাইয়া, হারিস, শায়বা ও অন্যান্যদের সাথে সুগভীর সম্পর্ক রাখে। আবু জেহেল তো ইসলামের সাথে শত্রুতার ব্যাপারে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। আবদে ইয়ালীল, মাসউদ, হাবীব আবু জেহেলের ইশারায় ইসলাম বিদ্বেষী ভূমিকায় প্রস্তুত থাকে। কিন্তু সাধারণ জনগণ ইসলাম সম্পর্কে সুধারণা পোষণ করে। তারা মুসলমানদের সাথে মিলেমিশে থাকতে চায়। কিন্তু করবে কী? নেতাদের ভয়ে তারা জড়সড়, অপারগ।

আবদুল্লাহ ঃ তায়েফের সাধারণ লোকজন মক্কার জনগণের অনুসরণ করছে না? মক্কার নেতৃবৃন্দ মুসলমানদেরকে যতই বাধা দিয়েছে, তাদের সম্মুখে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করেছে কিন্তু অধিকাংশ জনগণ তার প্রতি কর্ণপাত করেনি। তারা মুসলমান হয়ে মদীনায় হিজরত করে চলে গেছে।

সে আরব বললো ঃ আসলে ব্যাপারটি হচ্ছে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কায় অবস্থান করতেন। তাঁর শিক্ষাদীক্ষা ও উপদেশ মানুষের মনের গভীর রেখাপাত করতো। তিনি তায়েফে একবার গিয়েছিলেন। আবদে ইয়ালীল এবং তাদের ভ্রাতৃবৃন্দ তাঁর খুব বিরোধিতা করেছিলো। তিনি মন খুলে সেখানে কিছু উপদেশ বাণীও শোনাতে পারেননি। তারা তা করতে দেয়নি। বরং গুণ্ডাদেরকে তাঁদের পেছনে লেলিয়ে দিয়েছে। এজন্য আমরা তায়েফবাসীরা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শিক্ষাদীক্ষা ও আদর্শ, লক্ষ্য সম্পর্কে অবহিত হতে পারিনি। তবে আমরা যখনই শুনেছি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর সাথীদের উপর মক্কার কুরাইশরা মারাত্মক জুলুম নির্যাতন করেছে তখনই আমাদের অন্তরে সহানুভূতির সঞ্চার হয়েছে।

বস্তুতঃ সে আরব বেদুইন ঠিকই বলেছিলো। মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মক্কাবাসীদের অবাধ্যতা ও বিদ্রোহ দেখে তাদের ইসলাম গ্রহণ থেকে নিরাশ হয়ে গেলেন, তখন শাওয়াল মাসের ১০ তারিখে তাশরীফ নিয়ে গেলেন তায়েফে।

তায়েফ মক্কা থেকে প্রায় ৬০ মাইল দূরে একটি মহানগরী। সেখানে প্রচণ্ড গরমের কালেও অধিক গরম পড়ে না। আরবের বিত্তশালী লোকেরা গ্রীষ্মের মৌসুমে তায়েফ চলে যায়। যেমন যায় ভারতীয়রা গ্রীষ্মকালে মিসৌরী এবং শিমলা।

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তায়েফের নেতাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দিলেন। বস্তুতঃ নেতারা একটু আহাম্মক ধরনের হয়ে থাকে। যেসব কারণে তাদের নেতৃত্বে চোট লাগে অথবা তাদের মানসম্মানে ভাটা পড়ে তারা সেগুলোর চরম বিরোধিতা আরম্ভ করে। তাদের এদিকে দৃষ্টিপাত হয় যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নতুন ধর্মের শিক্ষা দিয়ে জনগণকে সাম্যের বাণী শুনিয়ে তাদেরকে নেতাদের শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করতে চান। ফলে সেসব বদবখ্‌ত— দুর্ভাগা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে সাংঘাতিক দুর্ব্যবহার করতে আরম্ভ করলো। চরম বেয়াদবী এবং অমানুষত্ব প্রদর্শন করলো। তাদের মধ্য থেকে একজন বললো, "তুমি যদি আল্লাহর রসূল হতে তাহলে ভবঘুরের ন্যায় এভাবে টো টো করে রাস্তায় ঘুরে বেড়াতে না। যদি তোমার মত হতদরিদ্র ব্যক্তিকে আল্লাহ তা'আলা রসূল বানিয়ে থাকেন তাহলে নিশ্চয়ই কা'বার সম্ভ্রম নষ্ট করেছেন।"

আরেকজন দুর্মুখা বললো, "আল্লাহ তা'আলা তোমাকে ব্যতীত অন্য আর কোন মানুষ পাননি রসূল বানাতে।"

তৃতীয়জন বললো, "আমি তোমার সাথে কথা বলতে চাইনে। যদি তুমি প্রকৃত রাসূল হয়ে থাক, তাহলে তোমার সাথে কথা বলা বেয়াদবী। আর যদি তুমি মিথ্যাবাদী হয়ে থাক, তাহলে তোমার সাথে আমার কথা বলা সাজে না।

শুধু এতটুকুই নয়, বরং সেসব দুর্ভাগারা নিজেদের দাস এবং শহরের গুণ্ডাপাণ্ডাদেরকে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পিছনে লেলিয়ে দেয়। তিনি যখন কোথাও দাঁড়াতেন এবং লোকজনকে একত্রিত করে উপদেশ দিতে শুরু করতেন, তখনই বদমাশ প্রকৃতির লোকগুলো গণ্ডগোল করতো, হৈচৈ করতো, তালি বাজাতো, বিভিন্ন রকমের অশ্লীল বাক্যবাণে জর্জরিত করতো এবং তাঁর প্রতি ঢিল ছুঁড়ে মারতো।

কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এসব বাড়াবাড়ি ও বর্বর আচরণ সত্ত্বেও স্বীয় দায়িত্ব পালন করে যেতেন। আল্লাহর বাণী বান্দাদের নিকট পৌছানোর চেষ্টা করতেন। অতঃপর সেসব বদমাশ লোকগুলো পথিমধ্যেই দু' সারিতে দাঁড়িয়ে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দেহে, পায়ের গোছার উপর পাথর মেরে রক্তাক্ত করে ফেললো। প্রিয়নবীর পায়ের জুতোগুলো রক্তে ভরে গেলো। তিনি মারাত্মকভাবে আহত হয়ে মাটিতে বসে পড়লেন। সন্ত্রাসীরা জোর করে তাঁকে দাঁড় করালো, পাগল বলে তাঁর প্রতি পাথর ছুঁড়তে লাগলো.......। মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেখান থেকে চলে আসলেন। সেসব বদবখতগুলো তিনমাইল পর্যন্ত তাঁর পশ্চাৎধাবন করলো। আবদুল্লাহ ইবন জাহাশ সে বেদুইনকে লক্ষ্য

করে বললেন, মনে হয় তোমার মধ্যেও মুসলমানদের প্রতি সহানুভূতি জন্মেছে।

বেদুইন ঃ অনেক বেশী।

আবদুল্লাহ ঃ তুমি ইসলামকে কেমন ধর্ম বলে মনে করো?

বেদুইন ঃ আমি ইসলাম সম্পর্কে তেমন কিছু জানি না।

আবদুল্লাহ ঃ আচ্ছা, তুমি আমার একটা কাজ করে দাও।

বেদুইন ঃ আপনি কি মুসলমান?

আবদুল্লাহ ঃ হাঁ।

বেদুইন ঃ বলুন।

আবদুল্লাহ ঃ তুমি কি মক্কা যাচ্ছ? তুমি আমাকে একটা সংবাদ এনে দিবে। মক্কার কুরাইশরা এখন কি করতে চায়।

বেদুইন ঃ আমি জানি। এক সপ্তাহ হলো যখন আমি মক্কা থেকে আসছি সেখান থেকে একটি বাণিজ্যিক কাফেলা আবু সুফিয়ানের নেতৃত্বে বেরিয়েছিলো। সে কাফেলায় মক্কার লোকদের প্রচুর ধনসম্পদ রয়েছে। জনগণ আশংকা করছে, মুসলমানরা এ কাফেলার উপর কোন আক্রমণ করে বসে কি না—এসব মালামাল লুট করে নিয়ে যায় কিনা। এজন্য এরা এ কাফেলার অপেক্ষা করছে অত্যন্ত অধৈর্য হয়ে।

আবদুল্লাহ ঃ মুসলমানদের বিরুদ্ধে কোন ষড়যন্ত্র করছে না তো?

বেদুইন ঃ না।

দ্বিতীয় দিন তায়েফ থেকে আগত এই কাফেলা মক্কার দিকে রওয়ানা হয়ে গেলো। তারা সেখানেই অবস্থান করছিলো। তৃতীয় দিন কিছু উষ্ট্রারোহী মক্কা থেকে আসার সময় সেখানে অবস্থান করলো। আবদুল্লাহ তাদের কাছে গেলেন। জিজ্ঞেস করলেন, মক্কাবাসীদের কোন সংবাদ তোমাদের জানা আছে? বস্তুতঃ এরা ছিলো আবু জেহেলের কিছু চেলাচামুণ্ডা। তাদের মধ্য থেকে একজন বলে উঠলো, “দুর্ভাগা মুসলমানদের কারণে মক্কাবাসী ভীষণ উদ্বিগ্ন। তারা আশংকা করছে, মুসলমানরা তাদের এই বিরাট কাফেলার উপর আক্রমণ করে মালামাল ছিনতাই করে নিয়ে যায় কিনা। এই কাফেলায় রয়েছে মক্কাবাসীদের বিরাট পুঁজি।”

আবদুল্লাহ ঃ কিন্তু আক্রমণের সূচনা তো করেছে স্বয়ং মক্কাবাসীরাই। কুরয্ মুসলমানদের চারণভূমিতে আক্রমণ করে তাদের উট ইত্যাদি ছিনতাই করে নিয়ে এসেছে।

লোকটি বললো ঃ আমরা মুসলমানদের কোন রহস্য বুঝতে পারিনি। তারা আমাদের উপাস্যদের বিরুদ্ধে কেন লেগেছে? এজন্যই তো আমরা

তাদেরকে ক্ষতিগ্রস্ত করছি। এতেই সওয়াব মনে করি।

আবদুল্লাহ ঃ তাহলে মুসলমানদের ভয় করছেন কেন?

লোকটি চুপ হয়ে গেলো। তার পরদিন আবদুল্লাহ প্রত্যাবর্তন করলো। তিনি জানতে পারলেন, মক্কায় কুরাইশ এখন স্বীয় বাণিজ্যিক কাফেলার নিরাপত্তার বিষয়টি নিয়ে উদ্বিগ্ন। তারা আপাততঃ মুসলমানদের বিরুদ্ধে কিছু করতে চাইছে না। আবদুল্লাহ শুধু দুই মনজিলেই অতিক্রম করেছিলেন। সেখানে একটি কাফেলাকে অবস্থান করতে দেখলেন। এই কাফেলাটিও ছিলো মক্কার। আমর ইবন আবদুল্লাহ হাযরামী ছিলো এই কাফেলার অধিনায়ক। সেও ছিলো একজন কুরাইশ নেতা এবং মুসলমানদের বড় শত্রু। তার সাথে ছিলো উসমান ইবন আবদুল্লাহ এবং হাকাম ইবন কায়সান। এরা দু'জনই কুরাইশের অভিজাত শ্রেণীর লোক।

আবদুল্লাহ তার সাথীদেরকে লক্ষ্য করে বললেন, "কুরাইশের একটি কাফেলা তোমাদের সামনে এসে গেছে। সে কাফেলাটিকেই ধরো আল্লাহ তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ করুন।

তাঁর সাথীরা প্রস্তুতি নিলেন। আমর ইবন আবদুল্লাহ হাযরামী বিষয়টি দেখলো সে তার সাথীদেরকে চিৎকার করে বললো, হুবলের শপথ, এরা মুসলমান। তাদের হত্যা করা বিরাট সওয়াবের কাজ। তাদের উপর আক্রমণ করো। তৎক্ষণাৎ সবাই প্রস্তুতি নিয়ে মোকাবিলা করার জন্য এসে গেলো। তারা মুসলমানদের উপর আক্রমণ করলো। এর ফলে মুসলমানদের মধ্যে উত্তেজনা সৃষ্টি হলো। কারণ, তাদের সাথী কুরয ইবন জাবের মুসলমানদের চারণভূমিতে আক্রমণ করে উট ছিনতাই করে নিয়েছিলো। তারা মুসলমানদের উপর মারাত্মক কঠোরতা আরোপ করেছিলো। এসব কাফির প্রচণ্ড আক্রমণ করলো মুসলমানদের উপর। ফলে মুসলমানরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে এবং প্রচণ্ড উত্তেজনায় বীরবিক্রমে আক্রমণ চালালো। মক্কাবাসী ভয়ে পিছু হটতে বাধ্য হলো। মুসলমানরা তাদের কয়েকজনকে হত্যা করে ফেললো। আবদুল্লাহ ইবন জাহাশ আমর ইবন আবদুল্লাহ হাযরামীর উপর আক্রমণ চালালেন। সেও তার মোকাবিলা করলো। দু'জনই ছিলো অভিজ্ঞ বীর বাহাদুর। তারা খুব বীরত্বের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হলো। আবদুল্লাহ খুব উত্তেজিত হয়ে প্রচণ্ড শক্তি নিয়ে হামলা করলো। তার তলোয়ার আমরকে কেটে দু' টুকরো করে ফেলল।

মক্কাবাসীদের হতাহতের পর শোর-হাঙ্গামা শুরু হয়ে গেলো। তারা বুঝতে পারলো, মোকাবিলা অব্যাহত থাকলে সবগুলো মারা পড়বে। তারা ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে অস্ত্রশস্ত্র ফেলে দিলো। মুসলমানরা তাদের মাথার উপর থেকে তলোয়ার উঠিয়ে নিলো, গ্রেফতার করলো তাদেরকে। সে

গ্রেফতারকৃতদের মধ্যে উসমান ইবন আবদুল্লাহ এবং হাকাম ইবন কায়সানও ছিলো। তাদের গ্রেফতার করে মুসলমানরা কাফেলার সমস্ত মালামাল ছিনিয়ে নিলো। উটগুলো সব তাদের অধীনে নিয়ে এলো। এ ছিলো সর্বপ্রথম গনীমতের মাল যেগুলো মুসলমানদের হস্তগত হয়েছিলো। মক্কাবাসীরা যতগুলো উট মুসলমানদের থেকে ছিনিয়ে নিয়েছিলো এখানে ছিলো তার চেয়ে অনেক বেশী। এর ফলে মুসলমানরা খুবই আনন্দিত হলো। মালসামান একত্রিত করে উটের উপর তুললো। কয়েদীদেরকে উটের উপর আরোহণ করিয়ে তারা রওয়ানা হলো। এই অভিযানে তাদের সাফল্য অর্জিত হয়েছিলো। ফলে খুব দ্রুত মদীনার দিকে রওয়ানা হলো। পৌঁছলো মদীনায়। সাহাবীগণ কয়েদী এবং গনীমতের মাল নিয়ে প্রত্যাবর্তন করছেন দেখে মুসলমানগণ ভীষণ আনন্দিত হলেন এবং আল্লাহু আকবার ধ্বনি তুললেন। ইয়াহুদী এবং অংশীবাদীরা এবার তাদের দিকে মাথা উঁচু করে দেখতে লাগলো। তারাও ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পড়লো। ভেঙ্গে গেল মন তাদের।

১৬

মুসলমানদের আফসোস

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হুজরা শরীফে তাশরীফ নিয়েছিলেন। দুজাহানের সরদার যে হুজরায় তাশরীফ নিয়েছিলেন সেটি ছিলো কাঁচা ইটের তৈরী। ছাদের শাহতীরগুলো ছিলো খেজুর গাছের তৈরী। তার উপর বিছানো ছিলো খেজুরের পাতা। এর উপর মাটি বিছিয়ে দেয়া হয়েছিলো। অধিকাংশ সময় বৃষ্টি হলেই ছাদ থেকে পানি চুইয়ে পড়তো। কিন্তু প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পার্থিব শান–শওকত, আরাম–আয়েশ ও বিলাসিতার প্রতি কোনই আকর্ষণ ছিলো না। ফলে বৃষ্টির পানি ঘরে পড়লে হুজরা মুবারক ভিজে গেলেও সেদিকে লক্ষ্য করতেন না। তাঁর দাসানুদাসরা আকাশছোয়া মহল তৈরী করিয়েছে, শানদার মজবুত ইমারত তৈরী করেছে এবং আকাশচুম্বী অদ্বিতীয় রাজকীয় প্রাসাদ বানিয়েছে। অথচ প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাঁচা মাটির হুজরায় জীবন অতিবাহিত করেছেন। এটা এজন্য নয় যে, তিনি প্রাসাদ তৈরী করতে পারতেন না। কারণ, তাঁর কাছে গনীমতের প্রচুর মাল এসেছিলো। সেসব ধনসম্পদ ব্যয় করে রাজকীয় সুউচ্চ প্রাসাদ তিনি তৈরী করতে পারতেন। কিন্তু তিনি তাঁর উম্মতকে সরল–সহজ, সাদাসিধে জিন্দেগীর শিক্ষা দিতে চাচ্ছিলেন। তাই তিনি মূল্যবান প্রাসাদ তৈরী করেননি, এদিকে মনোযোগ

দেননি। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম–এর উক্তি ছিলো, স্বীয় নেক আমলের মাধ্যমে পরকালের মহল তৈরী করা দরকার। দুনিয়ার প্রাসাদ, রাজকীয় জাঁকজমক, আসবাব–উপকরণ সবই ক্ষণস্থায়ী।

সারকথা, হযরত রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হুজরা শরীফে তাশরীফ রাখছিলেন। এমতাবস্থায় তিনি মুসলমানদের নারায়ে তাকবীর ধ্বনি শুনলেন। ফলে খুব দ্রুত তিনি হুজরা শরীফ থেকে বেরিয়ে মসজিদে চলে আসলেন। মসজিদে তাশরীফ আনয়নের পর আবদুল্লাহ ইবন জাহাশ এবং তার সাথীরা মসজিদে প্রবেশ করলেন। সাথে সাথে আগমন ঘটলো অনেক সাহাবায়ে কেরামের। রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদের আঙ্গিনায় দাঁড়ালেন। আবদুল্লাহ এবং তার সাথীগণ 'আসসালামু আলাইকা ইয়া রাসূলাল্লাহ' বলে প্রিয়নবীকে অভিবাদন জানালেন। তখন মসজিদের সামনে সে উটটিও হাজির হলো, যার উপর ছিলো কয়েদী আরোহী এবং গনীমতের মাল বোঝাই। নবীজী (সাঃ) তা দেখলেন এবং সেখানেই মসজিদের আঙ্গিনায় বসে পড়লেন। আবদুল্লাহ এবং তার সাথী অন্যান্য সাহাবায়ে কেরাম নবীজীর সামনে বসে পড়লেন। নবীজী জিজ্ঞেস করলেন, এরা কারা? এ সামানপত্র আসলো কোত্থেকে?

আবদুল্লাহ আরয করলেন ঃ আমাদের প্রত্যাবর্তনের সময় কোরাইশের এক কাফেলার সাথে আমাদের সাক্ষাৎ হয়েছিলো। সে কাফেলার অধিনায়ক ছিলো আমর ইবন আবদুল্লাহ হাযরামী। আমরা সে কাফেলার উপর আক্রমণ চালিয়ে আমরকে হত্যা করি এবং এ কয়েদী আর মালে গনীমত সেই কারাভাঁরই।

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঃ কাফেলার উপর আক্রমণ কোন্ মাসে করেছ?

আবদুল্লাহ ঃ সম্ভবতঃ জুমাদাস সানীর ঊনত্রিশ তারিখে।

এতদশ্রবণে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নীরব হয়ে গেলেন। আবদুল্লাহ ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পড়লেন। তিনি ভাবলেন, এই তারিখে আক্রমণ করা নবীজীর মর্জির বিপরীত হয়েছে।[১] ফলে তিনি আরয করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি ভুল করে ফেলেছি।

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঃ আল্লাহ তা'আলাই ভাল জানেন। তোমার জানা ছিলো না, সে তারিখটি ছিলো সম্মানিত রজব মাসের পহেলা তারিখ।[২] রজবের মাস হারাম মাসগুলোর অন্তর্ভুক্ত। সে মাসগুলোতে

টীকা ঃ ১. কারণ, সে দিনটি ছিলো মূলতঃ রজবের প্রথম তারিখ।

২. ঈষৎ পরিবর্তিত।

আরবে লড়াই মূলতবী হয়ে যেতো। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও সে মাসগুলোর সম্মান করতেন।

আবদুল্লাহ আরয করলেন ঃ আমি জানতাম হয়তো সে মাসে নতুন চাঁদ উদিত হবে। যেহেতু সে চাঁদ হারাম মাসের নয় সেহেতু আক্রমণে আমি দ্বিধাবোধ করিনি।

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঃ বিষয়টিকে আমি আল্লাহর হাওয়ালা করছি। এ সম্পর্কে যতক্ষণ পর্যন্ত কোন ওহী নাযিল না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত এই গনীমতের মাল আলাদা রাখবে। কয়েদীদেরকে রাখবে তুমি তোমার যিম্মায়। তবে খেয়াল রাখবে তাদের যেন কোন কষ্ট না হয়।

একজন সাহাবী আরয করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এরা যারা বন্দী হয়ে এসেছে তারা বদবখত, মুসলমানদের খুব কষ্ট দিতো, ইসলামকে মিটানোর সকল চেষ্টা করতো। তাদের সঙ্গে সদ্ব্যবহার মানে তাদের সাহস বৃদ্ধি নয়কি?

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঃ না, ব্যাপারটি তা নয়। ইসলাম সাম্য এবং আদর্শ শিক্ষা দেয়। একজন মুসলমানের দায়িত্ব হলো, নৈতিকতার চরম পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করা। চরিত্রহীন লোক চতুষ্পদ জন্তুর চেয়েও অধম। চরিত্র মানবতার হার। মুসলমানদের হাতে আখলাক–নীতি–নৈতিকতা ও সাম্যের তলোয়ার বিদ্যমান। যে সাহাবী বলেছিলেন, তারা বদবখত, মুসলমানদের কষ্ট দেয়, ইসলামের আলোকে নির্বাপিত করার চেষ্টা করে, তিনি লজ্জিত হলেন। তিনি বললেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! এটা আমার ঈমানের দুর্বলতা, যার ফলে এরূপ কথা বলে ফেললাম।

রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুচকি হাসলেন। বললেন, না, এটা দুর্বলতার প্রমাণ নয়। যেহেতু মুসলমানরা নির্যাতিত, তাই তাদের মধ্যে প্রতিশোধ স্পৃহা রয়েছে। এটা মানুষের স্বাভাবিক প্রবণতা। কিন্তু একজন মুমিন পূর্ণাঙ্গ মানব। একজন পূর্ণাঙ্গ মুসলমানের কাজ নিকৃষ্টতম শত্রুকেও ক্ষমা করে দেয়া। যাদের তোমরা ক্ষমা করে দিবে, কাল তোমাদের সামনে চোখ বন্ধ করে মাথা নত করবে। আজকে তারা দূরে, কালকে তোমাদের নিকটতম হয়ে যাবে এবং তাওহীদের বাণী অন্তরে লালন করে তোমাদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে। বিশ্বস্রষ্টা পরওয়ারদিগারে আলম তোমাদের প্রতি খুশী হবেন। কারণ, তোমরা খোদাদ্রোহীদেরকে তাঁর অনুগত লোকদের সারিতে দাঁড় করিয়েছ।

সবাই অত্যন্ত নীরবতার সাথে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথা শ্রবণ করছিলেন। তিনি যা ইরশাদ করছিলেন, তার উপর আমল করার জন্য চেষ্টা করছেন। তখনও হাজিরীন সবাই অত্যন্ত খামোশ হয়ে বসেছিলেন,

নবীজীর ইরশাদ শুনছিলেন। কত সৌভাগ্যবান তাঁরা! যারা বনী আদমের গর্ব হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দর্শন লাভ করতে পেরেছিলেন! তাঁর পবিত্র বাণী শুনতে পেরেছিলেন, তাঁর ফয়েয ও বরকত লাভ করতে পেরেছিলেন! তাঁর কথামত আমল করতে পেরেছিলেন! বিশ্ব তাঁদের পদচুম্বন করেছিলো। আল্লাহ তাঁদের প্রতি খুশী ছিলেন। আখেরাতেও তাঁদের জন্য জান্নাত তৈরী হয়েছে। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ যে ব্যক্তি আমার রওযা যিয়ারত করলো, সে যেন আমার সাথেই সাক্ষাৎ লাভ করলো। তাঁরা সৌভাগ্যবান, যাঁরা হজ্জের উদ্দেশ্যে যেতে পারছেন। রওযায়ে আতহারের সবুজ গম্বুজে প্রবেশ করে রওযা মুবারক যিয়ারতে ধন্য হয়েছেন।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবদুল্লাহ ইবন জাহাশকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ কুরাইশের অপতৎপরতা সম্পর্কে কোন সংবাদ জানতে পেরেছ?

আবদুল্লাহ ঃ শুধু এতটুকুই সংবাদ পেয়েছি, তাদের একটি বিরাট কাফেলা অনেক সম্পদ নিয়ে আবু সুফিয়ানের নেতৃত্বে শামদেশে বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে গিয়েছে। মক্কাবাসী সে কাফেলার জন্য মহাউদ্বিগ্ন। তাদের চিন্তা প্রচুর টাকার বাণিজ্যিক সম্পদ সে কাফেলায় রয়েছে। কম দামী বেশী দামী প্রচুর সম্পদ তাদের সাথে আছে। তারা শুনেছে মুসলমানগণ এই কাফেলার উপর আক্রমণ করার চেষ্টা করছে। তারা এই চিন্তায় ভীষণ পেরেশান। এই উদ্বেগ–উৎকণ্ঠায় তারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে নতুন ষড়যন্ত্রের কথা প্রায় বিস্মৃতই হয়ে গেছে।

নবীজী (সাঃ) মুচকি হাসলেন। তাঁর অভ্যাস ছিলো কোন ভাল কথা শুনলে অথবা কোন বিষয় তাঁর স্বভাবসম্মত হলে আনন্দিত হতেন এবং মুচকি হাসি দিতেন। ইতিহাসের কিতাবে লেখা আছে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনও অট্টহাসি হাসতেন না।

নবীজী (সাঃ) ইরশাদ করলেন ঃ এতদিন মুমিনগণ উদ্বিগ্ন ছিলো। এবার ইনশাআল্লাহ কুরাইশের উদ্বেগের সময় এসেছে। তাদের উচিত হয়নি মক্কা থেকে তিনশ' মাইল দূরে এসে আমাদের চারণভূমিতে আক্রমণ করা। আল্লাহ আমাদের ধৈর্য্যের পরীক্ষা নিচ্ছিলেন। আলহামদুলিল্লাহ, আমরা সে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছি। আল্লাহর পক্ষ থেকে আমাদের উপর জিহাদের নির্দেশ এসেছে। শুনো, যারা আল্লাহর পথে জিহাদ করবে তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত। জিহাদে যারা শহীদ হবে, তাদের সমুদয় গোনাহই মাফ হয়ে যাবে।

এতদশ্রবণে সাহাবায়ে কেরাম খুব আনন্দিত হলেন। তাদের শিরা–

উপশিরায় জিহাদী স্পৃহা এসে গেলো। সবাই কামনা করতে আরম্ভ করলো, জিহাদে যেয়ে শহীদ হবো। বাস্তবতাও তাই যে, জিহাদে যেয়ে শহীদ হওয়ার ভাগ্য ক'জনের। সৌভাগ্যবানরাই শাহাদাত লাভ করতে পারেন। শহীদদের হিসাব–কিতাব হবে না। জান্নাতুল ফিরদাউসে রাজকীয় প্রাসাদে এবং উত্তম স্থানে তাঁরা অবস্থান করবেন। দামী পোশাক এবং বিভিন্ন প্রকার মূল্যবান সামগ্রীর মালিক হবেন। যাঁরা জিহাদ করে গাজী হবেন, তাঁরাও হবেন জান্নাতের যোগ্য।

নবীকরীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবদুল্লাহ এবং তাঁর সাথীদেরকে আরাম করার নির্দেশ দিলেন। তাঁরা চলে গেলেন। নবীজীও গমন করলেন স্বীয় হুজরায়।

কয়েক দিন পর্যন্ত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ ব্যাপারে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত ছিলেন। হারাম মাসে সাহাবায়ে কেরাম কুরাইশ কাফেলার উপর আক্রমণ করেছে, এটা ঠিক হয়নি। অতএব, একদিন তিনি আবদুল্লাহ ইবন জাহাশ এবং তার সহগামী সাথীদেরকে ডেকে বললেন; "তোমরা হারাম মাসে হামলা করেছ, এ বিষয়টি খেয়াল করলে না যে, আমি তোমাদের আক্রমণের অনুমতি দেইনি। তোমাদের রওয়ানা করার দু'টি উদ্দেশ্য ছিলো মাত্র। এক তো কুরাইশরা এ কথা জেনে যাক, আমরাও তাদের পথে প্রতিবন্ধক হতে পারি। মোটকথা, তাদের শাসানো উদ্দেশ্য ছিলো।"

আবদুল্লাহ আরয করলেন, বাস্তবিকই আমাদের ভুল হয়ে গেছে। ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি আমাদের এই ভ্রান্তির জন্য আল্লাহর কাছে দুআ করুন। তিনি যেন আমাদের ক্ষমা করে দেন।

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঃ তোমাদের কোন ভুল হয়নি। মূলতঃ কুরাইশের কাফিররা আমাদের উপরে এত মারাত্মক জুলুম–নির্যাতন চালিয়েছিলো যারফলে আমাদের অন্তরে প্রতিশোধের স্পৃহা দাউ দাউ করে জ্বলে উঠছিলো। আমিও ক্ষমা প্রার্থনা করছি, তোমরাও আল্লাহর দরবারে তওবা–ইস্তিগফার করো। এতদশ্রবণে সমস্ত সাহাবায়ে কেরাম চিন্তিত হলেন। তাঁদের চক্ষুদ্বয় প্রায় অশ্রুসিক্ত হয়ে পড়ল। সবাই পস্তাতে আরম্ভ করলেন। তারা বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা লজ্জিত, অন্তর থেকে তওবা–ইস্তিগফার করছি, আপনি আমাদের জন্য দু'আ করুন।

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঃ আমি দু'আ করবো।

অতঃপর নবীজী (সাঃ) উঠে চলে গেলেন। সাহাবায়ে কেরাম সেখানেই ঠায় বসে রইলেন।

১৮
ভীত-সন্ত্রস্ত বাণিজ্যিক কাফেলা

রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাণিজ্যিক কাফেলার উপর আক্রমণ করার জন্য লোকজন বাছাই করছিলেন। তখন জুযাম গোত্রের এক ব্যক্তি মসজিদের আঙ্গিনায় বাইরে দাঁড়িয়েছিলো। সে যখন শুনলো, আবু সুফিয়ানের কাফেলার উপরে আক্রমণের উদ্দেশ্যে লোকজন যাচ্ছে। তখন সে জাতীয় সহানুভূতির তাড়নায় বেচইন হয়ে পড়লো। সেও ছিলো মুশরিক এবং মক্কার পৌত্তলিকদের মিত্র। কতক্ষণ দাঁড়িয়ে সে চিন্তা করছিলো। কি জানি কি খেয়ালে কতক্ষণ দাঁড়িয়েছিলো। অতঃপর দ্রুত ওখান থেকে প্রস্থান করলো। যেয়ে পৌঁছলো মুনাফিক আবদুল্লাহ ইবন উবাই ইবন সালূলের নিকট। তাঁর কাছে যেয়ে বললো, "এবার তো মুসলমানদের সাহস অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে।"

আবদুল্লাহ ঃ কি হয়েছে?

জুযামী ঃ আপনি জানেন, আবু সুফিয়ান হাজার হাজার টাকার বাণিজ্যিক পণ্য নিয়ে শাম দেশে গেছেন। আজকে মুসলমানরা সে কাফেলার মালামাল ছিনতাই করার জন্য রওয়ানা হয়েছে।

আবদুল্লাহ ইবন উবাই ঃ মক্কার কুরাইশদের অদূরদর্শিতা ও নির্বুদ্ধিতার কারণেই মুসলমানদের এতটুকু সাহস বেড়েছে। যদি তারা আমার কথামতো চলতো, তাহলে এতদিন মুসলমানরা নিঃশেষ হয়ে যেতো। বিনাশ হয়ে যেতো তাদের অস্তিত্ব।

জুযামী ঃ কুরাইশ তো একটা প্রতিনিধিদল আপনার কাছে প্রেরণ করেছিলো। আপনি তাদের কোন কৌশল শিখিয়ে দিলেন না কেন?

আবদুল্লাহ ইবন উবাই ঃ তোমার জানা আছে, আমি বাহ্যতঃ মুসলমানদের মিত্র। আমি যদি প্রকাশ্যে তাদের বিরোধিতা করতাম তাহলে আমার মান-ইজ্জত এবং প্রভাব-ক্ষমতা ভূলুণ্ঠিত হয়ে যেতো। বাহ্যতঃ আমি মুসলমানদের বিরোধিতা করতে পারছি না। তা সত্ত্বেও যতটুকু করা সম্ভব করছি।

আবদুল্লাহ ইবন উবাই ছিলো তীক্ষ্ণ বুদ্ধিসম্পন্ন, ধূর্ত, চালাক, হুঁশিয়ার ও ধুরন্ধর ব্যক্তি। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হিজরত করে মদীনায় আসার কিছুদিন আগে মদীনার লোকদের মধ্যে পরস্পরে যুদ্ধ হয়েছিলো। মদীনা নগরীতে বড় দু'টি গোত্র ছিলো। এক গোত্রের নাম আউস, অপরটির নাম খাযরাজ। এ দু'টি গোত্রের লোকদের মধ্যে যুদ্ধ হয়েছিলো এবং লড়াই হয়েছিলো খুব প্রচণ্ড ধরনের। দু'টি দলই লাগাতার যুদ্ধে দুর্বল হয়ে পড়েছিলো।

ক্ষমতা বাড়ানোর বিরাট একটি মোক্ষম সুযোগ এসে গেলো আবদুল্লাহ ইবন উবাইয়ের। সে উভয় গোত্রের মধ্যে নিজের প্রভাব প্রতিপত্তি এরূপ বাড়িয়ে ফেললো যে, তারা উভয়ে তাকে নেতা হিসেবে স্বীকৃতি দিয়ে ফেললো। কিন্তু আবদুল্লাহ ইবন উবাই শুধু নেতা হয়েই সন্তুষ্ট ছিলো না। তার মনের আকাংখা ছিলো সে মদীনার রাজা হবে। সম্রাট হওয়ার ফন্দি–ফিকিরেই সে ছিলো। এজন্যই সে আউস, খাযরাজ গোত্রের শীর্ষস্থানীয় ও বর্ষীয়ান নেতাদের কাছে বললো, "আগত দিনের খুনাখুনি তখনই বন্ধ হতে পারে যদি আপনারা কাউকে এখনি আপনাদের সম্রাট বানিয়ে নেন। সবাই বিষয়টি উপলব্ধি করলো। অতঃপর সে এজন্য প্রচেষ্টাও চালালো। দু'টি গোত্রই তাকে সম্রাট বানানোর জন্য সম্মত হলো। তার জন্য রাজকীয় মুকুট তৈরী করালো। সিদ্ধান্ত হলো, এজন্য একটি বিশাল সমাবেশ ডাকা হবে। সে সমাবেশেই আনুষ্ঠানিকভাবে তার মাথায় রাজকীয় মুকুট পরানো হবে। তবে এ প্রস্তাব এখনও বাস্তবে রূপায়িত হতে পারেনি। দুর্ভাগ্য তার মদীনায় ইসলামের আগমন হয়েছে এবং অতি দ্রুত ইসলাম বিস্তার লাভ করছে। মক্কা থেকে হিজরত করে দলে দলে লোকজন আসছে। ইসলামের উন্নয়ন এবং মুসলমানদের আগমন শহরে বিপ্লব পয়দা করে দিয়েছে। ফলে রাজকীয় মুকুট পরানোর সে বিশেষ অনুষ্ঠানটি আর হতে পারলো না। মূলতবী হয়ে রইলো। বিষয়টি আবদুল্লাহ ইবন উবাইয়ের কাছে খুব কষ্টকর মনে হলো। কিন্তু সে তার এই মনোকষ্ট প্রকাশ হতে দিলো না। তার ধারণা ছিলো, হয়তো মদীনাবাসী মুসলমানদের বের করে দিবে অথবা মক্কাবাসী তাদেরকে এখান থেকে ফেরত নিয়ে যাবে। কিন্তু কিছুই হলো না। বরং উল্টো কয়েক দিন পর স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও মদীনায় তাশরীফ আনয়ন করলেন। মদীনাবাসী ব্যাপক আকারে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আনুগত্য মেনে নিলো। অধিকাংশ লোক ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করলো। যারা কুফর ও শিরকের অন্ধকারে তখনও নিমজ্জত ছিলো, তাদের প্রভাব–প্রতিপত্তিও তেমন একটা অবশিষ্ট রইলো না। ইহুদীরা প্রথমেই ছিলো সংখ্যালঘু। তারা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তাশরীফ আনয়ন এবং ইসলামের উন্নয়নকে ভালো চোখে দেখল না। কিন্তু কিছু করতেও পারছে না। কেবল অন্তরজ্বালায় দগ্ধ হচ্ছে।

রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রভাব ও ক্ষমতা এতটাই বৃদ্ধি পেলো যে, সব ধর্মের লোকেরাই ইচ্ছায় অনিচ্ছায় তাঁর অনুগত ও বশীভূত হয়ে পড়লো। অর্থাৎ, কেউ কেউ মনের দিক দিয়ে তাঁর অনুগত হতে না চাইলেও মুসলমানদের এতটাই প্রভাব বেড়ে গেলো যে, বাধ্য হয়েই

তাদেরকে নবীজীর আনুগত্য করতে হলো। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনার অংশীবাদী এবং ইহুদীদের সাথে একটি চুক্তিতে আবদ্ধ হলেন। সে চুক্তির কতগুলো গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট ছিলো নিম্নরূপ ঃ

১। মদীনাবাসী একজন অপরজনের ধর্ম ও জানমালের উপর কোন প্রকার হস্তক্ষেপ করবে না।

২। ইহুদীরা মুসলমানদের বিরুদ্ধে মক্কার কুরাইশের কোনপ্রকার সাহায্য করবে না।

৩। কেউ মদীনার উপর আক্রমণ করলে সবে মিলে ঐক্যবদ্ধভাবে তাদের মোকাবিলা করবে।

৪। কোন পক্ষ যদি শত্রুদের সাথে সন্ধি করে ফেলে তাহলে দ্বিতীয় পক্ষও তাতে শরীক বলে মনে করা হবে।

৫। ইয়াহুদী ও মুসলমানদের কোন লড়াই সামনে আসলে একদল অপরদলের সহায়তা করবে।

৬। মুসলমান এবং ইয়াহুদীদের মধ্যে কোন ঝগড়া–বিবাদ হলে এর চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত দিবেন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

৭। নির্যাতিত–নিপীড়িত মজলুমদের সাহায্য করা সবার উপর ফরয।

এই চুক্তিতে মুসলমান এবং ইয়াহুদীদের সম্মানিত লোকজন দস্তখত করলেন। এ যেন বাস্তবে মদীনাবাসী নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নেতৃত্ব এবং রাজত্বের প্রতি স্বীকৃতি প্রদান করা। ইবন উবাইয়ের কাছে বিষয়টি খুব শীরপীড়ার কারণ হলো। কিন্তু করবে কি? মদীনাবাসী তো ব্যাপকভাবেই মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুগত হয়ে গেছে। সে হিংসার আগুনে জ্বলে পুড়ে মরছে। মুসলমানদের কষ্ট দেয়ার ফন্দি ফিকির করতে লাগলো সে। ফলে মদীনার মুসলমানদের বহু ক্ষেত্রে অনেক কষ্টও হলো বাস্তবে।

মোটকথা, ইবন উবাই বলেছিলো, সেই জুযামী ব্যক্তিকে তুমি এখনই মুলকে শাম রওয়ানা হয়ে যাও এবং আবু সুফিয়ানকে এ বিরাট আশংকার ব্যাপারে অবহিত করো। সাথে সাথে এ চেষ্টাও করো যেন মক্কাবাসী মদীনার উপর আক্রমণ করে। এখনও মুসলমানদের শক্তি তেমন বৃদ্ধি পায়নি। এখনো তাদের পদদলিত করা সম্ভব। মক্কার কুরাইশরাও যদি এখানে আসে তাহলে আমি এমন কৌশল অবলম্বন করবো, যাতে সাফল্য তাদের পদচুম্বন করে চিরতরে খতম হয়ে যায় মুসলমান। তুমি সময় নষ্ট করো না। তৎক্ষণাৎ রওয়ানা হয়ে যাও।

জুযামী প্রস্তুতি নিলো। মাথায় এভাবে রুমাল বাঁধলো যাতে তাকে চেনাও

যাচ্ছিলোনা। উষ্ট্রীর উপরে আরোহণ করে সে রওয়ানা হলো। সে মুসলমানদের পথ বর্জন করলো, যে পথে মুসলমানরা গিয়েছিলো। অন্য আর একটি রাস্তা সে অবলম্বন করলো। খুব দ্রুত সে পথ চলছিলো। আরব অঞ্চল অতিক্রম করে যেয়ে পৌঁছল শাম রাজ্যে। ওয়াসাআঁন এলাকা সে অতিক্রম করছিলো। আযফা নামক স্থানে যেয়ে আবু সুফিয়ানের কাফেলার সাথে তার সাক্ষাৎ হলো। বাণিজ্যিক কাফেলা সেখানে অবস্থান করছিলো। কিছু লোক গাছের ডাল ভেঙ্গে উটগুলোকে পাতা খাওয়াচ্ছিলো। জুযামী তার উটটি সেখানেই রাখল। সোজা আবু সুফিয়ানের নিকট চলে গেলো। আবু সুফিয়ানের নিকট তখন আমর ইবন আস সহ আরও কয়েকজন সম্মানিত ব্যক্তি উপবেশন করছিলো। জুযামী তাদের অভিবাদন করে বললো, হুঁবল তোমাদের প্রতি সদয় হোন।"

আবু সুফিয়ান ঃ হুবল তোমাদের শান্তিতে রাখুন। কোত্থেকে এসেছো?

জুযামী বসে জবাব দিলো ঃ ইয়াসরিব থেকে।

আবু সুফিয়ান ঃ কোন সংবাদ আছে?

জুযামী ঃ ভীষণ দুঃসংবাদ। আমি আপনাকে অবহিত করতে এসেছি। মুসলমানরা আমর ইবন আবদুল্লাহ হাযরামীর কাফেলার উপর আক্রমণ চালিয়েছে। তারা মালামাল ছিনতাই করে নিয়ে গেছে। নিহত হয়েছেন আমর। বন্দী হয়েছেন উসমান এবং হাকাম। উসমান তো মুক্তিপণ দিয়ে মুক্ত হয়েছেন এবং মক্কা চলে গেছেন। হাকামেরও মুক্তিপণ পরিশোধ করা হয়ে গেছে। তা সত্ত্বেও হাকাম মক্কায় ফিরে যেতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেছে। ইসলাম গ্রহণ করে সে এখন মদীনায় অবস্থান করছে।

আবু সুফিয়ান ঃ বড়ই দুঃসংবাদ! আমার বুঝে আসে না, মানুষের দেমাগ কিভাবে খারাপ হয়ে গেলো। তারা কেন পিতা–প্রপিতাদের ধর্ম ত্যাগ করে মুসলমান হয়ে যাচ্ছে।

জুযামী ঃ আমি তো মনে করি, তাদের উপর যাদু করা হচ্ছে।

আবু সুফিয়ান ঃ কিন্তু যাদু হলে তো উসমান এবং হাকাম উভয়ের উপরেই করা হয়ে থাকবে। তাহলে উসমান মুসলমান হলো না কেন?

জুযামী ঃ এই রহস্য হুবলই জানেন। আরেকটি দুঃসংবাদ আছে।

আবু সুফিয়ান ঃ সেটিও শুনাও।

জুযামী ঃ মুসলমানরা আপনাদের বাণিজ্যিক কাফেলার উপর আক্রমণ চালানোর জন্য লোকজন পাঠিয়েছে। তারা আপনাদের অপেক্ষায় ওঁত পেতে আছে। তারা এমন উত্তেজিত, আপনাদের কাফেলার একটি সদস্যকেও জিন্দা ছাড়বে না। তারা আপনাদের মালামাল সব লুটে নিবে। এই দুঃসংবাদ শুনে

সবাই ঘাবড়ে গেলো। একজন আরব বললো, "হুবল এসব মুসলমানদের অনিষ্ট সাধন করুন। এ কমবখতদের যতই দমন করা হচ্ছে, ততই মাথাচাড়া দিয়ে উঠছে। যতই তাদের পিষে ফেলার এবং নিশ্চিহ্ন করার প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে ততই ঘটছে তাদের বিস্তৃতি।

আবু সুফিয়ান ঃ সত্য বলেছো। মুসলমান সে গাছের মতো যার ডালপালা যতই কাট ততই নতুন ডালপালা গজায় এবং ছায়াদার হয়। এ সংবাদটি তো পূর্বের সংবাদ অপেক্ষাও ভয়ানক, মারাত্মক। মুসলমানরা যদি আমাদের বিরুদ্ধে ওঁত পেতে থাকে, তবে নির্ঘাত আমাদের জীবিত ছাড়বে না। আমাদের ধনসম্পদ সবকিছু তারা ছিনতাই করে নিয়ে যাবে। এসব সম্পদই হলো সকল মক্কাবাসীর পুঁজি।

আমর ইবন আস ঃ দেরী করবেন না। এখনই কাউকে দিয়ে মক্কায় সংবাদ পৌছে দিন। বাণিজ্যিক কাফেলা আশংকাজনক অবস্থায় পড়েছে। মুসলমানরা আমাদের বিরুদ্ধে ওঁত পেতে বসে আছে। অতি শীঘ্র আমাদের জন্য সাহায্য পাঠাও।

আবু সুফিয়ান ঃ তাই করা উচিত। যদি মদদ না আসে তাহলে নিশ্চিত আমরা ধ্বংস হয়ে যাব। আবু সুফিয়ান যমযম ইবন আমরকে ডেকে পাঠালেন। এ ব্যক্তি ছিলো আশপাশের সমস্ত পথঘাট সম্পর্কে ওয়াকিফহাল। তার দুটি উট ছিলো কাফেলার সাথে। যমযম যখন হাজির হলো আবু সুফিয়ান তাকে সম্বোধন করে বললো, ভাই! আমরা মহামুসিবতে পড়েছি। কমবখত মুসলমানরা আমাদের বিরুদ্ধে লেগেছে। আমাদের প্রত্যাবর্তনের অপেক্ষায় আছে। তুমি তোমার দ্রুতগামী উট নিয়ে মক্কায় দৌড়ে যাও এবং নিয়মমাফিক ফরিয়াদী হয়ে মক্কায় প্রবেশ করো। মক্কাবাসীদের বলো, তারা যেন তৎক্ষণাৎ আমাদের জন্য সাহায্য পাঠায়। অন্যথায় কাফেলার সবকিছু ছিনতাই হয়ে যাবে। মারা পড়বো আমরা।

যমযম ঃ আমি এসব কাজ আঞ্জাম দেবার জন্য প্রস্তুত। তবে পারিশ্রমিক?

আবু সুফিয়ান ঃ বিশ মিসকাল স্বর্ণ তোমাকে দেয়া হবে।

যমযম ঃ ঠিক আছে।

আবু সুফিয়ান ঃ এখনই প্রস্তুত হয়ে এসে যাও।

যমযম গিয়ে প্রস্তুত হয়ে আসল। আবু সুফিয়ান তাকে অগ্রিম বিশ মিসকাল স্বর্ণ দিয়ে দিলো। যমযম রওয়ানা দিলো উটের উপরে আরোহণ করে।

১৯

আবু জেহেলের বাড়াবাড়ি

আতিকা বিনতে আব্দুল মুত্তালিব অর্থাৎ, হযরত আব্বাসের সহোদরা স্বীয় বাড়ীর উপর তলায় শুয়ে বিশ্রাম নিচ্ছিলেন। তার অদূরেই একজন যুবতী দাসী শায়িত। চাঁদনী রাত। চাঁদের আলো যেন বারি বর্ষণ করছে। আতিকার সুদর্শন চেহারা খুবই সৌন্দর্যমণ্ডিত মনে হচ্ছিলো। সে মুচকি হাসছিলো। বোধহয় কোন স্বপ্ন দেখছিলো। তার চোখ খুলে গেল। আলোক উজ্জ্বল চাঁদনী দেখে কতক্ষণ জেগেছিলো। কিন্তু যৌবনের নিঁদ তাকে আবার শুইয়ে দিল। সুবহে সাদেক পর্যন্ত ঘুমিয়েই কাটালো।

চাঁদের আলো তখন ফ্যাকাশে। পূর্ব দিগন্তে সামান্য আলোর আভা প্রস্ফুটিত হয়ে উঠলো। চাঁদের অদূরে যেসব তারকাগুলো ঝলমল করছিলো সেগুলোর উজ্জ্বলতা কিছুটা বাড়লো।

আতিকা এবং কানিজ পড়ে শুয়ে রইলো। হঠাৎ আতিকা ক্ষীণ চিৎকার করে উঠলো। ভীত–সন্ত্রস্ত হয়ে উঠে বসলো। জেগে উঠলো যুবতী দাসীও।

দাসী বললো ঃ আপু কি হয়েছে?

আতিকা ঃ কিছু নয়। আমি স্বপ্ন দেখছিলাম। তুমি শুয়ে পড়। আমিও শুয়ে পড়ছি।

বাঁদী ঃ এখন কি আর শোয়ার টাইম আছে? আপনি লক্ষ্য করছেন না সকাল হয়ে গেছে?

আতিকা ঃ ওহো ! সকাল হয়ে গেছে? আচ্ছা, তাহলে উঠো। চলো।

দু'জন উঠেই নিচে চলে এলো। তাদের পায়ের আওয়াজ শুনে নিচে শায়িত আব্বাস জেগে উঠলেন। তিনি উঠে বসে বললেন ঃ আতিকা, আজকে খুব তাড়াতাড়ি উঠে চলে এলে?

আতিকা ঃ জ্বি, হাঁ। আজকে প্রত্যুষে চোখ খুলে গেলো। সাথে সাথে আতিকা দাসীকে ইঙ্গিত দিয়ে বললো, সে যেন স্বপ্নের কথা আলোচনা না করে। সে নীরব রইলো। তিনজন প্রয়োজন সেরে, হাত–মুখ ধুলো। বাঁদী তার কাজে লেগে গেলো। আতিকা আব্বাসকে বললো, "আমি আজকে একটি মারাত্মক দুঃস্বপ্ন দেখেছি। আমার আশংকা হচ্ছে, জাতির উপর বিরাট মুসিবত আসছে।"

আব্বাস ঃ তোমার চেহারা ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। কি স্বপ্ন দেখেছো আমাকে বল।

আতিকা ঃ বলব তো, তবে আমি ভয় পাচ্ছি আপনি আবার এ স্বপ্নের

কথা প্রচার করতে আরম্ভ করেন কিনা।

আব্বাস ঃ যদি প্রচারের যোগ্য না হয় তাহলে আওড়াবো কেন?

আতিকা ঃ আমি দেখলাম, একজন উষ্ট্রারোহী ইয়াসরিবের তোরণ দ্বার দিয়ে প্রবেশ করছে এবং 'বাতহায়' এসে অবস্থান করেছে। সেখানে এসে সে খুব জোরে চিৎকার দিয়ে বললো, হে গাদ্দার বংশধর! হে বিশ্বাসঘাতক জাতি! তিন দিনের মধ্যেই তোমরা তোমাদের বধ্যভূমিতে পৌঁছে যাও। তিনবার সে এরূপ চিৎকার করে বললো। তার আওয়াজ ধ্বনিত–প্রতিধ্বনিত হলো, চতুর্দিকে গুঞ্জরিত হলো। লোকজন তার কাছে সমবেত হলো। মোটামুটি বিরাট একটি সমাবেশের মতো হয়ে গেলো। তখন সে উষ্ট্রারোহী কাবাগৃহে এসে উপস্থিত হলো। উটটিকে কাবার বাইরে দাঁড় করালো। অতঃপর তিনবার চিৎকার করে বললো, হে গাদ্দার বংশধর! হে নিমকহারাম জাতি! তিন দিনের মধ্যেই তোমাদের বধ্যভূমির দিকে রওয়ানা করো।

এখানেও তার আওয়াজ গুঞ্জরিত হলো। সমাবেশ হলো। লোকটি সেখান থেকে বেরিয়ে পড়লো। উটের উপর আরোহণ করে চললো। সে আবু কুবাইস পাহাড়ের উপর আরোহণ করে তিনবার সজোরে চিৎকার করে বললো, হে গাদ্দার বংশধর! হে বিশ্বাসঘাতক জাতি! তিন দিনের মধ্যেই তোমাদের বধ্যভূমির দিকে রওয়ানা কর। অতঃপর সে আবু কুবাইস পাহাড় থেকে একটি বিশাল ও খুব ভারী পাথর উপর থেকে ফেলে দিলো। পাথরটি পাহাড়ের পাদদেশে গড়িয়ে পড়ে টুকরো টুকরো হয়ে গেলো, সে পাথরের টুকরোগুলো মক্কার প্রতিটি ঘরে পৌঁছলো। কিন্তু আমাদের পরিবারের কারো ঘরে সে পাথরের টুকরা এসে পড়লো না। এ হলো আমার স্বপ্ন। স্বপ্নের কারণে আমি ভীত–সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছি। আমার আশংকা এবং শুধু আশংকাই নয়, সুনিশ্চিত ধারণা এ জাতির উপর মহাবিপদ আসছে।

আব্বাস ঃ আরে স্বপ্নের কি মূল্য? এসব নিয়ে ফিকির করো না, নিজের কাজ নিজে করো।

আতিকা স্বীয় কাজে রত হলো। আব্বাস বাইরে চলে গেলেন। অল্প কিছুদুর যাওয়ার পরেই ওয়ালীদ ইবন ওকবার সঙ্গে তার সাথে সাক্ষাৎ হলো। ওয়ালীদ ছিলো আব্বাসের অন্তরঙ্গ বন্ধু। তার সাথে সাক্ষাতের পর সে আব্বাসকে জিজ্ঞেস করলো, দোস্ত কি ব্যাপার! আজকে আপনার চেহারায় উদ্বেগ–উৎকণ্ঠা এবং অস্থিরতার আলামত প্রকাশমান।

আব্বাস ঃ তেমন কোন বিশেষ ঘটনা ঘটেনি।

ওয়ালীদ ঃ আমি কিভাবে বলবো, আজ পর্যন্ত আমি আপনাকে অত অস্থির কখনও দেখিনি। পারিবারিক কোন অসুবিধাই কি এই চঞ্চলতার

কারণ?

আব্বাস ঃ না।

ওয়ালীদ ঃ বোধহয় কোন অর্থনৈতিক সংকট এর কারণ।

আব্বাস ঃ না, ভাই। এসব কিছুই নয়।

ওয়ালীদ ঃ আপনার বোন আপনাকে কোন কথা বলেনি তো?

আব্বাস ঃ আতিকা অত্যন্ত সতী মেয়ে। সে কখনও এমন কথা বলে না যার কারণে আমার মন ভাঙতে পারে।

ওয়ালীদ ঃ তাহলে এমন কিছু হয়ে থাকবে যা আমার কাছে বলা সঙ্গত নয়?

আব্বাস ঃ বন্ধুর কাছে কোন কথা গোপন রাখা যায় না। এ বলে আব্বাস আতিকার স্বপ্ন–বৃত্তান্ত তার কাছে আদ্যপ্রান্ত শুনালেন।

ওয়ালীদ বললো, বিস্ময়কর এবং নেহায়েতই ভীতিপ্রদ স্বপ্ন। আমার জানা নেই কি হচ্ছে ভবিষ্যতে। এই স্বপ্ন দ্বারা বুঝা যায় মক্কাবাসীর উপর মহাবিপদ আপতিত হচ্ছে।

আব্বাস ঃ এই উদ্বেগ এবং পেরেশানীতে আমিও ভুগছি।

ওয়ালীদ ঃ বলা যায় না এই মুসীবত কোন্ দিক থেকে আপতিত হয়।

আব্বাস ঃ কিছুই বলা যায় না। অনেক দিন হলো শিকও এ ধরণের কিছু ভবিষ্যত বাণী করেছিলেন।

ওয়ালীদ ঃ আমিও শুনেছি। লোকজন পবিত্র হুবল এবং অন্যান্য প্রতিমাগুলোর পূজা হ্রাস করে নিরর্থক কাজে লেগেছে। যা হলো তা তো কমই। সেগুলোর ক্রোধ আমাদের উপর পড়বে নাতো কার উপর পড়বে।

আব্বাস সেখান থেকে চলে গেলেন। ওয়ালীদ গিয়ে পৌছলো খানায়ে কাবায়। সেখানে বসে ছিলো আবু জেহেল, শায়বা এবং অন্যান্য শীর্ষস্থানীয় কুরায়েশ নেতৃবৃন্দ। ওয়ালীদ আবু জেহেলকে বললো ঃ ভাই, এক অজানা চিন্তা আমার অন্তরে জেঁকে বসেছে। সবসময় কেবল পেরেশানি থাকে। ওয়ালীদ বসে বললো ঃ তুমি আতিকাকে চিন?

আবু জেহেল ঃ কে না জানে? সে আবদুল মুত্তালিবের কন্যা।

ওয়ালীদ ঃ হাঁ, তাই। আতিকা রাত্রে এক ভয়ানক স্বপ্ন দেখেছে।

এই বলে ওয়ালীদ পুরো স্বপ্নবৃত্তান্ত শুনালো। আবু জেহেল সর্বাগ্রে বললো, আচ্ছা, এবার বুঝি বনী হাশেমের মেয়েরাও নবী হওয়ার দাবী করতে আরম্ভ করলো। ঠিক এ মুহূর্তে আব্বাস সেখানে গিয়ে পৌছলেন। আব্বাস এসে বসার পর আবু জেহেল বললো, আব্বাস! আপনার ভগ্নি কি এ স্বপ্ন দেখেছে? এ বলে সে পুরো স্বপ্ন শুনালো।

আব্বাস ঃ হাঁ, দেখেছে।

আবু জেহেল ঃ যখন আমাদের এবং আপনাদের মাঝে অভিজাত ও সম্মানিত কে এ বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়েছিলো তখন আপনি বলেছিলেন ঃ আমরা হাজীদেরকে পানি পান করাই। আমরা বলেছিলাম, হাঁ, অবশ্যই আপনারা তা করেন। অতঃপর আপনি বলেছিলেন ঃ আমরা কাবার প্রহরার কাজ করি। আমরা বলেছিলাম ঃ আমাদের জানা আছে আপনারা কাবাঘরের প্রহরা দান করেন। কাবার চাবি আপনাদের কাছেই থাকবে। আপনি বলেছিলেন ঃ আমরা লোকজনের মেজবানী করি। আমরা বলেছিলাম ঃ আপনি যথার্থ বলেছেন। সত্যিই আপনারা লোকদের খানা খাওয়ান, আপ্যায়ন করেন। অতঃপর আপনি বলেছেন ঃ আমরা দান–দক্ষিণা করি। আমরা বলেছিলাম ঃ আপনার এ কথাও যথার্থ। কোন সন্দেহ নেই, আপনারা মিসকীন এবং গরীব–দুঃখীদের অনেক কিছু দান করেন।

তবে আমরাও আপনাদের চেয়ে কম নই। আমরা হাজীদের পানি পান করাই। ক্ষুধার্তদের খানা খাওয়াই, গরীব–দুঃখীদের দান–খয়রাত করি। আমরা আর আপনারা সে দু' অশ্বের মত যেগুলো খেলার সময় সমান তালে দৌড়ে।

আব্বাস ঃ এ বলে তুমি কি বুঝাতে চাইছ?

আবু জেহেল ঃ আপনি আমার উদ্দেশ্য বুঝতে পারেন নি? তাহলে আপনারা বনু হাশেমরা ভাবছেনটা কি?

আব্বাস ঃ আমরা মনে করছি, কুরাইশের মধ্যে বংশগত কৌলিন্যের দিক থেকে আমরাই সর্বোত্তম ও অভিজাত।

আবু জেহেল ঃ আমরা তা অস্বীকার করিনা। আপনাদের বংশ নির্মল ও উত্তম। আপনি বলছেন, আপনাদের খান্দান কুরাইশের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ—আমরা তা–ও স্বীকার করি। তবে এর অর্থ এই নয় যে, আপনারা বিভিন্ন রকমের দাবী করতে আরম্ভ করবেন।

আব্বাস ঃ আমি কি দাবী করেছি?

আবু জেহেল ঃ আমার উদ্দেশ্য আপনার ব্যক্তিগত ব্যাপার নয়।

আব্বাস ঃ তাহলে?

আবু জেহেল ঃ আপনি জানেন, আপনার ভাতিজা মুহাম্মাদ (সাঃ) নবুয়তের দাবী করে গোটা জাতিকে বিপদের সম্মুখীন করেছে। গোটা দেশ অস্থিরতায় ভুগছে।

আব্বাস ঃ শুধু আমিই নই, গোটা জাতি জানে, মুহাম্মাদ নবুয়তের দাবী করেছে।

আবু জেহেল ঃ এবার তো আপনাদের মেয়েরাও নবী হয়ে গেছে। অদৃশ্য

জ্ঞানের দাবী করতে শুরু করেছে।

আব্বাস ঃ আমাদের মেয়েরা গায়েব জানে বলে তো দাবী করেনি?

আবু জেহেল ঃ আপনি মিথ্যে বলেছেন। আপনার ভগ্নি এরূপ স্বপ্ন দেখেনি? এ বলে সে পুনরায় স্বপ্ন বর্ণনা করলো।

আব্বাস ঃ হাঁ, দেখেছে।

আবু জেহেল ঃ শুনুন হে হাশেমী যুবক! কান খুলে শুনুন। আমরা তিন দিন পর্যন্ত অপেক্ষা করছি। যদি এ সময়ের মধ্যে (স্বপ্নে বর্ণিত) সে উটটি না আসে তাহলে গোটা আরবে আপনাদের খান্দান সম্পর্কে ঘোষণা শুনিয়ে দেয়া হবে, এরা মিথ্যেবাদী।

আব্বাস ক্রোধান্বিত হয়ে উঠলেন। তিনি বললেন ঃ ডাকাত, মিথ্যুক, বদকার তুই।

আবু জেহেল ভীত-সন্ত্রস্ত। তার আশংকা, আব্বাস তার উপর হামলা করে বসেন কিনা। এজন্য সে বললো ঃ এখন কিছু বলার প্রয়োজন নেই। আমরা তিন দিন অপেক্ষমান থাকবো।

আব্বাস ঃ অবশ্যই অপেক্ষা করো। এ বলে তিনি রাগান্বিত হয়ে উঠে চলে গেলেন।

২০

আত্মমর্যাদাবোধসম্পন্ন নারী

আতিকার স্বপ্ন সেদিনই গোটা মক্কায় ছড়িয়ে পড়লো। ঘরে ঘরে এর আলোচনা ও চর্চা হতে লাগলো। নারী-পুরুষ সবাই এ নিয়ে আলোচনায় ব্যস্ত। এই স্বপ্ন প্রসিদ্ধি লাভ করার কয়েকটি কারণ ছিলো ঃ

১। বনু হাশেম গোত্রের একটি মেয়ে এ স্বপ্ন দেখেছে। এ গোত্রটি গোটা হেজাজে ছিলো অত্যন্ত সম্মানিত। এক যুগে মক্কার নেতৃত্ব এই বংশের হাতেই ছিলো। যে সময়ের কথা আমরা আলোচনা করছি তখনও এই গোত্রটি ছিলো বিরাট প্রভাব ও ক্ষমতার অধিকারী। এই বংশের সবচেয়ে সম্মানিত পরিবারে হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জন্মগ্রহণ করেছিলেন। প্রিয়নবী হচ্ছেন হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামের বংশধর। তাঁর বংশ পরিক্রমা নিম্নরূপ ঃ

হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামের সন্তান জবীহুল্লাহ হযরত ইসমাঈল আলাইহিস সালাতু ওয়াসসালাম। তাঁর ছেলে কায়দাদ এবং কায়দাদের সন্তান আদনান। আদনানের সন্তানগণ গোটা আরবে ছড়িয়ে

পড়েছিলেন। আরবে তাঁরা আলে আদনান নামে সুবিখ্যাত। আদনানের ছেলে শাদ। শাদের ছেলে নাযার। নাযার আদনানের সন্তানদের মধ্যে রবীয়া এবং মুযার দুটি গোত্র খুবই প্রসিদ্ধ ছিলো। তাদের বংশের মধ্যেও মুযারের বিশেষ সুখ্যাতি ছিলো। মুযার কবীলার মধ্যে একটি বংশ ছিলো কেনানা। এরা ছিলো খুবই প্রতাপশালী। তাদেরই মধ্যে ফিহ্র ইবন মালিক ছিলেন খ্যাতনামা এক ব্যক্তিত্ব। তাঁকে কুরাইশও বলা হয়। আরবের বিখ্যাত কবিলা কুরাইশ তাঁরই নামে প্রতিষ্ঠিত হয়। তামাম আরব তাঁর ইজ্জত–এহতেরাম করতো। তাঁর সম্মান–প্রতিপত্তি এবং আভিজাত্যও ছিলো মশহুর। সে কুরাইশ গোত্রে অনেকগুলো শাখা–প্রশাখা ছিলো। তন্মধ্যে আবদে মানাফ ছিলেন বিশেষভাবে খ্যাতিমান। আবদে মানাফের সন্তান হাশেম। তাঁরও খুবই ইজ্জত কদর ছিলো গোটা আরবে। পুরো আরবে সবচেয়ে সম্মানিত ও প্রভাবশালী ছিলেন তিনি। তাঁর ছেলে আবদুল মুত্তালিব। আবদুল মুত্তালিবের সন্তান আবদুল্লাহ। আবদুল্লাহর সন্তান, বিশ্বনবী, বনী আদমের গর্ব, সাইয়েদুল আম্বিয়া হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। এই বনু হাশেম পরিবারটি শুধু মক্কায় নয়, বরং গোটা আরবে বিখ্যাত ও ক্ষমতাধর ছিলো। এই খানদানেরই একটি মেয়ে পূর্বোক্ত স্বপ্ন দেখেছিলো। যে ছিলো সতী–সাধ্বী হিসাবে মশহুর।

দ্বিতীয় আরেকটি কারণ হলো, স্বপ্নটির প্রকারও ছিলো বিস্ময়কর। সাংঘাতিক ভয়ংকর স্বপ্ন।

প্রসিদ্ধির তৃতীয় কারণটি ছিলো, সবাই জানত হযরত আব্বাস অত্যন্ত আত্মমর্যাদাবোধসম্পন্ন এবং খ্যাতনামা বীর। আবু জেহেল তাঁরই বোন আতিকাকে হেয় ও লাঞ্ছিত করলো। অতঃপর সেখান থেকে প্রস্থান করলো। তখনও হযরত আব্বাস ইসলাম গ্রহণ করেননি। সেদিনই আবদুল মুত্তালিবের পরিবারের সমস্ত মহিলা এবং মেয়েরা হযরত আব্বাসের ঘরে একত্রিত হলো। আতিকার কাছ থেকে তাঁর স্বপ্ন শুনলো। অবশ্য আতিকার কাছে বিষয়টি ভালো মনে হচ্ছিলো না। আব্বাস কেন তাঁর স্বপ্ন জনসাধারণের মধ্যে এরূপভাবে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে দিয়েছেন? যাইহোক, আতিকার কাছে মহিলারা স্বপ্ন শোনার জন্য আসতে লাগলো। প্রথম প্রথম তো যারাই আসতো আতিকা তাদের কাছে স্বপ্ন খুলো বলতো। কিন্তু যখন দেখলো, মহিলাদের লাইন লেগেছে তখন সে বলে দিলো, ঠিক আছে, বিকেলে সবাই আসুন সবার সামনে স্বপ্ন–বৃত্তান্ত শুনাবো। ফলে তার ঘর নারী এবং মেয়েদের দিয়ে পরিপূর্ণ হয়ে গেলো। তখন সে সবার সামনে নিজের স্বপ্নকাহিনীর বিবরণ দিলো।

খাব শুনে এক দুর্বল মহিলা বললো ঃ আমাদের পরিবারের কেউ কখনো মিথ্যা স্বপ্ন দেখেনি। অবশ্যই কোন মহাবিপদ আমাদের জাতির উপরে আসন্ন।

দ্বিতীয় আরেক যুবতী বললো ঃ কিন্তু হাশেমী পরিবারের কোন ঘরেই তো সে প্রস্তর টুকরা এসে পৌঁছেনি। অতএব আমরা সে বিপদ থেকে রক্ষা পাবো।

আতিকা ঃ কোন সন্দেহ নেই, আমি স্বপ্নে দেখেছি আমাদের পরিবারের সব ঘরই নিরাপদ। একজন কড়া মেজাজী মহিলা বললো ঃ যেদিন এ জাতি মুহাম্মাদ (সাঃ)কে বের করে দিয়েছিলো সেইদিনই আমি বলে দিয়েছিলাম যে, শুভদিন শেষ হয়ে গেছে। অশুভ দিন আসন্ন। মুহাম্মাদ (সাঃ) সম্পর্কে সবাই অবগত ছিলো। তিনি ছিলেন নেহায়েত সৎ, ঈমানদার, দ্বীনদার, দয়ালু এবং স্বজাতির প্রতি সহানুভূতিশীল। বিস্ময়ের কি আছে যে, তিনি আল্লাহর রসূল এবং তাঁর প্রভু আমাদের জাতির প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে গেছেন। পুরো ঘর মহিলাদের দ্বারা ভর্তি। ঘরে হৈ চৈ হচ্ছিলো। এমন সময় আব্বাস (রাঃ) এসে পৌঁছলেন। তখনও পর্দার হুকুম নাযিল হয়নি। আরবদের মধ্যে পর্দাপ্রথা চালু ছিলো না। মেয়েরা সাধারণতঃ এমন কামিজ পরিধান করত যেগুলো গলা থেকে বুক পর্যন্ত ফাড়া থাকতো। আব্বাস (রাঃ)ও তাদের মধ্যেকার একজন হয়ে বসে গেলেন। একজন বৃদ্ধা মহিলা তাঁকে লক্ষ্য করে বললেন ঃ আব্বাস! তোমাদের আত্মমর্যাদাবোধ কোথায় চলে গেলো? তোমাদের পরিবার তো অত্যন্ত আত্মমর্যাদাবোধসম্পন্ন হিসেবেই সুপ্রসিদ্ধ ছিলো।

আব্বাস ঃ আত্মমর্যাদাবোধের পরিপন্থী আমি কি করেছি?

বৃদ্ধা মহিলা ঃ এখনও তোমার চেতনা ফেরেনি? আমার কাছ থেকে শোন। এ আবু জেহেল, ফাসিক—অসৎ, খবিছ আমাদের গোত্রের পুরুষদেরই এতদিন লাঞ্ছিত করতো। এবার দেখি মহিলাদেরও অবমাননা করতে আরম্ভ করেছে সে। সে কি আতিকা সম্পর্কে এসব বলেনি যে, সে নবী হয়ে গেছে? সে মরদুদ, নবীর অর্থ মনে করে মিথ্যুক এবং প্রতারক।

আব্বাস ঃ স্নেহময়ী মা! আমি জানি। তখন আমার শরীর খুব উত্তেজিত হয়ে পড়েছিলো। কিন্তু এজন্য নীরবতা অবলম্বন করলাম যাতে কোন ফ্যাসাদ সৃষ্টি না হয়। আমি যদি তলোয়ার কোষ উন্মুক্ত করতাম তাহলে খুনের নদী বয়ে যেতো।

বৃদ্ধা মহিলা ঃ রক্ত বহাতে ভয় পাচ্ছো? কতদিন ভয় পাবে? একদিন তা অবশ্যই হবে। এটা অবশ্যম্ভাবী।

আব্বাস ঃ আমি বুঝি। তাকে ক্ষমা করে দিয়ে কিছু সুযোগ দিলাম কয়েকদিন জিন্দা থাকার। ভবিষ্যতে এ ধরনের আচরণ সে যদি করে তাহলে হাশিমী তলোয়ার তার মাথায় আঘাত হানবে। এই বলে আব্বাস উঠে চলে গেলেন। মেয়েরাও সেখান থেকে প্রস্থান করলো।

দ্বিতীয় দিন আব্বাস বাইরে যেতে উদ্যত হলেন। এমন সময় আতিকা

তাঁর কাছে এলো। সে বললো, ভাইজান! আমি তো আপনাকে নিষেধ করেছিলাম, কেউর কাছে আমার স্বপ্ন বর্ণনা করতে।

আব্বাস ঃ কি বলবো, বিষয়টি আমি আমার বন্ধু ওয়ালীদের কাছে বর্ণনা করেছিলাম। যেহেতু স্বপ্নটি ছিলো ভয়ংকর এজন্য সে মরদুদ আবু জেহেলের কাছেও বলে ফেলেছে। আর আবু জেহেল তো আমাদের পরিবারের অবমাননা করার পিছনে লেগেই থাকে। সেই সবার কাছে এটা আওড়িয়েছে।

আতিকা ঃ আফসোস! এ কমবখত আপনার সামনেই আমাকে অপদস্থ করলো, আর আপনি তা নীরবে শুনে চলে আসলেন?

আব্বাস ঃ আতিকা! যখন থেকে মুহাম্মাদ (সাঃ) নবুওয়তের দাবী করে জাতির প্রতিমাগুলোর অবমাননা আরম্ভ করে দেয়, তখন থেকেই আমাদের পরিবারকে জনসাধারণ বাঁকা দৃষ্টিতে দেখতে আরম্ভ করে দেয়। আমি এজন্য নিরবতা অবলম্বন করেছিলাম যাতে কোন ফ্যাসাদ সৃষ্টি না হয়, যারফলে গোটা আরবেই ফ্যাসাদের আগুন দাউ দাউ করে জ্বলে উঠে।

আতিকা ঃ আমি যদি পুরুষ হতাম, তাহলে কখনও এ বিষয়টির পরোয়া করতাম না। এই অভিশপ্তের মুখে থু থু নিক্ষেপ করতাম।

আব্বাস ঃ নিশ্চিন্ত থাক। আমি এখন তার কাছে যাচ্ছি। আজকে যদি সে একটি শব্দও তোমার মর্যাদার পরিপন্থী উচ্চারণ করে তাহলে আমি তার জিহ্বা কেটে ফেলবো।

আতিকা ঃ আমাকেও সাথে নিয়ে চলুন।

আব্বাস তার সুদর্শন চেহারার দিকে তাকিয়ে বললেন ঃ কেন?

আতিকা ঃ আমি আমার অবমাননার জবাব নেব এবং তাকে বলে আসবো যে, হাশিমী বংশের মেয়েদের অবমাননার পরিণতি এই হয়।

আব্বাস আতিকার উত্তেজনা এবং ক্রোধ প্রশমিত করার জন্য কৌতুকচ্ছলে বললেন ঃ আপনার কাজ নয় তলোয়ার উত্তোলন করা।

আতিকা পুনরায় খুব উত্তেজিত হয়ে পড়লো। তার চেহারা লাল হয়ে উঠছিলো। মোহনীয় আঁখিযুগল থেকে যেন অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ঠিকরে পড়ছিলো। সে বললো, আপনারা পুরুষরা নিজেদেরকেই শুধু কেন বাহাদুর মনে করেন?

আব্বাস ঃ আমরা বীর। আমার হাতের দিকে লক্ষ্য কর তো, কত শক্ত–মজবুত। আর তোমার হাতের দিকে লক্ষ্য কর, কত নরম–মোলায়েম।

আতিকা ঃ পুরুষরা বাকপটুই হয়ে থাকে। খুব কথা সাজাতে পারে।

আব্বাস ঃ আতিকা! আমি জানি, তুমি বীরাঙ্গনা। তোমার বুকে বাহাদুরী আছে। তুমি আবু জাহালের মুখে তলোয়ার মারতে পারো। কিন্তু লোকেরা এতে করে আমাদের অপদস্থ করবে এজন্য যে, হাশিমী পুরুষরা কাপুরুষ।

তাদের মধ্যে আত্মমর্যাদাবোধ নেই। তুমি প্রশান্ত থাকো, আমি তার কাছ থেকে তোমার প্রতিশোধ নেবই।

এতে করে আতিকার উত্তেজনা কিছুটা প্রশমিত হলো। আব্বাস বললেন ঃ তোমার চেহারা কত লাল হয়ে গেছে! মেয়েদের মাহাত্ম্য—মহিমা এবং সৌন্দর্যের অভিজ্ঞতা আজকে হলো আমার।

আতিকা মুচকি হেসে চলে গেলো। আব্বাস ঘর থেকে বেরিয়ে সোজা খানায়ে কাবায় পৌঁছলেন। সেখানে আবু জেহেল তার সাঙ্গপাঙ্গদের নিয়ে বসে আছে। আব্বাসকে দেখেই আবু জেহেল বললো ঃ আজকে একদিন শেষ হলো, দ্বিতীয় দিন আরম্ভ হলো। আব্বাস কিছু না বলেই চলে এলেন। পরদিন তিনিও হেরেম শরীফে গেলেন। আবু জেহেল পূর্ব থেকেই সেখানে বসা। আরো কয়েকজন লোক ছিলো সেখানে। আবু জেহেল আববাসকে বিরক্ত করার উদ্দেশ্যে বললো ঃ দুদিন শেষ হয়ে গেছে। আব্বাস তার দিকে এগিয়ে গেলেন। আবু জেহেল টের পেলো। সে অনুধাবন করেই দ্রুত সেখান থেকে উঠে বনু সাহমের দ্বারের দিকে চলে গেলো। আব্বাস তার সাঙ্গপাঙ্গদের বললেন ঃ তার প্রতি অভিশম্পাত হোক, সে ভয় পেয়ে কেন চলে গেলো। তন্মধ্যে একজন বললো ঃ সে বলছিলো—আতিকার স্বপ্নের আজকে তৃতীয় দিন। আজকেও কিছুই প্রকাশ পেলো না।

আব্বাস ঃ এখনও তো সন্ধ্যা অনেক দূরে—এই বলে তিনি সেখান থেকে প্রস্থান করলেন।

সেদিনই বিকেলের দিকে লোকজন শুনতে পেলো, কেউ চিৎকার করে বলছে—ফরিয়াদ! ফরিয়াদ!!

লোকজন ঘরবাড়ী ছেড়ে সে ফরিয়াদীর দিকে দৌড়তে লাগলো।

২১
ফরিয়াদী

আল—গিয়াস! আল—গিয়াস!! ফরিয়াদ! ফরিয়াদ!! ধ্বনি উচ্চস্বরে প্রতিধ্বনিত হতে লাগলো। লোকজন তার দিকে দৌড়ে যেতে লাগলো। যেন কোন বিশেষ আকর্ষণ তাদেরকে আকৃষ্ট করে নিচ্ছে। কিংবা উন্মাদ হয়ে ছুটে চলেছে। প্রতিটি অলি—গলিতে নারী—পুরুষ এবং বাচ্চাদের বিরাট লাইন লেগেছে। আমীর—গরীব, শিল্পী—ব্যবসায়ী, নির্বিশেষে সবাই দৌড়ে যাচ্ছিলো। আবু জেহেল তার ঘরের ফটকে দাঁড়িয়েছিলো। সে ছিলো বড় বিত্তশালী। তার বাড়ীতে ক্রীতদাসদের পাহারা ছিলো। সে লোকজনকে দৌড়তে দেখে কেউ

কেউকে জিজ্ঞেস করলো ঃ কোন বিপদ এসেছে কি? তারা জবাব দিলো ঃ কোন ফরিয়াদী শহরে এসেছে।

আবু জেহেল সংযত হয়ে গেলো। সে একেকটি দিন এবং একেকটি দিনের প্রতিটি প্রহর গুণছিলো। আজকে আতিকার স্বপ্নের তৃতীয় দিন। ফলে সে আশংকা করছিলো, তার স্বপ্ন আবার বাস্তবায়িত হয় কিনা। তার মনের বাসনা ছিলো, কোনরকমে আজকের দিনটি ভালোয় ভালোয় অতিবাহিত হোক। কোন অঘটন না ঘটুক, যাতে তার কথা বলার সুযোগ হয় যে, হাশিমী বংশের নারী–পুরুষ সবাই মিথ্যুক, প্রতারক। কিন্তু লোকজনের দৌড় এবং কোন ফরিয়াদীর আগমন তার মনের আশার কিল্লা মিসমার করে দিয়েছে। তখনও সে তার বাড়ীতেই দাঁড়িয়েছিলো। ফরিয়াদ! ফরিয়াদ!! আওয়াজ উঁচুস্বরে প্রতিধ্বনিত হচ্ছিলো। সে চৌকান্না হয়ে উঠলো। তখনই সুহাইল ইবন আমর, হারিস ইবন আমের, জামআ ইবন আসওয়াদ, উমাইয়া ইবন খালফ দৌড়ে এসে পড়লো। সুহাইল আবু জেহেলকে বললো ঃ আপনি কি ফরিয়াদীর আওয়াজ শুনতে পাননি?

আবু জেহেল ঃ শুনেছি। হয়তো কারো প্রতি জুলুম নির্যাতন করা হয়েছে। সে ফরিয়াদী হয়ে এখানে এসেছে।

উমাইয়া ঃ সে কারো নির্যাতিত ব্যক্তি নয়। মনে হচ্ছে, সে গোটা জাতিকে আহ্বান করছে—শুনুন, লক্ষ্য করুন সে কি বলছে। তখন আওয়াজ এলো আল–গিয়াস! আল–গিয়াস! হে কুরাইশের লোকজন! হে লুআই ইবন গালিবের বংশধর!

আপনি শুনেছেন? সে গোটা জাতিকে আহ্বান করছে। কোন বিস্ময়কর এবং গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার–স্যাপার হবে। আবু জেহেলের মন এজন্য চিন্তায় নিমজ্জিত যে, কোন গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার যদি হয়, তাহলে আতিকার স্বপ্ন সত্যে পরিণত হবে। জনগণ বনু হাশেমের প্রতি আরো বেশি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করতে আরম্ভ করবে। এটা তার কাছে খুব কষ্টকর মনে হলো। সে ক্ষীণ আওয়াজে বললো ঃ হাঁ, ব্যাপারটি কোন গুরুত্বপূর্ণই হবে। ঠিক এ সময়েই আরো কয়েকজন বর্ষীয়ান লোক দৌড়ে এলো। তারা আবু জেহেল এবং সুহাইল প্রমুখকে সেখানে দণ্ডায়মান অবস্থায় দেখে বিস্ময়ের সুরে বললো ঃ তোমরা এখানে দাঁড়িয়ে আছো? ফরিয়াদীর আহ্বান কি তোমাদের কর্নকুহরে পৌঁছেনি?

আবু জেহেল ঃ শুনেছি।

জনৈক বৃদ্ধ ঃ তাহলে দ্রুত চলো।

তখনই আবার আওয়াজ এলো, "হে কুরাইশ সম্প্রদায়! স্বীয় কাফেলা

এবং কাফেলার লোকজনের খবর নাও।” এবার তারা নিজেদের আর নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারলো না। সবাই দ্রুত পায়ে চলতে লাগলো। তারা দেখলো, প্রতিটি অলি–গলি দিয়ে লোকজনের ঢল নেমেছে। কুরাইশ এবং ইয়াহুদী সবাই মিলে সম্মুখপানে অগ্রসর হচ্ছে। এরাও তাদের দলে শামিল হয়ে দ্রুত কদমে হাঁটতে লাগলো। সবাই খানায়ে কাবায় এসে পৌছলো। সে ময়দানে লোকজনের ভীড় জমলো। তাদের মাঝে একজন উষ্ট্রারোহী বিস্ময়কর এক অবস্থায় দাঁড়ানো। তার জামা গিরেবানের নিচে থেকে এবং পেছনে পৃষ্ঠের দিকে ছেঁড়া। পাগড়িটা গলায়, মাথা খালি, দাঁড়িতে মাটি লেগে আছে। আঁখিযুগল থেকে ভয়ংকর অবস্থা প্রকাশমান। উটের দুটি কর্ণ কর্তিত। এগুলো থেকে তাজা রক্ত টপ টপ করে পড়ছে। উটের গদি উল্টে রাখা হয়েছে। বর্বরতার যুগে যখন কোন গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারের সম্মুখীন হতো তখন ফরিয়াদী এ অবস্থায় ফরিয়াদ করতো। জনগণ বুঝতো নিশ্চয় কোন নেহায়েত গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় ব্যাপার সম্মুখে এসেছে। ফলে তখনও লোকজন তাই অনুভব করলো।

এই ফরিয়াদী ছিলো যমযম ইবন আমর। তাকে প্রেরণ করেছিলো আবু সুফিয়ান। তাকে দেখেই সমস্ত মক্কাবাসী ভীষণ উৎকণ্ঠিত হলো। তাদের চেহারা হয়ে গেলো ফ্যাকাশে। চোখ থেকে ভীত–সন্ত্রস্ততার আভা প্রকাশ পেল। বিশেষতঃ মহিলাদের চোখে–মুখে আফসোস এবং পেরেশানীর আভা প্রকাশ পেলো।

যমযম ইবন আমর বলিষ্ঠ কণ্ঠে বললো ঃ আল–গিয়াস! আল–গিয়াস!! ফরিয়াদ! ফরিয়াদ!! হে কুরাইশ সম্প্রদায়! লুআই ইবন গালিবের বংশধর!

কয়েকজন লোক বলিষ্ঠ আওয়াজে বললো ঃ হে ব্যক্তি! তাড়াতাড়ি বলো, তুমি কি ফরিয়াদ নিয়ে এসেছ। সে মজলিসে শিকও উপস্থিত ছিলেন। তিনি হেসে উঠলেন। বললেন, “এ মুসীবত তোমাদের কৃতকর্মের ফল।”

জনগণ তাজ্জবের দৃষ্টিতে তার প্রতি তাকাল। তিনি বললেন, তোমরা আমার দিকে বিস্ময়ের দৃষ্টিতে দেখছো, আমি সত্য বলছি। আমি কুরাইশের সম্মানিত লোকদের এ বিষয়ে পূর্বেই সতর্ক করেছিলাম। এ সময় তার কাছে আবু জেহেল, জামআ, সুহাইল এবং হারিস পৌছলো। শিক তাদেরকে দেখেই হেসে বললেন, তোমাদের আক্রমণ কামিয়াব হয়েছে?

আবু জেহেল ঃ কোন্ হামলা?

শিক ঃ কুরয ইবন জাবিরের। কিন্তু লাভ কি হলো? কয়েকটি উট হস্তগত হলো। আর এখন?

আবু জেহেল ঃ এখন কি হবে?

শিক ঃ তাই যা আমি বলেছিলাম। তোমরা এমন কতগুলো লোককে

উত্যক্ত করেছিলে যারা প্রকৃতপক্ষে তোমাদের শত্রু ছিলো না। তারা ছিলো, নিরীহ–নিরপরাধ। তোমরাই তাদের দুশমন ঠাওড়িয়েছো। এবার তোমরা তোমাদের বধ্যভূমির দিকে এগিয়ে যাও।

আবু জেহেল ঃ আতিকার স্বপ্নের কথা আপনি জানেন?

শিক ঃ আমি যখনই আতিকার স্বপ্নের আলোচনা শুনেছি তৎক্ষণাৎ স্বীয় আয়নাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, সে আমাকে সবকিছু বাৎলে দিয়েছিলো।

আবু জেহেল ঃ কি বলেছে? উস্তাদ আমাদের একটু বলুন।

শিক ঃ তাই বলেছে, যা আমি তোমাদেরকে বলেছিলাম। শুনে নাও তোমাদের ফরিয়াদী কি বলছে। এই বলে সে সোজা হাঁটা দিলো। সুহাইল তাকে থামিয়ে বললো ঃ উস্তাদ! কিছু তো আমাদেরও বলবেন।

শিক ঃ খুন! রক্তের নদী! ধ্বংস! গোটা জাতির ধ্বংস! আতিকা তার স্বপ্নে যেসব ঘরে পাথরের টুকরো আঘাত হানতে দেখেছিলো সে ঘরের উপর বিপদের ঘনঘটা ছেয়ে গেছে।

আবু জেহেল ঃ উস্তাদ! আপনি জানেন না, আতিকা হাশেমী বংশের মেয়ে। তাদেরই পরিবারের একজন পুরুষ মুহাম্মাদ নবুওয়তের দাবী করেছে? তারা মিথ্যায় সবার চেয়ে অগ্রগামী নয় কি? আতিকার স্বপ্নও কি সে মিথ্যার একটা অংশ নয়?

শিক ঃ না, আতিকার স্বপ্ন সত্য।

আবু জেহেল ঃ আরে উস্তাদ! আপনি মুহাম্মাদ সম্পর্কে কি বলেন?

শিক ঃ আমি একদিন আমার দর্পণে দেখেছিলাম, আমি জানতে পারলাম—একদিন সে একজন সম্মানিত খ্যাতনামা ব্যক্তিতে পরিণত হবে। গোটা আরব তার কথামতেই চলবে। তার শাসন মেনে চলবে।

আবু জেহেল ঃ অট্টহাসিতে ফেটে পড়লো। সে বললো ঃ তুমি মিথ্যুক। তোমার দর্পণও মিথ্যা।

শিক ঃ আমি মিথ্যুক হতে পারি। আমার এলেম মিথ্যা হতে পারে না। আমার আয়না অসত্য হতে পারে না। এই বলে সে চলতে লাগলো।

আবু জেহেল সুহাইলকে লক্ষ্য করে বলতে লাগলো ঃ শুনলে, এ বদ্ধ পাগল মজ্জুবের কথা।

সুহাইল ঃ হাঁ, আসলে মজ্জুব—পাগলই। তবে আপনি এ ফরিয়াদীকে চিনতে পেরেছেন?

আবু জেহেল ঃ না।

সুহাইল ঃ এ হচ্ছে যমযম ইবন আমর।

আবু জেহেল সতর্ক হয়ে গেলো। সে বললো ঃ যমযম ইবন আমর তো

নদীর কিনারে থাকতো।

জামআ ঃ আমিও তাকে শাম দেশে যেতে নদীর কুলে দেখেছি।

আবু জেহেল ঃ লাত–উযযা রহম করুন। সে আমাদের কাফেলার উপর আক্রমণ ও ছিনতাইয়ের খবর নিয়ে আসেনি তো?

সুহাইল ঃ আমারও সংশয় হচ্ছে।

আবু জেহেল ঃ যদি তাই–ই হয়ে থাকে, তাহলে আমরা কুরাইশ গোষ্ঠী ধ্বংস হয়ে যাব। গোটা জাতির সম্পদ রয়েছে কাফেলার সাথে।

জামআ ঃ হুবল অনুগ্রহ প্রদর্শন করুন।

যমযম নামক এই কমবখত আগে কেন বলছে না, কি ফরিয়াদ নিয়ে এসেছে।

আবু জেহেলঃ সম্ভবতঃ সে মক্কার প্রতিটি শিশুকেও সমবেত করতে চায়।

সুহাইল ঃ এবার তো গোটা মক্কাবাসী এখানে একত্রিত হয়েছে।

জামআ ঃ সামনে অগ্রসর হয়ে তাকেই জিজ্ঞেস করুন না। অতএব এরা গোটা সমাবেশকে ভেদ করে অগ্রসর হলো। যেহেতু তারা ছিলো গণ্যমান্য ব্যক্তি তাই তাদেরকে দেখেই লোকজন পথ উন্মুক্ত করে দিলো। তারা সামনে চলে গেলো। যদিও তখন বহুলোকের সমাগম হয়েছিলো, নারী–পুরুষ–শিশু সবাই সেখানে উপস্থিত ছিলো কিন্তু সবাই ছিলো নিশ্চুপ। শুধু শ্বাস–প্রশ্বাস ব্যতীত আর কোনকিছুরই আওয়াজ আসছিলো না। সূর্য তখন অনেকটা হেলে গেছে। তবে তখনও মোটামুটি গরমই ছিলো। সবার শরীর ঘর্মাক্ত। আবু জেহেল প্রমুখ সে সমাবেশ চিরে যমযমের নিকট পৌঁছলো। জামআ চিৎকার করে বললো ঃ ফরিয়াদী! বল, তুমি কি ফরিয়াদ নিয়ে এসেছো? আমাদের গোটা জাতি এখানে উপস্থিত।

যমযম চিৎকার করে বললো ঃ হে কুরাইশ বংশধর! হে লুআই ইবন গালিবের সন্তানরা!! মনোযোগ দিয়ে শুনো, তোমরা স্বীয় কাফেলাকে বাঁচাও। যে কাফেলা আবু সুফিয়ানের সাথে প্রত্যাবর্তন করছিলো, মুহাম্মাদ এবং তার সাথীরা তাদের জন্য ওঁত পেতে বসে আছে। তারা ওদের উপর আক্রমণ করে মালামাল ছিনতাই করে নিবে। ফরিয়াদ! ফরিয়াদ!! বাণিজ্যিক কাফেলার ফরিয়াদে সাড়া দাও। আমার আশংকা হচ্ছে তোমরা তাদের কাউকেও নিরাপদ পাবে না। আর তোমাদের ধনসম্পদ? হায় তোমাদের ধনসম্পদ! সব লুটপাট হয়ে যাবে।

যমযমের কথা শুনে গোটা সমাবেশ হতাশ বিহ্বল হয়ে পড়লো। উদাস দৃষ্টিতে তাকাতে লাগলো। আফসোস আর পেরেশানী গোটা সমাবেশকে ছেয়ে ফেললো।

২২

উৎসাহ প্রদান

পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, আবু সুফিয়ানের সাথে যে বাণিজ্যিক কাফেলা গিয়েছিলো তার মধ্যে আমীর এবং গরীব সবারই বাণিজ্যিক সম্পদ ছিলো। আল্লামা ওয়াকিদীর ভাষায়—সে কাফেলায় যার মাল সর্বনিম্ন ছিলো তা ছিলো বিশ দিরহাম স্বর্ণের মূল্য পরিমাণ। তাদের মধ্যে ভীতি কাপুরুষতা এবং উদাসীনতা ছেয়ে গিয়েছিলো। কারণ কাফেলার উপর আক্রমণ এবং ছিনতাই সবারই ধ্বংসের কারণ ছিলো। যে যতটা বিত্তশালী ছিলো, তার সম্পদও ছিলো সে পরিমাণ। সর্বশেষে নীরবতা ভঙ্গ করলো আবু জেহেল। লোকদের সম্বোধন করে বললো, "চিন্তা করবেন না, কাফেলাকে আক্রমণ এবং ছিনতাইয়ের জন্য ছেড়ে দেয়া যায় না। সবাই চলুন কাবাগৃহে। এতদশ্রবণে সবাই খানায়ে কাবায় প্রবেশ করলো। যমযমও উষ্ট্রী থেকে অবতরণ করলো। উটনী বাঁধলো দরজায়। সেও খানায়ে কাবায় প্রবেশ করলো। সমস্ত দরজাগুলো দিয়েই লোকজনের অনুপ্রবেশ ঘটছিলো। আবু জেহেল যমযমকে আলাদা একটি কোণে নিয়ে গেলো। তার সাথে একান্তে কথা বললো। সে জিজ্ঞেস করলো, বাস্তবেই কি মুসলমানরা কাফেলার উপর আক্রমণে উদ্যত?

যমযম ঃ বাস্তব কথা। অবশ্যই মুসলমানরা কাফেলার উপর আক্রমণ করবে। আমরা আযকা নামক স্থানে অবস্থান করছিলাম। আমাদের কাছে এলো জুযাম গোত্রের একটি লোক। সংবাদটি সেই আমাকে শুনিয়েছিলো। তারই সামনে মুসলমানরা রওয়ানা হয়েছিলো। আবদুল্লাহ ইবন উবাই তাকে আপনাদের সংবাদ দেয়ার জন্যে প্রেরণ করেছেন।

আবু জেহেল ঃ আবদুল্লাহ ইবন উবাই আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু। বাহ্যতঃ সে মুসলমান কিন্তু বাস্তবে আমাদের শুভাকাঙ্খী, মুসলমানদের শত্রু। তাদের মধ্যে অবস্থান করেই সে এমন কৌশল তাদের শিক্ষা দেয় যার ফলে মুসলমানরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। হুবল তার প্রতি এবং সংবাদদাতা জুযামীর প্রতি অনুগ্রহ করুন। কাফেলা এখনও আযকায় অবস্থান করছে?

যমযম ঃ আমি যতক্ষণ পথ চলেছি তারা ততক্ষণ সেখানেই অবস্থানরত ছিলো। এরপর আমার জানা নেই, কাফেলা সামনে অগ্রসর হয়েছে কিনা। তবে আমার ধারণা তারা যদি সম্মুখে অগ্রসর হয়, তাহলে মুসলমানদের ফাঁদে আটকা পড়ে যাবে।

আবু জেহেল ঃ পথিমধ্যে কোথাও তোমার সাথে মুসলমানদের সাক্ষাৎ হয়েছে?

যমযম ঃ না। রাস্তাতেও দেখা হয়নি, তাছাড়া কোন সংবাদও পাইনি। নেতাজী! আমি একটি স্বপ্ন দেখেছি।

আবু জেহেল ঃ স্বপ্নের মহামারী শুরু হলো দেখছি। এখানে আতিকা বিনতে মুত্তালিব স্বপ্ন দেখেছে। তার ব্যাখ্যা হলে তুমি। আর তুমি কি স্বপ্ন দেখেছো?

যমযম ঃ আমি একদিন উটনীর উপরেই শায়িত ছিলাম। অথবা মনে করুন, তন্দ্রা এসে গিয়েছিলো। একটি স্বপ্ন দেখলাম ঃ আমি মক্কার একটি উপত্যকায়। ওখানে আরও লোকজন। আকস্মিক শোর-হাঙ্গামা শুরু হলো। ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে আমি দেখলাম, গোটা উপত্যকা খুনে ভরপুর। অথচ ইতোপূর্বেই উপত্যকাটি ছিলো সম্পূর্ণ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। আর রক্ত নিম্নভূমি থেকে ঊর্ধ্বভূমির দিকে উপচে উঠছে। লোকজন তাতে হচ্ছে নিমজ্জিত। আমি একটি উঁচু জায়গায় দাঁড়িয়েছিলাম, রক্তের বন্যা সেখানেও পৌঁছলো। শো শো করে রক্তের ঢেউ আসছে। ভীত-সন্ত্রস্ত অবস্থায় আমার শরীর কাঁপতে আরম্ভ করলো। অতঃপর আমার চোখ খুলে গেলো। তখন থেকেই আমার ধারণা জন্মালো কুরাইশের লোকদের জানের উপর কোন মহাবিপদ আসছে। আমি যতই এ স্বপ্ন বিস্মৃত হতে চাচ্ছি এবং এ কল্পনা অন্তর থেকে ঝেড়ে মুছে ফেলে দিতে চাচ্ছি কিন্তু এই স্বপ্ন আমি ভুলতে পারছি না। এই ধারণাও হটাতে পারছি না।

আবু জেহেল ঃ এখনও তো তুমি এ স্বপ্ন অন্য কারো কাছে বর্ণনা করোনি?

যমযম ঃ না। শুধু আপনার কাছেই বিবৃত করলাম।

আবু জেহেল ঃ আচ্ছা ঠিক আছে। এ স্বপ্ন অন্য আর কারো কাছে বর্ণনা করবে না। এই শহরবাসী ভীষণ সন্দেহপ্রবণ এবং কাপুরুষ। এরা আতিকার স্বপ্নেই ভীত হয়ে পড়েছে। আর তোমার স্বপ্ন শুনলে আরো বেশী ঘাবড়ে যাবে।

যমযম ঃ ঠিক আছে, আমি আর কারো কাছে বিবৃত করছি না।

আবু জেহেল ঃ আমার সাথে এসো।

যমযম তার সাথেই চললো। দুজনই সমাবেশ পর্যন্ত পৌঁছলো। লোকজন এসে বসছিলো। সমাবেশের মাঝখানে আবুল বাখতারী ইবন আস, উমাইয়া ইবন খালফ, সুহাইল ইবন আমর, জামআ ইবন আসওয়াদ, রবীআর দুই পুত্র শায়বা এবং উৎবা, আবু সুফিয়ানের পুত্র হানযালা ও আমর একই স্থানে উপবেশন করছিলো। আবু জেহেল এবং যমযমও তাদের সন্নিকটে যেয়ে বসল। সবাইর যখন উপস্থিতি ঘটল তখন আবু জেহেল দাঁড়িয়ে বললো ঃ সমবেত জনতা! আমি যমযমের কাছ থেকে অনেক গোপন কথা জানতে

পেরেছি। সে বললো, মুসলমানরা কাফেলার মাল ছিনতাই করার জন্য এবং তাদের হত্যা করার জন্য রওয়ানা দিয়েছে। আমাদের একজন অন্তরঙ্গ বন্ধু আছে মদীনায়। সে আবু সুফিয়ানের কাছে একজন সংবাদবাহক পাঠিয়েছে এবং তাকে খবর দিয়েছে। আবু সুফিয়ান যমযমকে আমাদের কাছে পাঠিয়েছেন খবর দেয়ার জন্য। তিনি আমাদের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করেছেন। সে কাফেলায় আমাদের সবারই মাল ও আসবাব রয়েছে। এতে যেমন রয়েছে বিত্তশালীদের সম্পদ তেমনি দরিদ্রদের—কুরাইশের সম্পদ এবং ইয়াহুদীদেরও। আমাদের গোটা জাতির পুঁজি রয়েছে সে কাফেলায়। সে মাল যদি ছিনতাই হয়ে যায় তাহলে আমরা সবাই ধ্বংস হয়ে যাব। কাফেলার সাহায্য করা আমাদের উপর আবশ্যক। এই সাহায্যে একই ঢিলে দুই শিকার করা হবে। এক তো কাফেলার মদদ, দ্বিতীয়তঃ সম্ভব হলে মুসলমানদের সমূলে উৎখাত।

চিন্তার বিষয় হচ্ছে, যে মুসলমানদের সামর্থ্য বলতে কিছু ছিলো না, যাদের এত অসহায় এবং দুর্বল মনে করা হতো, যে বেচারারা জান বাঁচানোর জন্য পালিয়ে বেড়াতো। আমাদের দুর্বলতার সুযোগে আজই কিনা তারা এতটুকু শক্তি সঞ্চয় করে ফেলেছে যে, আমাদের বাণিজ্যিক কাফেলার উপর আক্রমন ও ছিনতাই আরম্ভ করে দিয়েছে। বাহ্যতঃ তারা যেন আমাদের ধমক দিচ্ছে যে, আমরা তোমাদের বাণিজ্য বন্ধ করে দেবো। বস্তুতঃই যদি তারা আমাদের বাণিজ্য বন্ধ করে দেয় তাহলে আমরা বুভূক্ষ হয়ে তড়পাতে তড়পাতে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়বো। আপনারা কি মুসলমানদের হুমকি বরদাশত করতে রাজি আছেন?

প্রচুর ধ্বনি–প্রতিধ্বনি এলো— কক্ষনো নয়। আবু জেহেল তার বক্তব্যের ধারা অব্যাহত রেখে বললো, আমার দৃঢ় বিশ্বাস ছিলো, আপনারা এ হুমকি সহ্য করে নিজেদের মাথায় কাপুরুষতার কলংক লেপন করবেন না। আমি বলছি, গোটা জাতিকে সম্মিলিত হয়ে মুসলমানদের এই হুমকির জবাব দেয়া উচিত। তাদের উপর আক্রমন করুন। তারা আশ্রয় নিয়েছে ইয়াসরিবে। হয়ত তাদের হত্যা করুন, না হয় ইয়াসরিব থেকে করুন বিতাড়িত।

আবু জেহেলের বক্তৃতায় জনসমাবেশে উত্তেজনার সৃষ্টি হলো। সমাবেশ থেকে রব উচ্চারিত হলো— আমরা তা–ই করবো।

আবু জেহেল ঃ এর কৌশল হলো, যুবক, বৃদ্ধ, পৌঢ়, নির্বিশেষে জাতির সবাই সশস্ত্র হয়ে মদীনার দিকে চলুন। চিরতরে পথের কাঁটা এ মুসলমানদের রাস্তা থেকে হঠিয়ে দিন। যারা নিজেরা যেতে সক্ষম নয়, তারা নিজেদের পক্ষ থেকে পারিশ্রমিক দিয়ে লোক পাঠাবে। যাদের কাছে সওয়ারী নেই, তারা আমাকে বলবে। যথাসাধ্যসম্ভব আমি যানবাহনের ব্যবস্থা করবো। যাদের

পাথেয় নেই, তাদের পাথেয়ের ব্যবস্থা করা হবে।

সমাবেশ থেকে আবু জেহেলের প্রশংসাধ্বনি উচ্চারিত হলো। সে বসে পড়লো। অতঃপর বক্তব্যের জন্য দাঁড়ালো সুহাইল ইবন আমর। তার বক্তৃতায় সে বললো, হে কুরাইশ বংশ! আমাদের গোটা জাতির উপর মুসিবত আপতিত হয়েছে। আমাদের জাতির মধ্য হতেই এক ব্যক্তি দাঁড়িয়েছে, সেই গোটা জাতিতে এবং দেশে ফেতনা সৃষ্টি করেছে। সে আমাদের প্রতিমা এবং উপাস্যগুলোকে লাঞ্ছিত করেছে। সেগুলোর অবমাননা করেছে। সে বলতে চায়, আমরা যেগুলোর পূজা–অর্চনা করছি সেগুলো হবে জাহান্নামের ইন্ধন। আমার তাজ্জব হচ্ছে, আত্মমর্যাদাবোধ হারিয়ে আপনারা এসব শুনেও কিভাবে হজম করে নিয়েছে? যিন্দা থাকলে হয় তাকে হত্যা করবেন, না হয় আপনারা আত্মোৎসর্গ করবেন। আপনাদের উপাস্যগুলোর নিন্দা করা হবে আর আপনারা শুধু তাকিয়ে শুনবেন। কত মারাত্মক আত্মমর্যাদাবোধহীনতার কাজ। বেদ্বীন মুসলমানদের সামনে যদি কেউ তাদের উপাস্যের নিন্দা করতো তারা জিহ্বা টেনে ছিঁড়ে ফেলতো, গলায় ছুরি চালাতো অথবা নিজেরা মরতো। তাদের মধ্যে এতটা জাতীয়তাবোধ এবং জিহাদী জযবা অথচ আপনাদের মধ্যে এতটা আত্মমর্যাদাবোধহীনতা! সময় আছে এখনও আপনাদের উপাস্যদের নিন্দাবাদকারীদের সমুচিত জবাব দিতে পারেন। তাদের দল ভারি হয়ে গেলে আপনারা তাদের কিছুই করতে পারবেন না। সবাই ঐক্যজোট হয়ে চলুন, মুসলমানদের সমূলে উৎখাত করে দিই। যাদের কাছে অর্থকড়ি নেই, আমার কাছ থেকে নিয়ে নিবে। যাদের কাছে অস্ত্র নেই, তারা অস্ত্র নিবে। এটা ক্রুসেড যুদ্ধ। এটাতে সবাইকে অংশগ্রহণ করতে হবে। এ বলেই সুহাইল বসে পড়লো। জনতা তারও প্রশংসা করলো।

অতঃপর বক্তব্যের পালা এলো জামআ ইবন আসওয়াদের। সে দাঁড়িয়ে তার বক্তব্যে বললো, সমবেত জনতা! লাত–উযযার শপথ, এরচেয়ে বড় দুর্ঘটনা কখনও আমাদের নজরে আসেনি। যেসব বেদ্বীন মুসলমান এখান থেকে চুপিসারে পলায়ন করেছে এবং ইয়াসরিবে যেয়ে আমাদের ভয়ে নিচু ও হীনবল হয়ে জীবন–যাপন করতো, আজকে তারা আমাদের বিরুদ্ধে মোকাবিলার জন্য আসছে। আমাদের কাফেলার উপর হামলা করছে। এটা আমাদের জন্য বড়ই লজ্জার কথা। তারা যদি আমাদের বাণিজ্যিক কাফেলার উপর লুটপাট চালাতে পারে তাহলে আমরা হীনবল হয়ে পড়বো। মুসলমানরা সিংহরূপ ধারণ করবে, আমরা ভেড়ায় পরিণত হবো। সূচনালগ্নেই যদি পানিকে বাধা দেয়া না হয়, পানি প্রবাহিত হওয়ার জায়গা পেলে পরবর্তীতে প্রবাহ রোধ করা অসম্ভব হয়ে পড়ে। মুসলমানদেরকে এখনই সমূলে উৎপাটন করার যথার্থ

সময়। কারণ, এখনও তারা সংখ্যালঘু। তারা সংখ্যাগরিষ্ঠ হলে তাদের খতম করা অসম্ভব হয়ে দাঁড়াবে। যাদের কোন কিছুর প্রয়োজন আমি তাদের তা দিতে প্রস্তুত। কারো কিছু আবশ্যক হলে আমার কাছ থেকে যেন নিয়ে নেয়। জনগণ তারও খুব তারিফ করলো।

অতঃপর পালা এলো ইবন আদীর। সে দাঁড়িয়ে তার ভাষণে বললো ঃ কুরাইশের ব্যাঘ্র ও শৃগাল আপনাদের হুমকি দিচ্ছে। আপনাদের কাফেলাকে মুসলমানরা এবং ইয়াসরিববাসী ছিনতাই করার জন্য উদ্যত হয়েছে। আপনারা তা মেনে নিবেন? যদি তা-ই হয় তাহলে কাপুরুষতার কলংক নিজেদের আঁচলে লেপন করবেন। আপনারা কি তাতে সম্মত আছেন? আপনাদের উপাস্যগুলোকে রাস্তায় ছুঁড়ে মারা হবে, তাতে কি আপনারা রাজি? দৃঢ়বিশ্বাস রাখুন, মুসলমানরা একদিন অবশ্যই তা করে দেখাবে। তাদের উৎখাত করুন। তাদের জিন্দা ছেড়ে দিবেন না। স্বীয় উপাস্যগুলোর সাহায্যে এগিয়ে আসুন। স্বীয় প্রতিমাগুলো এবং ধর্মের স্থায়িত্বের জন্য এবং ক্ষমতা ও নিরাপত্তার জন্য লড়াইয়ে ঝাপিয়ে পড়ুন। প্রস্তুত হোন এর জন্য। প্রতিটি গোত্র থেকে বিত্তবান এবং লড়াকুরা বেরিয়ে আসুন। সবাই প্রস্তুত হোন। আমি আপনাদের যানবাহনের ব্যবস্থা করবো, পাথেয় দিব এবং পরিবারের অবশিষ্ট লোকজনের ব্যয়ভার বহন করবো। জনগণ সবচেয়ে বেশী প্রশংসা করলো এর। কয়েকজন বললো ঃ আপনি সবচেয়ে বেশী সম্মানিত। আপনি আপনার হক আদায় করেছেন, দায়িত্ব পালন করেছেন। আমরা আমাদের হক আদায় করবো। চতুর্দিক থেকে বহু শ্লোগান ধ্বনিত হলো— “আমরা সবাই লড়তে যাবো।” ইতিমধ্যেই কিছুসংখ্যক লোকের মধ্যে চেঁচামেচি আরম্ভ হলো।

২৩
আবু লাহাবের কাপুরুষতা

এ পর্যন্ত যেসব বক্তব্য হয়েছে তার ফলে জনগণের মধ্যে বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনা এবং উত্তেজনা সৃষ্টি হলো। পরস্পর একে অপরকে উৎসাহিত করতে লাগলো। যাতে করে বেশী সংখ্যক লোক এ অভিযানের জন্য প্রস্তুত হয়। একজন অপরজনের কাছ থেকে প্রতিশ্রুতি নিতে লাগলো।

যখন অধিক চেঁচামেচি, শোর-হাঙ্গামা আরম্ভ হলো, তখন আবু জেহেল দাঁড়িয়ে বললো ঃ এখনও অনেক বক্তা রয়েছেন, তাদের বক্তব্য রাখতে দিন। আপনারা নিরবতা অবলম্বন করুন। বক্তব্য শুনুন। সবাই খামোশ হয়ে

গেলো। দাঁড়ালো আবু সুফিয়ানের সন্তান হানযালা। সে দাঁড়িয়ে বললো ঃ হে কুরাইশ বংশ! আপনারা সম্ভবতঃ এর চেয়ে বিস্ময়কর ব্যাপার দেখেননি। যারা আপনাদের দিকে তাকিয়ে থাকতো, আপনাদের ছিলো শাসিত, যারা আপনাদের দয়ায় জীবন–যাপন করতো আজ তারা চোখের দিকে চোখ তুলে মোকাবিলার জন্য আসছে। আপনাদের মুখ দেখাতে আরম্ভ করেছে। আশ্চর্যের বিষয়! তাদের এতটুকু স্পর্ধা কিভাবে হলো? এর কারণ একটাই, তারা আপনাদের ধর্মের উপর আক্রমণ করেছে আর আপনারা শুধু তাকিয়ে দেখেছেন। তারা আপনাদের উপাস্যগুলোর নিন্দা করেছে, আপনারা শুধু শুনেছেন। আপনাদের মনে সামান্যতম উষ্ণতা সৃষ্টি হয়নি। একটুও ধর্মীয় উত্তেজনা সৃষ্টি হয়নি। এর ফলশ্রুতিতে তাদের এতটা সাহস বৃদ্ধি পেয়েছে। আপনাদের নীরবতাকে তারা কাপুরুষতা ভেবেছে। এবার এতটাই তারা স্পর্ধিত হয়েছে যে, আপনাদের বাণিজ্যিক কাফেলার উপর আক্রমণ করার জন্য প্রস্তুত হয়েছে। মূলতঃ এই সাজা আপনাদের উপাস্যগুলোর পক্ষ হতে এসেছে। প্রতিমাগুলো আমাদের প্রতি রুষ্ট হয়েছে। এখনও সময় আছে, ধর্মের জন্য প্রাণ উৎসর্গ করতে প্রস্তুত হোন। দুশমনদের দেখিয়ে দিন আমরা সিংহশাবক, আমরা সিংহদিলের সন্তান সিংহদিল। এই বক্তব্য রেখে সে বসে পড়লো।

কেউ কেউ বললো, হে আবু সুফিয়ানের সন্তান! আপনার কি সম্পদের প্রতি অধিক লিপ্সা? আপনার নিকট কি ধনসম্পদ নেই? অন্যদের মতো যানবাহন ইত্যাদি প্রদানের প্রতিশ্রুতি আপনি কেন দেননি? হানযালা পুনরায় দাঁড়ালো। সে বললো ঃ উপস্থিত শ্রোতামণ্ডলী! আপনাদের প্রশ্ন যথার্থ। তবে সম্পদের প্রতি আমার মোহ নেই। আমি এতটা কৃপণ নই যে, একটা সৎ কাজে অর্থকড়ি ব্যয় করতে পিছপা হবো। তবে অপারগতা এই যে, ধনসম্পদ যা কিছু আছে সেগুলো সব কাফেলার কাছে। দ্বিতীয়তঃ এখানে সামান্য কিছু সম্পদ থাকলেও সেগুলো আমার নয়, আমার পিতা আবু সুফিয়ানের। এ সব ব্যয় করার অধিকার আমার নেই।

আবু জেহেল দাঁড়িয়ে বললো ঃ হানযালা পুরোপুরি সত্য বলেছে। তার ধনসম্পদ কাফেলার সাথে। বাড়ীতে যা কিছু আছে সেগুলো তার পিতা আবু সুফিয়ানের। সেসব ব্যয় করার এখতিয়ার তার নেই। তবে আর্থিক সহযোগিতা না করতে পারলেও, না করুক। সশস্ত্র যোদ্ধাদের সাহায্য তো করবে। সেটাই তার কাছ থেকে গ্রহণ করা হবে। এবার আমি গোটা সমাবেশের নিকট আবেদন করছি—তারা যেন কাফেলাকে বাঁচানোর জন্য, স্বীয় ধর্মের সাহায্যের জন্য, আপন উপাস্যদের অবমাননার প্রতিশোধ নেয়ার

লক্ষে দৃঢ়পদে স্পৃহার সাথে রওয়ানা হোন। আমি চাই, গরীব, আমীর সবাই যেন যান। কেউ পিছপা না হন। যারা তাদের নাম লেখাতে চান তাদের নাম তালিকাভুক্ত করুন। জনতা স্বীয় নাম তালিকাভুক্ত করতে লাগলো। বিকেল পর্যন্ত এ ধারা অব্যাহত থাকলো। সূর্য অস্তমিত হলো। আবু জেহেল দাঁড়িয়ে বললো ঃ অবশিষ্টরা আগামীকাল নাম লেখাবেন।

এতদশ্রবণে লোকজন রওয়ানা করলো। কিন্তু এখনও তাদের মনে নিরুৎসাহিতা ছেয়ে আছে। মনমরা অবস্থায় সবাই চলে যাচ্ছে বাড়ীর দিকে। আবু জেহেল ৫ সদস্যবিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করলো। এরা চাঁদা উসুল করবে। এই কমিটির অন্তর্ভুক্ত ছিলো যামআ ইবনুল আসওয়াদ, সুহাইল ইবনুল আমর, আবুল বাখতারী ইবন আস এবং স্বয়ং আবু জেহেল। সবাই প্রস্থান করার পর তারাও স্বীয় গৃহের দিকে রওয়ানা করলো। আব্বাস যদিও সমাবেশে উপস্থিত ছিলেন না, তা সত্বেও সমাবেশের কার্যক্রম সম্পর্কে পুরোপুরি ওয়াকিফহাল হয়েছেন। তিনি সভায় এইজন্য অংশগ্রহণ করেননি যে, হয়তো আবু জেহেল কোন উসকানীমূলক কথাবার্তা বলে ফেলবে। ফলে প্রতিশোধ নেয়ার ব্যবস্থা করতে হতে পারে। বিকেলে যখন তিনি বাড়িতে গেলেন, খাওয়া–দাওয়া সমাপ্ত করলেন, তখন আতিকা বললো ঃ আজকে কি নিয়ে শোর–হাঙ্গামা হলো?

আব্বাস ঃ তোমার স্বপ্নের একটি অংশ সত্যে পরিণত হয়েছে।

আতিকা ঃ কিরূপে?

আব্বাস ঃ আজকে আবু সুফিয়ানের একজন বার্তাবাহক ফরিয়াদী হয়ে এসেছিলো। জানতে পারলাম, মুসলমানরা আবু সুফিয়ানের কাফেলার উপর আক্রমণ করার চিন্তা–ভাবনা করছে।

আতিকা ঃ এ বিষয়টি আমি তখনই বুঝে ফেলেছিলাম, যখন কুরাইশ কুরয ইবন জাবেরকে মুসলমানদের চারণভূমিতে আক্রমণ করার জন্য প্রেরণ করেছিলো। আমার আশংকা ছিলো, মুসলমানরা তাদের কাছ থেকে প্রতিশোধ নিবে। আচ্ছা, কুরাইশ কি সিদ্ধান্ত নিয়েছে?

আব্বাস ঃ এরা কাফেলার সাহায্যে রওয়ানা হচ্ছে।

আতিকা ঃ এটা দ্বিতীয় ভুল, যা তারা করতে যাচ্ছে। মাল যায়, যেতে দিত—জানতো বাঁচানোর দরকার ছিলো।

আব্বাস ঃ তুমি তাদের জানের ফিকির করছো। ওরা মুসলমানদের প্রাণ সংহারের চিন্তা করছে।

আতিকা ঃ মুসলমানদের বিরুদ্ধে শত্রুতা অবশ্যই তাদের নিজেদের প্রাণ সংহার করবে।

আব্বাস ঃ আতিকা! এরূপ কথা বলো না। অন্যথায় লোকজন আমাদের অভিযুক্ত করবে। বর্তমান পরিস্থিতি উত্তেজনাকর। আবার কোত্থেকে কোন্ ফেতনা মাথা চাড়া দিয়ে উঠে কে জানে?

আতিকা ঃ আমি আমার মুখ বন্ধ করে রাখবো। তবে ভাইজান! আমার মন সাক্ষ্য দিচ্ছে, আমার স্বপ্ন বাস্তবায়িত হতে যাচ্ছে।

আব্বাস ঃ আমার ধারণাও তাই। তবে এ মুহূর্তে মুখ বন্ধ রাখাই উচিত।

এরা দুজনই আরো কিছু আলাপচারিতায় লিপ্ত থাকলেন। দ্বিতীয় দিন আবু জেহেল চাঁদা উসুল করতে আরম্ভ করলো। জনগণ সামর্থ্য মোতাবেক চাঁদা দিয়েছে। কেউ যানবাহন দিয়েছে, কেউ দিয়েছে অস্ত্রশস্ত্র। কেউ দিয়েছে টাকা পয়সা, স্বর্ণমুদ্রা, কেউ দিয়েছে রসদপত্র। নগদ টাকা পয়সা অনেকেই দিয়েছে। তু'আইমা ইবন আদী দিয়েছে বিশটি উট। সুহাইল উটও প্রদান করেছে আবার কিছু টাকাও। জামআ ইবনুল আসওয়াদ অস্ত্রশস্ত্র এবং শিরস্ত্রাণ দিয়েছে। আবু জেহেল প্রদান করেছে উট এবং নগদ অর্থকড়ি।

আবু জেহেল নাওফালকে কুরাইশের কোন শীর্ষস্থানীয় নেতার কাছে চাঁদা উঠানোর জন্য পাঠিয়েছিলো। সে প্রথমে আবদুল্লাহ ইবন রবি'আর কাছে গেলো। তাকে বললো, আমি আপনার কাছে ভিক্ষা চাইতে এসেছি। মুসলমানদের প্রভাব প্রতিপত্তি সীমা অতিক্রম করে ফেলেছে। তারা আমাদের কাফেলা ও মালামাল লুটপাট করতে আরম্ভ করেছে। আপনি জানেন, তাদের শক্তিসামর্থ্য যদি বেড়ে যায়, তাহলে তারা প্রথমতঃ আমাদের ব্যবসা–বাণিজ্য বন্ধ করে দিবে দ্বিতীয়তঃ অবমাননা করবে আমাদের প্রতিমাগুলোর।

আবদুল্লাহ ইবন রবী'আ ঃ এই অনুভূতি তোমার আজকে এসেছে? দীর্ঘদিন থেকে আমার এ আশংকা হচ্ছিলো। আমি পাঁচশত স্বর্ণমুদ্রা দিচ্ছি, যেভাবে ইচ্ছা ব্যয় করো।

নাওফাল খুব আনন্দিত হলো। বললো, সাবাশ! আপনি বড় মহৎ কাজ করেছেন। পাঁচশত দিনার তার কাছ থেকে নিলো। অতঃপর পৌঁছলো হুয়াইতিব ইবন আবদিল উয্যার কাছে। সেখানেও যেয়ে সে বক্তব্য রাখলো যা আবদুল্লাহ ইবন রবী'আর কাছে রেখেছিলো। সেও দিলো তিনশত স্বর্ণমুদ্রা। সারকথা, এভাবে কয়েকজন নেতার নিকট পৌঁছলো। সবাই মুক্তমনে দিল খুলে চাঁদা দিলো। তার ঝুলি একেবারে ভর্তি হয়ে গেলো।

নাওফাল যখন চাঁদা করে ফিরছিলো, তখনই আবু জেহেলও কয়েকজন লোক নিয়ে আবু লাহাবের কাছে যেয়ে পৌঁছলো। ইসলাম বিদ্বেষী ভূমিকায় আবু লাহাব আবু জেহেল থেকে কম ছিলো না। বরং তার চেয়ে কিছুটা অগ্রগামীই ছিলো। সে এবং তার অর্ধাঙ্গিনী প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সাহাবায়ে কেরামকে মারাত্মক কষ্ট দিয়েছে মক্কায় অবস্থানকালে। তাকে সতর্ক করার জন্য সূরায়ে লাহাব নামক একটি পূর্ণাঙ্গ সূরা অবতীর্ণ হয়েছিলো। আল্লাহ তা'আলা তাতে ইরশাদ করেছেন—

"ধ্বংস হোক আবু লাহাবের দুই হস্ত এবং ধ্বংস হোক সে নিজেও। তার ধনসম্পদ ও তার উপার্জন কোন কাজেই আসেনি। অচিরে সে দগ্ধ হবে লেলিহান অগ্নিতে এবং তার স্ত্রীও—যে ইন্ধন বহন করে, তার গলদেশে পাকানো রজ্জু।"

আবু জেহেল আবু লাহাবকে সম্বোধন করে বললো ঃ আপনি মুহাম্মাদ এবং তার সাথী–সঙ্গীদের প্রচুর কষ্ট দিয়েছেন—শায়েস্তা করেছেন। জাতি আপনার সে কৃতিত্ব ভুলবে না। আজকে মুসলমানরা শক্তিশালী হয়ে আমাদের হুমকি দিচ্ছে। আমাদের কাফেলার মালামাল ছিনতাই করছে। গোটা কুরাইশ বংশ প্রস্তুতি নিয়েছে মুসলমানদের সমূলে উৎখাত করার জন্য তাদের উপর আক্রমণ করবে। শীর্ষস্থানীয় সব নেতৃবৃন্দই এই অভিযানে অংশগ্রহণ করবেন। আপনিও সাথে চলুন।

আবু লাহাব খুব গভীরভাবে আবু জেহেলের বক্তব্য শ্রবণ করছিলো। সে যখন নীরবতা অবলম্বন করলো, তখন আবু লাহাব বললো ঃ আমি অপারগ।

আবু জেহেল ঃ আরে আপনি অপারগতা প্রকাশ করছেন? জাতির শীর্ষস্থানীয় নেতার আসন অলংকৃত করা সত্ত্বেও আপনি পিছপা হয়ে যাচ্ছেন? জাতি এ সম্পর্কে কি মন্তব্য করবে?

আবু লাহাব ঃ আমি জাতির কথায় কখনও চলি না। ভবিষ্যতেও কখনও চলবো না। আমি আমার মর্জিতে কাজ করবো। আবু জেহেল আশংকা করলো, আবু লাহাবও মুসলমান হয়ে গেছে কিনা। সে বললো, আপনি বেদ্বীনদের ধর্মকে ভালবাসতে আরম্ভ করেছেন?

আবু লাহাব ঃ আমার বিরুদ্ধে এ অভিযোগ উত্থাপন করো না। আমি মুসলমানদের শত্রু ছিলাম, ভবিষ্যতেও চির দুশমন থাকবো।

আবু জেহেল ঃ তাহলে আমাদের সাথে যাচ্ছেন না কেন?

আবু লাহাব ঃ তুমি কি দেখছো না, আতিকার স্বপ্নের একটি অংশ বাস্তবায়িত হয়েছে।

আবু জেহেল ঃ এই সংশয়ে পড়বেন না। আতিকা কোন স্বপ্নই দেখেনি। মনে হয় কোন মাধ্যমে সে আবু সুফিয়ানের বার্তাবাহকের আগমনের সংবাদ পেয়েছে। সে জনগণকে ভয় দেখাবার উদ্দেশ্যে এ সব ভুয়া স্বপ্নের অবতারণা করেছে। যেন আমরা মুসলমানদের বিরুদ্ধে লড়তে না বেরুই।

আবু লাহাব ঃ হতে পারে। তবে আমি তার স্বপ্নের ব্যাপারে দৃঢ়বিশ্বাসী। এজন্য এ অভিযানে অংশগ্রহণ করছি না।

আবু জেহেল ঃ আচ্ছা, আপনি যদি যেতে না পারেন, তাহলে আপনার পরিবর্তে অন্য কাউকে প্রেরণ করুন।

আবু লাহাব ঃ তা–ও সম্ভব নয়।

আবু জেহেল ঃ এতে করে জনগণের মধ্যে কুধারণা সৃষ্টি হবে। জাতি আপনাকে অভিযুক্ত করবে। আপনার উপর কাপুরুষতার ইলজাম দিবে।

আবু লাহাব ঃ যে যাই বলে বলুক, আমি যা সিদ্ধান্ত নিয়েছি তার উপর অটল থাকবো।

আবু জেহেল তাকে যতই বুঝালো এবং উদ্বুদ্ধ করলো, কিন্তু কিছুতেই সে প্রস্তুত হলো না। আবু জেহেলের কাছে তা ভীষণ বিষাদ ঠেকলো কিন্তু তা সত্ত্বেও আবু লাহাবকে কিছু বলতে পারলো না। কারণ, সে শীর্ষস্থানীয় নেতা। অতএব, তার সামনে থেকে উঠে প্রস্থান করলো।

২৪

আরেক পরী

রাফিদা এবং মাসউদ দুজনই সফর করছিলো। হঠাৎ একদিন রাফিদার স্বাস্থ্য খারাপ হয়ে পড়লো। দ্বিপ্রহরের সময় গায়ে ভীষণ জ্বর দেখা দিলো। তার উম্মত্ত আঁখিযুগল আরও লালবর্ণ ধারণ করলো। চেহারা আরও গোলাপী হয়ে উঠলো। তারা দুজন উটনী থামিয়ে যোহরের নামায আদায় করলো। রাফিদা কখনও নীরব বসে থাকার মত মেয়ে নয়। দুষ্টুমী ও ছেলেমী তার দ্বিতীয় স্বভাব। মাসউদকে সে সর্বদা বিরক্ত করতো। অবশ্য মাসউদের নিকট তার এই দুষ্টুমী খুবই ভালো লাগতো। সেদিন রাফিদা একেবারেই নীরব। মাসউদ এই পরীতুল্য চেহারার দিকে তাকিয়ে বললো, কি ব্যাপার, আজকে খুব গম্ভীর হয়ে বসে আছো যে?

রাফিদা ঃ না, তেমন বিশেষ কিছু হয়নি।

মাসউদ ঃ অবশ্যই।

রাফিদা ঃ কি?

মাসউদ ঃ তোমার চেহারায় রক্ত চমকাচ্ছে।

রাফিদা ঃ আমার শরীরে জ্বর উঠেছে।

মাসউদ ঃ তুমি আগে বললে না কেন?

রাফিদা ঃ তাহলে কি করতেন?

মাসউদ ঃ তাহলে সেখানেই অবস্থান করতাম।

রাফিদা ঃ অবস্থান করলেই কি জ্বর কমে যেতো?

মাসউদ ঃ গায়ে তো ঝটকা লাগতো না।

রাফিদা ঃ হাঁ, আজকে ধাক্কা কষ্টকর মনে হচ্ছে।

মাসউদ ঃ তুমি তো আসলে ময়দা আর পুষ্প নিংড়ানো লালিমার তৈরী। মাটি ময়দার চেয়ে শক্ত। মাটির যদি হতে তাহলে এতটুকু জ্বরকে কোনই পরোয়া করতে না।

রাফিদা ঃ এখনও মদীনা কত দূর?

মাসউদ ঃ এখনও বেশ দূর।

রাফিদা ঃ কাছে কোন জনপদ আছে কি?

মাসউদ ঃ আমরা বদর পেরিয়ে আর একটু অগ্রসর হয়েছি। সন্নিকটে বেদুঈনদের কিছু তাঁবু রয়েছে।

রাফিদা ঃ কতদূর হবে?

মাসউদ ঃ হয়তো দু'তিন মাইল হতে পারে।

রাফিদা ঃ আচ্ছা, তাহলে সেখানে চলুন।

মাসউদ ঃ তবীয়ত খুবই খারাপ হয়ে যাচ্ছে?

রাফিদা ঃ হাঁ। শরীর যেন ছিঁড়ে ফুড়ে যাচ্ছে। মন চায় পড়ে থাকতে।

মাসউদ ঃ কিন্তু তুমি যেতে পারবে?

রাফিদা ঃ কেন পারবো না?

মাসউদ ঃ আরে ভাই, তুমি ভালো মনে করো আর খারাপ মনে করো, আমার তো আশংকা হচ্ছে তুমি গলে যাও কিনা?

রাফিদা মুচকি হাসলো। সে বললো, আপনি এ ব্যাপারে ফিকির করবেন না। উটনী বসান। আমি যেতে পারবো। আমার মাথা ব্যথা আরম্ভ হয়েছে। এই বলে সে একটি কালো রুমাল স্বীয় ললাটে বেঁধে ফেললো। কালো রুমালে তাঁর চেহারা আরও চমকাতে লাগলো। মাসউদ উটনী বসাল। রাফিদা সওয়ার হতে লাগলো, কিন্তু হতে পারলো না। মাসউদ স্বীয় আলাপচারিতায় তার মন প্রফুল্ল করতে চাচ্ছিলো। তার অভিজ্ঞতা ছিলো রোগীর সামনে হাসি-কৌতুকের কথাবার্তা বললে রোগ কিছুটা হ্রাস পায়। সে বললো, এটুকু শক্তির উপরই এতটা গর্ব?

রাফিদা ঃ হাঁ, আমার শরীরে যে পরিমাণ জ্বর আপনার শরীরে তা হলে আপনি উঠে দাঁড়াতেই পারতেন না।

মাসউদ ঃ আল্লাহ, আল্লাহ। এখন ময়দান যে উপ্তপ্ত হচ্ছে তাতে তোমার এ জ্বরের দখল আছে। বেচারী সাংঘাতিক জ্বরে আক্রান্ত হয়ে পড়েছে। তার

জ্বর সূর্যের উত্তাপকেও মাত করে দিয়েছে।

রাফিদা ঃ বাকপটুতা, বানান যা পারেন।

মাসউদ ঃ উঠ, আমার হাতের উপর দাঁড়িয়ে যাও। এ বলে মাসউদ তার হস্ত প্রসারিত করলো। একেবারে ডাণ্ডার মত শক্ত হাত। রাফিদা তার উপর পা রাখতে ইতস্ততঃ করলো। এটাকে সে বেয়াদবী মনে করলো। কিভাবে ভাইয়ের হাতের উপর পা রেখে উটনীর উপর আরোহণ করবে। তাই মাসউদ বললো, ইতস্ততঃ করো না।

রাফিদা ঃ বেয়াদবী মনে হচ্ছে।

মাসউদ ঃ এটা তো সুস্থতার সময়, রুগ্ন অবস্থায় বেয়াদবী হবে না। উঠে পড়, আমি বলছি।

রাফিদা ঃ আপনার হস্ত আমার ভার বহন করতে পারবে?

মাসউদ ঃ অনিচ্ছাকৃতভাবে হু হু করে হেসে উঠলো।

রাফিদা ঃ এটা হাসির কোন কথা হলো?

মাসউদ ঃ কি বলবো? তুমি এতো হালকা, হাত তো হাত, আমার একটা আঙ্গুলও তোমাকে উঠাতে পারবে।

রাফিদা ঃ আচ্ছা, তাহলে উঠান তো দেখি? এই বলে সে হাতের উপরে পা রাখতে উদ্যত হলো। তবে সে আগেই জুতো পরে ছিলো। তৎক্ষণাৎ মনে হলো পায়ে জুতো। ফলে এক কদম পিছে হটে গেলো। পা থেকে জুতো খুলতে গিয়ে বলতে লাগলো, আমার মাথা কেমন খারাপ হয়ে গেছে জুতো খুলতেও মনে নেই।

মাসউদ ঃ জুতো খুলবে না।

রাফিদা ঃ কেন?

মাসউদ ঃ খালি পা হয়ে যাবে। আর আমি তোমার দেহে হাত লাগাতে পারি না।

রাফিদা ঃ আপনার হাত কোথায় লাগবে?

মাসউদ ঃ তোমার খালি পা আমার হাতের উপর লাগবে।

রাফিদা ঃ আপনি তো ভাইও বটে!

মাসউদ ঃ ভাইকেও বোনের শরীর স্পর্শ না করা উচিত। বাদানুবাদ করো না রাফিদা! জুতোসহ আমার হাতের উপর আরোহন করো।

বাধ্য হয়েই রাফিদা জুতো পায়ে মাসউদের হাতের উপর আরোহণ করলো। বস্তুতঃই সে একটি ফুল। তার ওজনে মাসউদের হাত একটুও কম্পিত হলো না। এতটুকু সহায়তা পেয়েই রাফিদা উটনীর উপর সওয়ার হলো। মাসউদও সওয়ার হলো। আরম্ভ হলো পথ চলা। যেহেতু তাদের তাড়া

ছিলো এজন্য উটনী খুব দ্রুত চালালো। অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই তারা জনপদের নিকটে পৌঁছে গেলো। বস্তুতঃ ওগুলোকে আর জনপদ কি বলা যায়। কয়েকটি দণ্ডায়মান খেজুর গাছ। সেগুলোর ছায়ায় চর্মনির্মিত কয়েকটি তাঁবু। তাঁবুর চতুর্পার্শ্বে সীমানা চিহ্নিত। আনুমানিক ১০/১২টি তাঁবু হবে। সবগুলো আলাদা আলাদা এবং প্রতিটি তাঁবুর সামনে সীমানা চিহ্নিত করা আছে। সীমানার ভিতরেই খর্জুর বৃক্ষগুলো দাঁড়িয়ে আছে। একদিকে কয়েকটা খেজুর গাছ। সেখানে একটা ছোট্ট কূপ।

মাসউদ চিন্তা করছিলো কোন্ তাঁবুর পাশে যেয়ে তারা থামবে। তারা দেখলো একটি তাঁবু কিছুটা উঁচু মনে হচ্ছে। তাদের ধারণা হলো, বোধহয় এটি এই গোত্রের শীর্ষস্থানীয় কোন নেতার হবে। সেদিকেই তারা অগ্রসর হলো। তাঁবুর সীমানার কাছে পৌঁছার পর একটি মেয়ে বেরিয়ে আসলো ভিতর থেকে। নেহায়েত সুন্দরী, সাজসজ্জা তার বড়ই আকর্ষণীয়। ডাগর চক্ষুবিশিষ্ট, মনোমুগ্ধকর তার চেহারা। মেয়েটি মাসউদের দিকে দৃষ্টি ফিরিয়ে দেখলো। মাসউদ ইতস্ততঃ বোধ করলো। চন্দ্রমুখ এ সুন্দরীর সাথে কোন কথা বলতে পারলো না। যুবতীটি বললো, স্বাগতম, মুবারকবাদ। যুহরীর তাঁবুতে আপনার আগমন শুভ হোক। মাসউদ অতি কষ্টে জিজ্ঞেস করলো, যুহরী কি তোমার পিতার নাম? তিনি কি গোত্রপতি?

নাজনীন (চন্দ্রমুখ সুন্দরী) ঃ জ্বি হাঁ। আসুন। এ উটনীর ভেতরে কে?

মাসউদ ঃ আমার বোন। নাজনীন খুবই আনন্দিত হলো। সে বললো, বাহ্, তাহলে বসান না কেন আপনার উটনীটি?

মাসউদ ঃ আজ তার গায়ে ভীষণ জ্বর উঠেছে।

নাজনীন ঃ কুচ পরোয়া নেহি। আমার জননী চিকিৎসা করতে জানেন। তিনি গোটা কবীলার চিকিৎসা করে থাকেন।

মাসউদ তার উটনীটি বসালো। রাফিদা তার নিজ হাতে পর্দা উঠালো এবং পা হেচড়ে মাসউদের হাতের উপর দাঁড়ালো অতঃপর নিচে বালুতে অবতরণ করলো। নাজনীন দ্রুত তার কাছে এলো। তার হাত ধরলো। সে খুব চমকে উঠলো। বললো, খুব ভীষণ জ্বর তো গায়ে! আসুন, আমার সাথে চলুন। সে রাফিদাকে আশ্রয় দিয়ে এগিয়ে নিয়ে চললো বাড়ীর সীমার ভিতর দিকে। সেখানেই তার মায়ের সাথে সাক্ষাৎ হলো। মধ্যবয়সী এক মহিলা তার মা। তিনি বললেন, সালিমা! মেয়েটি কি অসুস্থ? সে নাজনীনের নামই সালিমা। সে জবাব দিল, হাঁ, আম্মু! তার মায়ের ডাক নাম ছিলো উম্মে সালিমা। সে বললো, ঠিক আছে, তাহলে তাঁবুর ভিতরে নিয়ে চলো। আমি কেবল মাত্র আসলাম। সালিমা রাফিদাকে ভিতরে নিয়ে গেলো। তাঁবু বাইর

থেকে তো একটাই মনে হচ্ছিল কিন্তু ভিতরে অনেকগুলো রুম ছিলো বড় বড়। এক এক রুমের ভিতর কয়েকজন করে বিশ্রাম নেয়ার মতো। মাঝখানে একটি বড় রুম। সালিমা রাফিদাকে পাশের একটি কামরায় নিয়ে গেলো। বিছানার উপর তাকে শোয়ালো।

রাফিদা ঃ সালিমা আপু! আমার খুব পিপাসা লাগছে।

সালিমা ঃ একটু অপেক্ষা করো বোন! গরম থেকে এসেছো। উত্তাপের প্রতিক্রিয়া একটু দূর হোক তখনই পানি পান করাবো। তুমি অনুমতি দিলে তোমার ভাইয়ার উটনীটি আমি বেঁধে আসতে পারি।

রাফিদা ঃ ঠিক আছে, যান।

যখন সে তাঁবু থেকে বের হচ্ছিলো তখন তার মা ছিলেন দরজায়। সে বললো, আম্মু! মেয়েটির খুব পানির পিপাসা লাগছে।

উম্মে সালিমা ঃ আমি তাকে আরক পান করাবো। মেয়েটির সাথে কে আছে?

সালিমা ঃ তার ভাই।

উম্মে সালিমা ঃ তার উটনীটি খেজুর গাছের সাথে বেঁধে দাও। আর তাকে তাঁবুর ভেতর নিয়ে এসো।

সালিমা ঃ আমি এজন্যই যাচ্ছি।

উম্মে সালিমা তাঁবুর ভিতরে পৌছলেন। গেলেন রাফিদার কাছে। রাফিদা তাকে অভিবাদন জানালো। তিনি তাকে দোআ করলেন। তার কপালে হাত রেখে কিছুক্ষণ পর বললেন, তোমার গায়ে লু হাওয়া লেগেছে। ফলে শরীর খুব গরম। একটু আরক পান করে নাও। বিকেল পর্যন্ত শরীর সুস্থ হয়ে যাবে।

উম্মে সালিমা সেখান থেকে একটি চামড়ার পাত্র নামালো। একটি কাঠের পেয়ালা বের করলেন। তাতে আরক ঢেলে রাফিদাকে পান করালো। বসলেন তার সান্নিধ্যে। রাফিদার চোখগুলো তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়ছিলো। সালিমা সীমানার বাইরে এসেছিলো। মাসউদ এখনও উটনীটির নিকটেই দাঁড়ানো। সালিমা তার কাছে যেয়ে বললো, উটনীটি বাড়ীর সীমানায় নিয়ে চলুন।

মাসউদ ঃ তোমার আব্বু কোথায়?

সালিমা ঃ শিকারে গেছেন।

মাসউদ ঃ তাহলে থাক, আমি উটনীটি খেজুর বাগানেই নিয়ে যাই।

সালিমা ঃ আমার আব্বু এই কবীলার সর্দার, গোত্রপতি। আপনি জানেন? তিনি যদি জানেন, আপনারা আমাদের তাঁবুতে এসেছেন আর আমরা আপনাকে এখানে অবস্থান করতে দেইনি, শুধু আপনার বোনকেই ঘরে রেখে দিয়েছি, তাহলে কতটা অসন্তুষ্ট হবেন? আপনি তার নারাজির আন্দাজ

করতে পারবেন না। আপনি উটনী নিয়ে আসুন। লাগাম আমার হাতে দিন।

এই বলে সালিমা এতটা কাছে চলে গেলো যে, তার শরীরের মৃদু সুঘ্রাণ মাসউদের নাকে প্রবেশ করছিলো। একপ্রকার উন্মাদনা সৃষ্টি হলো। মাসউদ তৎক্ষণাৎ নিজেকে সংযত করলো এবং বললো, আচ্ছা ঠিক আছে। আমি নিজেই উটনী নিয়ে আসছি।

সালিমা ঃ চলুন।

মাসউদ উটনী নিয়ে চললো। সালিমা তার সাথেই চললো। একেবারেই নিকট দিয়ে হাঁটছিলো। প্রায় যেন গায়ের সাথেই ধাক্কা লেগে যাচ্ছিলো। দুজনেই বাড়ীর সীমানায় প্রবেশ করছিলো। উম্মে সালিমা তাকে প্রশস্ত রুমটিতে নিয়ে গেলেন। তিনি বললেন, মেয়েটি বিশ্রাম নিচ্ছে। তুমি এখানেই বসে যাও।

মাসউদ বসে পড়লো। সালিমা তাকে কতগুলো খেজুর এনে দিলো। মাসউদ বসে বসে খেতে লাগলো।

২৫

ভাগ্যপরীক্ষা

মক্কার পৌত্তলিকদের মধ্যে মুসলিম বিরোধী উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়লো। কারণ, মুশরিকরাই ছিলো সংখ্যাগরিষ্ঠ। মুসলমানরা ছিলো সংখ্যালঘু। আর উত্তেজনার কারণও ছিলো, মুসলমানরা সংখ্যালঘু এবং দুর্বল। তা সত্ত্বেও সংখ্যালঘিষ্ঠ কুরাইশ কাফেলার উপর হামলা ও ছিনতাইয়ের চেষ্টা করছে।

জনগণ সাধারণতঃ নির্বোধ ও অদূরদর্শী হয়ে থাকে। তারা নেতাদের পিছনে পিছনে চলাটাকে নিজেদের জন্য গর্বের বিষয় মনে করে। আসলে জনগণের এই সৌভাগ্য হবেই বা কোত্থেকে যে, নেতৃস্থানীয় লোকেরা তাদের সাথে কথা বলবে, তাদেরকে কাছে বসাবে, তাদের কাছ থেকে পরামর্শ নেবে। আমীর উমরারা তো সাধারণ জনগণকে দূর দূর করে কাছ থেকে তাড়িয়ে দেয়। কিন্তু যখন সময় আসে, সাধারণ গরীব জনগণ দ্বারা তাদের কোন স্বার্থ উদ্ধারের প্রয়োজন হয় এবং তাদের মাধ্যমে নিজেদের ক্ষমতা বৃদ্ধির দরকার হয় তখন গরীবদের সান্নিধ্যে আসে। গরীবদের সাথে কথাবার্তা বলে, তাদের কুশল জিজ্ঞেস করে। গরীবরা মনে করে আমাদের শান বেড়ে গেছে। এটাকে গর্বের বিষয় মনে করে। গর্ব করে বলে, আজকে আমার সাথে অমুক নেতা কথা বলেছেন। তিনি আমাকে ডেকেছেন, সসম্মানে সান্নিধ্যে বসিয়েছেন। বেচারা সাধারণ জনগণ এতটুকু বুদ্ধি রাখে না, তারা বুঝে না এসব আমীর এবং নেতৃবৃন্দ, আর জনগণ একই এলাকার অধিবাসী। একই জমিনে

বসবাসকারী। কিন্তু এতদিন তো নেতারা কিছু জিজ্ঞাসা করেনি। আজকে আবার এমন কি নতুন বিষয় দেখা দিলো যে, তারা আমাদেরকে জিজ্ঞেস করতে আসলো। তারা যদি এ বিষয়টি নিয়ে গভীর ভাবে চিন্তা করতো, তাহলে বুঝতে পারতো আমীরদের এখন তাদের প্রয়োজন পড়েছে। তাদের দিয়ে কোন স্বার্থ উদ্ধার করতে চায় তারা, এতে নেতৃবৃন্দেরই ফায়দা। দেশ বা জনগণ বা জাতি ও গরীবদের কোন স্বার্থ নেই। বেচারা শুধু এ কারণেই তাদের কুলি–মজুর বনে যায় যে, নেতৃবৃন্দ তাদেরকে জিজ্ঞেস করেছে। নেতারা বৈধ–অবৈধ সব কাজ তাদের দিয়ে করায়। রাতকে রাত নেতাদের জন্য তারা জেগে থাকে। মাইলের পর মাইল পদব্রজে সফর করে। আমীরদের সন্তুষ্টি অর্জনের আশায় স্বীয় জান পর্যন্ত উৎসর্গ করে। মক্কার গরীব জনগণের অবস্থাও ছিলো তাই। তারা নেতাদের ইশারায় নৃত্য করতো। তাদের এ ব্যাপারে কোন লক্ষ্যই ছিলো না যে, জনগণের বিপ্লব হলে নেতাদের সিংহাসন হেলে দুলে পড়তে দেখলে তারা শংকিত হয়ে উঠে। বরং নেতারা সর্বদা জনগণকে বলির পাঠা বানিয়ে জবাই করতে চায়।

সাইয়েদুল আম্বিয়া হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর পয়গাম নিয়ে আগমন করলেন। তিনি মক্কার লোকদের মধ্যে একত্ববাদের প্রচার করলেন। জনগণকে সাম্যের শিক্ষা দিলেন। গরীবদেরকে আমীরদের গোলামীর শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করতে চাইলেন। আমীর ও নেতৃবৃন্দের কাছে এটাই সবচেয়ে খারাপ লাগলো। তাদের এ বিষয়টি মূল লক্ষ্য উদ্দেশ্য ছিলো না যে, তাদের প্রতিমাগুলোর অবমাননা করা হচ্ছে। তাদের আসল মতলব ছিলো তাদের প্রভাব–প্রতিপত্তি ও ক্ষমতা ধুলায় লুণ্ঠিত হতে যাচ্ছে। সে গরীব জনগণ যারা সর্বদাই তাদের আনুগত্য করে চলে, তারা কখন আবার তাদের সমান বলে দাবী করে বসে আবার তাদের অবাধ্য হয়ে যায়—এটা নেতৃবৃন্দ কিভাবে বরদাশত করতে পারে। সাম্য তো তখনই সম্ভব যখন ধনী দরিদ্র, নেতা ও জনগণ একই সাথে বসতে পারবে। এটা কখনও নেতৃবৃন্দের মনপূত ছিলো না। কিন্তু নেতারা জনগণকে প্রকাশ্যে তো এ কথা বলতে পারে না যে, আমরা আমীর–গরীব সবাই সমান হতে পারি না। এ কথা বললে তো তাদের মূল রহস্যই উদঘাটিত হয়ে যেতো। সাধারণ জনগণ তাদের বিরুদ্ধে চলে যেতো। খুবই সম্ভব ছিলো তারা মুসলমান হয়ে নেতাদের ক্ষমতা ও নেতৃত্বের আসনই ভেঙ্গে চুরমার করে দিতো। এজন্য নেতারা সাধারণ জনগণকে এই বলে বিভ্রান্ত করতো যে, তোমাদের ধর্ম এখন আশংকাজনক অবস্থায় পতিত। আমাদের উপাস্য ও প্রতিমাগুলোর অবমাননা করা হচ্ছে। এসব সস্তা বক্তৃতায় অবুঝ জনগণ ভীষণ উত্তেজিত হয়ে উঠলো। মক্কার

নেতৃবৃন্দ তাদের জোরালো ও গরম বক্তব্যের মাধ্যমে জনগণকে উত্তেজিত করে তুললো। তারা মূলতঃ কাফেলাকে বাঁচানোর জন্য নয়, মদীনার উপর আক্রমণ করার জন্য প্রস্তুতি নিতে লাগলো। গরীব–দুঃখীদের নেতারা নগদ অর্থকড়িও দিয়েছিলো। যাদের কাছে সওয়ারী ছিলো না, তাদের সওয়ারীর এন্তেজাম করেছিলো, যাদের কাছে ছিলো না অস্ত্রশস্ত্র তাদের অস্ত্রশস্ত্র ও রসদপত্র দিয়ে প্রস্তুত করলো। মক্কার মুশরিকদের এ নিয়ম ছিলো, যখন কোন কাজের সূচনা করতো, তখন ভাগ্যপরীক্ষায় লটারী দিতো। এ কাজটি সর্ববৃহৎ প্রতিমা হুবলের সামনে করা হতো। হুবল প্রতিমাটি কাবা ঘরের ছাদের উপর স্থাপিত ছিলো। অতএব কুরাইশের সব বড় বড় নেতা জমায়েত হলো। তাদের মধ্যে ছিলো আবু লাহাবও। সে বললো ঃ শর দিয়ে আমাদের ভাগ্য পরীক্ষা করে নেয়া উচিত। তারা ভাগ্য পরীক্ষা শরের মাধ্যমেই করতো। কাফিররা এর মাধ্যমেই শুভ–অশুভ নির্ণয় করতো যে, তাদের ভবিষ্যত ভালো হবে না খারাপ হবে।

যমযম ঃ আবু সুফিয়ান নিষেধ করে দিয়েছিলেন বলেছিলেন যেন শরের মাধ্যমে এ অভিযানে ভাগ্য পরীক্ষা করা না হয়।

উমাইয়া ঃ এটা কি করে সম্ভব? শুভলক্ষণ জানার নিয়ম আমাদের বড়দের থেকে চলে আসছে। এটা বর্জন করা সম্ভব নয়।

আবু জেহেল ঃ আসল কথা তো আবু সুফিয়ানই বলেছেন। আমরা যদি শর দ্বারা ভাগ্য পরীক্ষা করি, আর এই ভাগ্য পরীক্ষায় যদি নিষেধাজ্ঞা আসে তাহলে কি হবে?

আবুল বাখতারী ঃ এরকম হবে কেন?

সুহাইল ঃ হতে পারে। এরূপ হওয়া সম্ভব। যদি তাই হয় তাহলে কি মক্কা থেকে বের হবেন না? এখানেই থেমে যাবেন?

উতবা ঃ আমরা এবং আমাদের বড়রা সর্বদাই তীর দিয়ে ভাগ্য পরীক্ষা করেছি। আমি মনে করি অবশ্যই ভাগ্য পরীক্ষা করা উচিত।

হারেস ঃ আমার বক্তব্য, এ আলোচনা কেন অব্যাহত রয়েছে? যদি অশুভ লক্ষণ দেখা যায় তাহলে আমরা অভিযানের ব্যাপারে কি করবো? ব্যাপারটি শুধু কাফেলারই নয়।,বরং আমাদের ধর্মের সাথেও সংশ্লিষ্ট। যে প্রতিমাগুলোর আমরা এ পর্যন্ত পূজা–অর্চনা করে এসেছি সেগুলোর কি জানা নেই যে, ওদের অবমাননা যারা করেছে আমরা তাদের কাছ থেকে প্রতিশোধ নিতে যাচ্ছি? আমাদের উপাস্যগুলো আমাদের সাহায্য অবশ্যই করবে। শরগুলোর শুভলক্ষণ অবশ্যই আমাদের পক্ষেই বের হবে।

আবু জেহেল ঃ কিন্তু প্রশ্ন থেকে যাচ্ছে অভিযানে বের হবার পক্ষে যদি

ভাগ্য নির্ধারিত না হয় তাহলে কি হবে? তবে কি আমরা কাফেলার মদদ করবো না? ছিনতাই করার জন্য তাদের দুশমনদের দয়ার উপর ছেড়ে দিবো?

উমাইয়া ঃ এটা পরের কথা। আমরা সূচনালগ্নেই কেন মেনে নিব যে, আমাদের শুভলক্ষণের পক্ষে ভাগ্যতীর বের হবে না? আমরা ভাগ্যপরীক্ষাকে আমাদের ধর্মের একটি অংশ মনে করি। অতএব যেমনিভাবে আমরা ধর্ম বর্জন করতে পারি না, এমনিভাবে আমরা পারি না ভাগ্যপরীক্ষাও পরিত্যাগ করতে।

আবু লাহাব ঃ এটিই আমার রায়।

সারকথা, শুধু আবু জেহেল ছাড়া আর সবাই এ ব্যাপারে ঐক্যমত হলো যে, অবশ্যই ভাগ্যপরীক্ষা করা হোক।

যমযম ঃ আমি আবেদন করছি, আবু সুফিয়ানের কথাটা মেনে নেয়া হোক। ভাগ্যপরীক্ষা না করা হোক। কিন্তু অন্যরা সবাই কঠোরভাবে তা প্রত্যাখ্যান করলো। তারা বললো, অবশ্যই পরীক্ষা করা হবে। ফলে সবাই চলে গেলো কাবাগৃহে। দাঁড়াল হুবলের সামনে। সবাই তার সামনে প্রণাম করলো। তাকে সেজদা করলো। এই প্রতিমাটি ছিলো বিশালকায় ও সুদীর্ঘ। প্রণাম থেকে মাথা উঠিয়ে সবাই হাতজোড় করে দাঁড়াল। উমাইয়া ইব্ন খালফ বললো ঃ হে আমাদের এবং আমাদের পিতা–প্রপিতাদের উপাস্য! আপনি শুনুন, বর্তমান পরিস্থিতিতে আমরা অস্থির এবং উদ্বিগ্ন হয়ে আপনার দরবারে এসেছি। আপনি আমাদের সাহায্য করুন। আমাদের কাফেলাকে নিরাপদে এখানে ফিরিয়ে আনুন। আমাদের এবং আপনার শত্রুদের পদদলিত করুন। আমরা মুসলমানদের উপর আক্রমণ করতে চাচ্ছি। এখানে এসেছি ভাগ্য পরীক্ষা করতে। এই ভাগ্যপরীক্ষায় আপনি আমাদের সাহায্য করুন। অতঃপর সবাই প্রণামে পতিত হলো। অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই প্রণতি থেকে মাথা উত্তোলন করে বসে রইলো। প্রতিমার পায়ে রূপার একটি পাত্র রাখা ছিলো। তাতে অনেকগুলো শর ছিলো। উমাইয়া ইব্ন খালফ সমস্ত তীরগুলো বের করে আনলো। একটি তীরে লেখা ছিলো হাঁ, অপরটিতে না। এ দুটো তীর রূপার পাত্রে ঢুকিয়ে উপরে ঢাকনা দিয়ে ঢেকে ফেললো। পালাক্রমে কয়েকজন সে পাত্রটিকে নাড়াচাড়া করলো অতঃপর এটিকে রাখলো প্রতীমার পায়ের উপর।

এবার উমাইয়া ইব্ন খালফ প্রণামে পতিত হলো। সে বললো ঃ হে বড় উপাস্য! আমাদের জন্য যা কল্যাণকর হয় এবং আপনার মর্জি হয় সেটাই প্রকাশ করুন। অতঃপর সে মাথা উঠালো। সে পাত্র হাতে নিলো, ঢাকনা খুললো, দুটি আঙ্গুল ঢুকিয়ে একটি তীর বের করে নিলো। সবাই খুব শখ

করে সে তীরটা দেখার জন্য ঝুকে পড়লো। কিন্তু ভাগ্য খারাপ। না সূচক তীরটি উত্তোলিত হলো। অর্থাৎ, আক্রমণ করতে নিষেধ করা হলো। সবাই হীনবল হয়ে পড়লো। হীনমন্যতা সবার মধ্যে ছেয়ে গেলো।

যামআ ঃ একবার কোন ধর্তব্য নয়। তিনবার বের করুন। অতএব, তিনবারই ভাগ্যপরীক্ষা করা হলো। তিনবারই না সূচক তীর বের হলো। সবাই হতভম্ব এবং উৎকণ্ঠিত হয়ে পড়লো।

আবু জেহেল ঃ এজন্যই আমি ভাগ্যপরীক্ষা করতে নিষেধ করেছিলাম। সত্য কথা কি, এসব তীরের উপর মুসলমানরা যাদু করেছে। শতবার ভাগ্যপরীক্ষা করলেও না–ই বের হবে। এই ভাগ্যপরীক্ষার ঝামেলায় পড়ো না। স্বীয় কাফেলা এবং নিজেদের ধনসম্পদ বাঁচানোর জন্য অভিযানে বেরিয়ে পড়ো। সবাই তাই বললো—হাঁ, মুসলমানরা তীরের উপর যাদু করেছে। ভাগ্যপরীক্ষা ধর্তব্য নয়। কাফেলার সাহায্য অবশ্যই করা উচিত। অতএব, তাই সিদ্ধান্ত হলো। সবাইকে বলা হলো, বিকেল পর্যন্ত যেন প্রস্তুতি নেয়। সকালেই মদীনার দিকে রওয়ানা করা হবে। সবাই ওখান থেকে উঠে চলে গেলো। যামআ একাকী মক্কা থেকে বেরিয়ে 'যিতুয়ায়' পৌঁছুলো। সেখানে ভাগ্যপরীক্ষা করলো। সেখানেও ভাগ্যে নিষেধাজ্ঞা আসলো। ফলে না–সূচক তীরটিকে সে ভেঙ্গেই ফেললো। বললো, কোন সন্দেহ নেই এ তীর মিথ্যা। তার উপর যাদু করা হয়েছে।

ঠিক এসময়েই সুহাইল ইব্‌ন আমর হাজির হলো। সে বললো, জামআ! আপনি এতো ক্রোধান্বিত কেন? প্রতিউত্তরে জামআ ভাগ্যপরীক্ষার এই ইতিবৃত্ত শুনালো। সুহাইল বললো ঃ আরে বাদ দাও। ভাগ্যপরীক্ষার পরোয়া করো না। বর্তমানে ভাগ্যপরীক্ষার সমস্ত তীর মিথ্যুক হয়ে গেছে। উমায়র ইব্‌ন ওয়াহাবও ভাগ্যপরীক্ষা করেছিলো। কিন্তু তাতেও নিষেধাজ্ঞা বেরিয়েছে। ফলে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত এই–ই করা হয়েছে যে, কাফেলার সাহায্য এবং মুসলমানদের উপর আক্রমণ চালানো হবে। এর জন্য সবাই প্রস্তুতি নাও।

জামআ ঃ আমার চূড়ান্ত সিদ্ধান্তও তাই। এই বলে উভয়েই মক্কার দিকে চলে গেলো।

২৬

মেজবান

মাসউদ খেজুর খাচ্ছিলো। সালিমা তার সামনে এবং পাশেই বসা। একদিকে ছিলেন তার মা–ও। সালিমা কখনও কখনও দৃষ্টি চুরি করে মাসউদের দিকেও তাকাচ্ছিলো। কয়েকবার এমনই হলো। মাসউদের নজরও

দু–একবার তার দৃষ্টির সঙ্গে একাত্ম হয়ে গেলো। মাসউদ দেখলো সালিমা তার দিকে দৃষ্টিপাত করছে। মাসউদের নজর পড়ার সাথে সাথেই সালিমা তার দৃষ্টি ফিরিয়ে নিলো। মাসউদ যেন নিজে আনমনা ও আত্মভোলা হয়ে পড়লো। খেজুর খাওয়ার কথাও ভুলে যাচ্ছিলো। উম্মে সালিমা মাসউদকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার কি পরিচয়? তুমি কোন্ বংশের ছেলে? কোথায় যাচ্ছো? মাসউদ তার কথার জবাব দিলো।

উম্মে সালিমা বললেন ঃ তোমরা দু–ভাইবোন, বড়ই চমৎকার। তবে এ বিষয়টা খারাপ লাগছে যে, তোমরা মুসলমান হয়ে মদীনায় যাচ্ছ।

মাসউদ ঃ আমরা অনেক যাচাই বাছাইয়ের পর ইসলাম গ্রহণ করেছি। মক্কাবাসীরা আমাদেরকে ভীষণ জ্বালাতন করেছে। উত্যক্ত হয়ে আমরা সেখান থেকে বেরিয়ে পড়েছি।

উম্মে সালিমা ঃ এখানে মুহাম্মাদ (সাঃ) এসেছিলেন। আমাদের বংশের লোকদেরও তিনি ইসলামের দাওয়াত দিয়েছেন। তবে আমরা ইসলাম গ্রহণ করিনি। অবশ্য তার সাথে এ ব্যাপারে ঐক্যমত হয়েছি যে, আমরা তার সহযোগিতা করবো। সর্বদা তার মদদগার হিসেবে থাকবো।

মাসউদ ঃ খুবই ভালো করেছেন। আপনারা যখন মুসলমানদের সঙ্গে মেলামেশা করবেন, ইসলামকে পরীক্ষা করবেন তখন একদিন অবশ্যই ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করবেন।

উম্মে সালিমা ঃ যুহরী অত্যন্ত জ্ঞানবান লোক।

মাসউদ ঃ শায়েখ যুহরী কখন ফিরে আসবেন?

উম্মে সালিমা ঃ শায়েখ যুহরী এবং তদ্বীয় পুত্র নাইল দুজনই শিকারের প্রতি আসক্ত। সপ্তাহে অন্ততঃ চারদিন অবশ্যই শিকারে বের হন। সকালেই বেরিয়ে পড়েন এবং সূর্য অস্তমিত হওয়ার পূর্বেই ফিরে আসেন। আমার দৃঢ়বিশ্বাস আজকেও তারা সূর্যাস্তের আগেই বাড়ীতে ফিরবেন। তুমিও কি শিকার করতে জান?

মাসউদ ঃ আমি শিকার করাকে তেমন পছন্দ করি না।

সালিমা তখন মুচকি হাসলো। সে বললো, শিকার করতে তো কষ্ট করতে হয়। বোধহয় আপনি কষ্টসহিষ্ণু নন। পরিশ্রম করতে পারেন না।

মাসউদ তার দিকে চোখ তুলে তাকালো। দুজনেরই দৃষ্টি বিনিময় হলো।

মাসউদ ঃ তুমি মেহনতের কথা বলছো? পরিশ্রম ও মেশাকতে আমি অভ্যস্ত।

সালিমা ঃ তাহলে বোধহয় লক্ষ্যস্থিরে পটু নন।

মাসউদ ঃ তীর ছুড়তে আমি অভ্যস্ত। তীরান্দাজীতে আমি সিদ্ধহস্ত–

সুবিখ্যাত। মূল ব্যাপারটি হচ্ছে, আমি হরিণকে খুবই নিরীহ এবং সুন্দর মনে করি। তাই হরিণ মারতে মনে ব্যথা হয়।

সালিমা ঃ ও ! তাই তো মুসলমান হয়েছেন। মুসলমানরা লুকাতে জানে, মারতে জানে না।

উম্মে সালিমা মুচকি হাসলেন। মাসউদ ! তুমি সালিমার সাথে কথায় জিততে পারবে না। মেয়েটি বড়ই উচ্ছল প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের অধিকারী। প্রচুর উপস্থিত বুদ্ধি রাখে সে।

মাসউদ ঃ এই বয়সে মেয়েরা এমনই হয়ে থাকে।

সালিমা ঃ ইনি তো বয়স্ক। তাঁর অভিজ্ঞতা আছে। এই বলে সে হাসতে লাগলো। তার শ্বেতশুভ্র দাঁতগুলো চমকে বিদ্যুৎ ছড়ালো। ঘটনাক্রমে মাসউদ তার দিকে তাকাচ্ছিলো। তার মনে যেন বিদ্যুৎ খেলে গেলো। সে অস্থির হয়ে উঠলো। উম্মে সালিমা সালিমাকে লক্ষ্য করে বললো ঃ কেমন মেয়ে তুমি ! মেহমানদেরও জ্বালাতন করো। যাও, খানা পাকাতে যাও। দ্রুত খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা করো। সালিমা উঠে চলে গেলো।

উম্মে সালিমা ঃ আমি একটু রাফিদাকে দেখে আসি। এই বলে তিনিও চলে গেলেন। মাসউদ উযু করে তাঁবুর ভিতরেই আসরের নামায পড়লো। নামায শেষে উম্মে সালিমা হাজির হলেন। তিনি বললেন, রাফিদার জ্বর সেরে গেছে। এখন বোধহয় সে কোন মিষ্টি স্বপ্ন দেখছে। দেখলাম সে মুচকি হাসছে।

মাসউদ ঃ এখনও সে ঘুমে?

উম্মে সালিমা ঃ হাঁ।

মাসউদ তাঁবু থেকে বেরিয়ে পড়লো। সে সালিমাকে দৃষ্টির আওতায় রাখতে চাইলো। সে দেখলো, তাঁবুর সন্নিকটেই ছায়ার মধ্যে সালিমা আগুন জ্বালিয়েছে। কোন কিছু রান্না করার জন্য চুলায় চড়িয়েছে। সে ক্ষীণ কদমে তার কাছে যেয়ে পৌঁছুলো। সালিমা টেরও পেলো না। মাসউদ তাকে লক্ষ্য করে বললো ঃ তোমাদের কোন বাঁদী নেই? সালিমা তার প্রতি লক্ষ্য করে জওয়াব দিলো ঃ আমি নিজেই যখন কাজ করতে পারি তবে আর কানিজের কি প্রয়োজন?

মাসউদ ঃ এটা উচিত নয়।

সালিমা তার দিকে চোখ তুলে তাকালো। মাসউদ ভয় পেয়ে গেলো। তার কথায় সে আবার কোন দোষ মনে করলো কিনা। সে বললো ঃ কেন?

মাসউদ কথা বানিয়ে বললো, তুমি তো এ গোত্রপতির কন্যা, তাই।

সালিমা ঃ তবে মোমের তৈরী তো নই যে, আগুনের সামনে গেলে গলে যাবো।

মাসউদ ঃ মোমের না হলেও রৌপ্যের। কথাটি সম্পূর্ণ করার পূর্বেই মাসউদ লজ্জা পেলো। এমন সময় উম্মে সালিমা সেখানে এসে উপস্থিত হলেন। মাসউদ! রাফিদা উঠে বসেছে। তোমাকে ডাকছে।

মাসউদ তাঁবুর ভিতরে চলে গেলো। রাফিদা প্রশস্ত রুমে বসে ছিলো। সম্ভবতঃ সে ঘর্মাক্ত হয়ে গিয়েছিলো। তার গণ্ডদ্বয় আর্দ্র হয়ে উঠেছিলো। গোলাপ ফুলের মতো উজ্জ্বল দেখাচ্ছিলো তার চেহারা। মাসউদ তাকে লক্ষ্য করে বললো ঃ শরীর কেমন লাগছে?

রাফিদা ঃ ভালো।

মাসউদ ঃ তুমি ছলচাতুরী আর বাহানা করেই আমাকে ভয় লাগিয়েছিলে।

রাফিদা ঃ ভাল বাহানা করেছিলাম আমি।

মাসউদ ঃ যেতে দাও। আমি ভুল বুঝেছিলাম।

রাফিদা ঃ সালিমা কোথায়?

মাসউদ ঃ আমাদের জন্য খানা তৈরী করছে।

রাফিদা ঃ আমার জন্য?

মাসউদ ঃ না, আমার জন্য। তুমি খাবে না।

তখন সালিমা এসে উপস্থিত হলো। সে বললো ঃ কেন? ও খাবে না কেন?

মাসউদ ঃ সে বলছে, আমার জন্য তো খানা প্রস্তুত হচ্ছে না।

সালিমা ঃ তার জন্যও খানা প্রস্তুত হচ্ছে।

মাসউদ ঃ ব্যস।

রাফিদা ঃ আমার ক্ষিধে নেই।

এমন সময় কোন একটি উষ্ট্রীর মুখের বিড় বিড় আওয়াজ আসছিলো। সালিমা বললো ঃ মনে হচ্ছে আব্বু আসছেন। সে দ্রুত বাইরে বেরিয়ে পড়লো। মাসউদ বললো, মেয়েটি বিদ্যুতের ন্যায় উজ্জ্বল। রাফিদা মুচকি হেসে বললো, মুবারকবাদ।

মাসউদ ঃ আমাকে বলছো?

রাফিদা ঃ মনকে জিজ্ঞেস করুন। পছন্দ হয়েছে?

মাসউদ ঃ পছন্দ হওয়ার মত অবশ্যই।

এমন সময় পায়ের আওয়াজ কর্ণকুহরে পৌঁছুলো। সাথে সাথে সালিমার আওয়াজ এলো। দুজনেই ভাইবোন।

মাসউদ ঃ তুমি শুনেছো, রাফিদা!

রাফিদা ঃ শুনেছি।

সর্বপ্রথম সালিমা প্রবেশ করলো। তার পিছনে যুহরী। তার পিছনে ছিলো

যুহরীর ছেলে নাইল। যুহরী মধ্যবয়সী শক্তিশালী এক পুরুষ। প্রলম্বিত তার শ্মশ্রু। কিছু কিছু দাড়ি পেকে সাদা হয়ে গিয়েছিলো।

নাইল যুবক। খুবই সুন্দর। নেহায়েত খুবসুরত তার দেহসৌষ্ঠব। চওড়া সিনা। বাহুগুলো মাংসল। সে রাফিদাকে দেখেছে। রাফিদার নজরও তার উপর পতিত হয়েছে। উভয়েই চোখাচোখি হয়ে গেলো। নাইল ভয় পেয়ে গেলো। দ্রুত কাঠের আশ্রয় নিয়ে দাঁড়ালো। রাফিদা যুহরীকে অভিবাদন জানালো। যুহরী তাকে দোয়া দিল। বললো, বেটি! শুনেছি তোমার শরীর অসুস্থ। বর্তমানে কেমন আছ? রাফিদা মিষ্টিসুরে বললো, এখন মোটামুটি সুস্থ। আম্মু এরূপ কোন এক আরক পান করিয়েছিলেন যার ফলে জ্বর পালিয়েছে। যুহরী হেসে উঠলেন। তিনি বললেন ঃ ও তো চিকিৎসাবিদ্যায় অভিজ্ঞ। ও ওষুধপত্রও প্রস্তুত করে রাখে।

রাফিদার কথা নাইলের কাছে মনে হচ্ছিলো যেন বাদ্যের সুর প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। এজন্য সে রাফিদার চেহারার দিকে অনিচ্ছাকৃত তাকাচ্ছিলো। পুনরায় সে পিছনের কথায় ফিরে এলো।

যুহরী একদিকে বসলেন। নাইলও তার কাছেই বসা ছিলো। রাফিদার নজর পুনরায় নাইলের উপর পড়লো। পরীরূপী মায়াবিনী রাফিদাকে সে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছিলো। আনন্দের হিল্লোল বয়ে যাচ্ছে তার মনের গভীরে। যুহরী বললেন ঃ আচ্ছা তুমি একটু বাইরে এসো। মুক্ত হাওয়ায় বসো।

সালিমা ঃ চলো রাফিদা।

রাফিদা! নাইল ক্ষীণস্বরে বললো। যুহরী শুনে ফেললেন। তিনি বললেন ঃ তুমি কি পূর্ব থেকেই তার সাথে পরিচিত?

নাইল ঃ আমি আজকেই কেবল একজন কবির বক্তব্য শুনেছি। তিনি রাফিদার স্তুতি গেয়েছিলেন।

যুহরী ঃ হতে পারে। কবিরাও আশ্চর্যজনক হয়ে থাকে।

ইতিমধ্যে সালিমা রাফিদাকে নিয়ে বাইরে চলে গেলো। বেলা ডুবন্তপ্রায়। সূর্য উঁচু টিলাগুলোর পিছনে নিম্নদিকে অস্ত যাচ্ছিল। সূর্যের অর্ধাংশ বাইরে রয়ে গেছে। সূর্যের সোনালী কিরণ চতুর্দিকে তখনও ঠিকরে পড়ছিলো। বিদায়ী কিরণগুলো যখন রাফিদার চেহারায় পড়ছিলো এবং তার সোনালী আলো চেহারাকে পরিপূর্ণ করে দিয়েছিলো তখন রাফিদাকে মনে হচ্ছিলো স্বর্ণের তৈরী সাক্ষাৎ প্রতিমা। নাইল এবং মাসউদও তখন বাইরে বেরিয়ে এলো। নাইল এই লাল সুন্দরীকে তাকিয়ে দেখলো। সে অত্যন্ত ক্ষীণস্বরে ঠাণ্ডা শ্বাস ছাড়লো। ভিতর থেকে বেরিয়ে এলো, আহ্! মাসউদ সালিমার দিকে তাকিয়েছিলো। তখন এমনই আনমনা হয়ে পড়েছিলো যে, নাইলের আহ্

শব্দও তার কর্ণকুহরে প্রবেশ করেনি।

মাসউদ বললো ঃ সূর্য অস্তমিত যাচ্ছে। নাইল সংযত হলো। সে বললো ঃ হাঁ। দিন শেষ হয়ে যাচ্ছে।

মাসউদ ঃ আমি নামায পড়বো।

নাইল ঃ পড়ুন।

মাসউদ উযু করতে লাগলো। রাফিদাও উযু করলো। নামায পড়লো উভয়েই। নাইল সালিমাকে জিজ্ঞেস করলো, রাফিদা কেমন মেয়ে?

সালিমা ঃ খুব ভালো মেয়ে। এই বলে সে দুষ্টুমির মুচকি হাসি হাসলো।

মাঝখানে আরেক ঘটনা। দুপক্ষের শত্রুতার ঘটনা। অনেক পূর্বে এ শত্রুতা সৃষ্টি হয়েছিলো। এই শত্রুতার কারণ ছিলো এই যে, কোন এক যুগে কুরাইশের লোকজন বনী কেনানার কোন এক ব্যক্তিকে হত্যা করে ফেলেছিলো। বনী কেনানা কুরাইশ থেকে প্রতিশোধ নেয়ার ফিকিরে ছিলো। ঘটনাক্রমে কুরাইশের এক সুদর্শন যুবক যার নাম ছিলো হাফস ইবনুল আখইয়াফ। উট তালাশ করতে করতে 'আযখালান' নামক জায়গায় যেয়ে পৌঁছেছিলো। সেখানের নেতা ছিলো আমের ইব্‌ন ইয়াযীদ। সে জিজ্ঞেস করলো সে যুবকটি কোন্ বংশের? প্রতিউত্তরে সে বললো, কুরাইশ বংশের।

আমের চিৎকার করে বলে উঠল, হে বকর সম্প্রদায়! হে আলে কেনানা! তোমাদের খুনের প্রতিশোধ নাও।

এই চিৎকার শুনে এক ব্যক্তি দৌড়ে এসে সে যুবকটিকে হত্যা করলো।

কুরাইশ এই ঘটনা জানতে পেরে ক্রোধান্বিত হয়ে উঠলো। তারাও এই খুনের বদলা নিতে উদ্যত হলো। কিন্তু কিছু লোক মধ্যস্থতায় পড়ে গেলো। তারা বললো ঃ বনী কেনানার খুন কুরাইশের দায়িত্বে ছিলো। তারা কুরাইশের যুবকটিকে হত্যা করে স্বীয় প্রতিশোধ নিয়ে নিয়েছিলো। এবার কারও খুন কারো উপর অবশিষ্ট নেই। লড়াই করে কোন লাভ নেই। সবাই এ কথা মানতে বাধ্য হলো।

তবে এই যুবক হাফসের ভ্রাতা কুরয এটুকুতে প্রশান্ত হলো না। বরং প্রতিশোধ নেয়ার ফিকিরেই রইলো। একদিন সে 'মাররুয জাহরান' নামক স্থানের দিকে যাচ্ছিলো। তখন সে আমের ইব্‌ন ইয়াযীদকে দেখতে গেলো। দেখেই তাকে হত্যার ফন্দি আঁটতে লাগলো। আমের যখন তার উটনী বসালো তখনই কুরয অকস্মাৎ দ্রুত যেয়ে তার উপর তলোয়ারের আঘাত হানলো। হত্যা করলো তাকে এবং তার তলোয়ারটি নিয়ে নিলো। রাত্রে সে এই তলোয়ারটি কাবাগৃহের দরজায় ঝুলিয়ে দিলো। সকাল হওয়ার পর কুরাইশ আমেরের এই তরবারী চিনতে পারলো। তারা অনুধাবন করলো, নিশ্চয় কুরয

আমেরকে হত্যা করেছে। কারণ, তারা ইতোপূর্বেই শুনেছিলো, কুরয তার ভাইয়ের হত্যার প্রতিশোধ নেয়ার প্রতিজ্ঞা করেছে।

বনী কেনানা এ সংবাদ পেয়ে গেলো। তারাও খুব উত্তেজিত হয়ে পড়লো। তারা ফিকির করতে লাগলো যে, তাদের নেতা আমেরের বদলায় কুরাইশের দুই/তিনজন নেতাকে কতল করবে। কুরাইশ ভীত–সন্ত্রস্ত হয়ে পড়লো যে, তারা যখন মদীনায় চলে যাবে এবং পিছনে রেখে যাবে অবলা নারী, শিশু এবং দুর্বলদেরকে, সে সুযোগে বনী কেনানা তাদের উপর আক্রমণ করে বসে কিনা? পুরানো প্রতিশোধ নিয়ে নেয় কিনা? বিষয়টি ব্যাপক আকারে আলোচিত হতে লাগলো।

অনেকেই বললো, মদীনায় যাওয়ার ব্যাপারটি প্রত্যাখ্যান করো। কিন্তু শায়বা, উতবা বিষয়টি মেনে নিলো না। তারা পূর্ববৎ প্রস্তুতিতেই রত রইলো। শেষ পর্যন্ত মদীনার দিকে বেরুবার কথাই ঘোষিত হলো এবং জনসাধারণ মক্কা থেকে বেরিয়ে 'বাতনে ইয়াজিজে' সমবেত হতে লাগলো। 'বাতনে ইয়াজিজ' ছিলো মক্কা থেকে এক/দুই মাইল দূরে।

তবে বিস্ময়কর ব্যাপার হলো, জনগণের উত্তেজনা কিছুটা স্তিমিত হয়ে পড়েছিলো। তারা মদীনায় যাওয়া থেকে পলায়নপর হয়ে উঠছিলো। এ ব্যাপারে বিভিন্ন রকমের ছুতা ও ফন্দি–ফিকির করছিলো।

আল্লামা ওয়াকিদীর ভাষ্যমতে, হারিস ইব্‌ন আমের যখন চলতে লাগলো, তখন সে বলেছিলো, আমার জানা নেই কি যে হলো আমার, এই অভিযান এবং সফর আমার কাছে খুবই খারাপ লাগছে। ভালো মনে হচ্ছিল তো এটাই যে, এ জাতি মদীনার দিকেই বের হবে না। কাফেলা ছিনতাই হয়ে যেতো, ধনসম্পদ লুটপাট হয়ে যেতো, মাল–সম্পদ সব বরবাদ হয়ে যেতো, তাতে তেমন কোন অসুবিধা ছিলো না।

কোন এক ব্যক্তি তার এই কথা শুনেই চলেছিলো। এতদশ্রবণে তাকে বলেছিলো, আপনি কুরাইশের একজন নেতা, কওমের সর্দার, আর আপনিই কিনা জাতিকে মদীনা যাবার ব্যাপারে বাধা দিচ্ছেন।

হারেস ঃ আমার কাছে মনে হচ্ছে যেন, আমি আমার বধ্যভূমির দিকে তাড়িত হচ্ছি। ইব্‌ন হানযালিয়া (আবু জেহেল) অলক্ষুণে। তারই কুলক্ষণ গোটা জাতির মধ্যে প্রসিদ্ধ। আমি জানি সে বর্তমানে একটি সুধারণার উপর নিজের কাফেলাকে বাঁচানোর ফিকিরে মদীনার দিকে রওয়ানা হচ্ছে। তারা মদীনাবাসীদের বিরুদ্ধে মোকাবেলা করবে। কিন্তু বস্তুতঃ এই অভিযান জাতিকে ধ্বংসের দিকে তাড়িয়ে নিচ্ছে। তা সত্ত্বেও আমি তার সংগ পরিহার করছি না। আমি তার সাথেই যাবো।

শুধু হারিসেরই এই ধারণা ছিলো না বরং উমাইয়া ইব্‌ন খালফ, হাকীম ইব্‌ন হিযাম, আবুল বাখতরী ইব্‌ন আস, ইব্‌ন উমাইয়া, আস ইব্‌ন মুনাব্বিহ এবং রবিআর দুই পুত্র শায়বা এবং উতবাও বাহানা করছিলো এবং নিজেদের অলসতা, নিস্পৃহতা প্রকাশ করছিলো। তবে আবু জেহেল, উকবা ইবন আবি মুয়াইত এবং আখতার ইবন হারিস জনগণকে উদ্বুদ্ধ করে বেড়াচ্ছিলো। লোকজন অলসতা প্রদর্শন করছিলো এবং মনমানসিকতা ঝিমিয়ে পড়েছিলো। তারা তাদের কাছে যেয়ে যেয়ে আত্মমর্যাদাবোধের কথা বলে উস্‌কে দিচ্ছিলো। তারা প্রচার করছিলো, কাপুরুষতা এবং অলসতা মেয়েদের কাজ। তারা ইচ্ছা–অনিচ্ছা সত্ত্বেও যাদের প্রয়োজন তাদেরকে সওয়ারী ও অস্ত্র–শস্ত্র দিচ্ছিলো। হারিস, উতবা এবং শায়বা কিন্তু কাউকেও কিছু দিচ্ছিলো না। কেউ তাদের কাছে কিছু চাইলেও তারা তাদেরকে বলছিলো, তোমাদের সামর্থ্য না থাকলে যেতে চাচ্ছো কেন? তোমরা এখানেই থেকে যাও। সামনে অগ্রসর হয়ো না।

আবু জেহেল যখন বিষয়টি সম্পর্কে অবহিত হলো তখন সে তাদের নিকট যেয়ে বললো, তোমরা এরূপ কথা কেন বলছো? জনগণের মধ্যে কুধারণা সৃষ্টি হবে। এসব সাধারণ লোক নির্বোধ এবং বেওকুফ হয়ে থাকে। এদের একটু উসকে দিলেই তারা উত্তেজিত হয়ে উঠে। আর সামান্যতম কুধারণা সৃষ্টি হলেও বসে পড়ে। বর্তমানে তাদের অন্তরে ধর্মীয় উত্তেজনা সৃষ্টি করে দেয়া হয়েছে। এটাকে তোমরা স্তিমিত করো না। এরা সবাই যদি থেকে যায়, তাহলে আমরা কিছুই করতে পারবো না।

অতএব তারা খামোশ হয়ে গেলো। এরা যখন 'বতনে ইয়াজিজে' যাচ্ছিলো তখন অধিকাংশকেই বুঝিয়ে শুনিয়ে এবং আত্মমর্যাদাবোধের কথা স্মরণ করিয়ে পাঠাচ্ছিলো। লোকজন উমাইয়ার কাছে এলে, সে নিজেই যেতে অস্বীকার করলো।

আবু জেহেল এবং উতবা তাদের কাছে এলো। উতবার কাছে অগুরু জ্বালানীর আধার ছিলো। ধুনদিতে পুড়ছিলো গন্ধধুপ। আবু জেহেলের কাছে সুরমাদানী এবং শলাকা ছিলো। উতবা খোশবু জ্বালানীর আধার উমাইয়ার সামনে রেখে দিয়ে বললো, তুমি মেয়ে হয়ে গেছো। নাও সুগন্ধী শুঁকতে থাক। আবু জেহেল সুরমাদানী এগিয়ে দিয়ে বললো, নাও, সুরমা লাগাও। আজ থেকে তুমি রমণী।

উমাইয়ার আত্মমর্যাদাবোধ জাগ্রত হলো। সে বললো, আমি নারী নই। রণক্ষেত্রে তুমি আমাকে তোমাদের পিছনে দেখবে না, তবে আমার কাছে ভাল কোন উট নেই।

আবু জেহেল ঃ উট আমি প্রস্তুত করে দিবো। অতএব বনী তশরের একটি উট তিনশত দেরহামের বিনিময়ে ক্রয় করে সে উমাইয়াকে দিলো।

এবার এলো নতুন আরেক উপাখ্যান। বনী কেনানা এবং কুরাইশের মধ্যে কিছু দিন পূর্বে একটি ঘটনা ঘটেছিলো।

২৭
কুধারণা

মক্কার কুরাইশ খুব জোরেশোরে প্রস্তুতিতে লিপ্ত। তারা খুব দ্রুত মদীনার দিকে রওয়ানা করতে চাচ্ছিলো। তাদের স্বীয় কাফেলার ফিকির ছিলো কম। মুসলমানদের মূলোৎপাটনই ছিলো তাদের মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। একদিন রবী'আর দুই পুত্র উতবা এবং শায়বা স্বীয় লৌহবর্মগুলো বের করলো এবং এগুলো ঠিক করতে লাগলো। ইতোমধ্যেই তাদের গোলাম আদদাস এসে হাজির হলো। সে বললো, শ্রদ্ধেয় মনিব! আপনারা কি করছেন?

শায়বা ঃ আমরা যুদ্ধাস্ত্র পরীক্ষা-নিরীক্ষা করছি।

আদ্দাস ঃ কার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে যাচ্ছেন?

শায়বা ঃ তোমার কি সেই লোকটির কথা স্মরণ আছে? যে লোকটি তায়েফে এসেছিলো, সে দাবী করেছিলো ঃ আমি নবী। লোকজন তাকে মেরেছিলো। সে আমাদের বাগানে আশ্রয় নিয়েছিলো। আমরা তোমার মাধ্যমে তার কাছে আঙ্গুর পাঠিয়েছিলাম?

আদ্দাস ঃ স্মরণ হয়েছে।

শায়বা ঃ সে মদীনা চলে গিয়েছে। আমরা তার বিরুদ্ধে আক্রমণের প্রস্তুতি নিচ্ছি।

আদ্দাস ঃ আমার উপদেশ গ্রহণ করুন। আপনারা তার বিরুদ্ধে লড়তে যাবেন না। আপনারা সফল হবেন না। নিঃসন্দেহে তিনি আল্লাহর রসূল। তাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা মানে স্বয়ং আল্লাহর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা।

শায়বা ঃ চুপ থাকো আদ্দাস, এরূপ কথা বলো না। অন্যথায় কুরাইশ নাখোশ হয়ে যাবে।

আদ্দাস কাঁদতে আরম্ভ করলো। সে বললো, আমি আপনাদের দুজনের চিন্তা করছি। আপনারা কুরাইশের ভয় করবেন না।

বনী কেনানার একজন শীর্ষস্থানীয় নেতা ছিলো সুরাকা আল-মুদাললাজী। সে-ও বিষয়টি শুনেছিলো। মুসলমানদের বিরুদ্ধে তার শত্রুতাও ছিলো প্রচণ্ড। সে কুরাইশ নেতৃবৃন্দের কাছে এসে বললো, তোমরা আমাদের ভয় করবে না।

আমি তোমাদের সাহায্য করবো। আমি যিম্মাদারী গ্রহণ করলাম, তোমাদের অনুপস্থিতিতে বনী কেনানা তোমাদের জাতির উপর আক্রমণ করবে না। একথা শুনে কুরাইশ খুবই আনন্দিত হলো। যারা বনী কেনানার আক্রমণের বাহানা করছিলো আবু জেহেল তাদেরকে লক্ষ্য করে বললো, এবার তোমাদের সামনে আর কোন্ ছলছুতা প্রতিবন্ধক হয়ে রইলো? বনী কেনানার সবচেয়ে শীর্ষস্থানীয় নেতা সুরাকা তোমাদের হেফাজতের যিম্মাদারী নিয়ে নিয়েছেন। এবার জনগণের আর কোন বাহানা রইলো না। তারা বললো, আমরা প্রস্তুত। তবে অন্য আরেকটি বিষয়ের সম্মুখীন হয়েছি। যারফলে উমাইয়া ইবন খালফের পা–ও টলমল করতে লাগলো।

সা'দ ইবন মুয়াজ মদীনা থেকে মক্কায় এসেছিলেন। তিনি মেহমান হয়েছিলেন উমাইয়া ইবন খালফের বাড়ীতে। আবু জেহেল যখন উমাইয়ার কাছে আসলো এবং সাদকে তার কাছে দেখলো, তখন বললো ঃ উমাইয়া! তোমার ব্যাপারে আমার আফসোস! তুমি এমন এক ব্যক্তিকে তোমার মেহমান বানিয়েছ যে, মুহাম্মাদ এবং আমাদের শত্রুদের নিজেদের কাছে আশ্রয় দিয়েছে এবং আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে উন্মত্ত।

সা'দ (রাযিঃ) বললেন ঃ এ পর্যন্ত মুসলমানরা তোমাদের সাথে কোন দুর্ব্যবহার করেনি। তোমরা অব্যাহতভাবেই তাদের সাথে দুর্ব্যবহার করেছো। এবার মুসলমানরা বাস্তবেই তোমাদের কাছ থেকে প্রতিশোধ নেয়ার জন্য প্রস্তুত। যদি তোমরা আমাদের সাথে দুর্ব্যবহার করো তাহলে আমরা তোমাদের কাফেলার রাস্তা অবরুদ্ধ করে দেবো। তোমরা জান, তোমাদের পথ আমাদেরই নিকটে।

উমাইয়া ঃ সা'দ এরূপ কথা বলো না। আবু জেহেল আমাদের জাতীয় শীর্ষস্থানীয় নেতা। তার কথা আমাদের মানতে হয়।

সা'দ ঃ উমাইয়া! আমি তা জানি। তুমি তার কথা মান। মুহাম্মাদ (সাঃ) আমাকে বলেছেন ঃ আবু জেহেল উমাইয়াকে এখানে হাজির করবে এবং আমি তাকে অবশ্যই হত্যা করবো।

উমাইয়া ঃ বাস্তবেই সে এ কথা বলেছে?

সা'দ ঃ আমি শপথ করে বলছি, তিনি এ কথা বলেছেন।

এতদশ্রবণে উমাইয়ার মন ভীত–সন্ত্রস্ত হয়ে পড়লো। ভয় প্রবল হয়ে উঠলো। এমতাবস্থায় আবু জেহেল তাকে সান্ত্বনা দিয়ে কিছুটা শান্ত করলো—ভয় কিছুটা দূর করলো।

২৮
ভবিষ্যদ্বাণী

অতঃপর কুরাইশের শীর্ষস্থানীয় প্রায় সব নেতাই বতনে ইয়াজিজে যেয়ে পৌঁছলো। আব্বাস ইবন আবদুল মুত্তালিব কওমের তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে বাধ্য হয়ে গেলেন। তবে আবু লাহাব গেলো না। মূলতঃ আতিকার স্বপ্নে সে এতটাই ভীত –সন্ত্রস্ত হয়ে উঠেছিলো যে, যতই তাকে বুঝানো হলো, শুধানো হলো এবং জাহেলী আত্মমর্যাদাবোধ উসকে দেওয়া হলো কিছুতেই সে প্রস্তুত হলো না। সর্বশেষ বাহানা সে এই করেছিলো যে, জাতির হেফাজতের উদ্দেশ্যে একজন নেতার এখানেও থাকা উচিত। আবু জেহেল যখন বাতনে ইয়াজিজে পৌঁছে সেনাবাহিনীর খবর নিলো তখন দেখতে পেলো এক সহস্র সশস্ত্র লৌহবর্ম পরিহিত সৈন্য, সাত শত উট এবং তিনশত ঘোড়া। প্রতিটি আরোহী সর্বপ্রকার অস্ত্র–শস্ত্রে সজ্জিত। সেখানে কুরাইশের শীর্ষস্থানীয় ও সম্মানিত সদস্যদের একটি কমিটি গঠিত হলো। সে কমিটি এ বিশাল বাহিনীর সর্বাধিনায়ক নিযুক্ত করলো আবু জেহেলকে।

বাহ্যতঃ এক হাজার লোকের একটি বাহিনী তেমন বিরাট কিছু নয়। কিন্তু তৎকালীন আরবে এটাকে এক বিশাল বাহিনী মনে করা হতো। সেই সেনাবাহিনীর মধ্যে জ্বালামীয় ভাষণ দেয়ার জন্য ডাকসাইটে কবি ছিলো এবং লোকদের চিত্তবিনোদনের ছিলো সুন্দরী রূপসী, ষোড়শী, নায়িকা, গায়িকা। শরাবের বড় বড় পানপাত্র ছিলো। গায়িকাদের মধ্যে যারা ছিলো সুপ্রসিদ্ধ তাদের আনা হয়েছিলো। তন্মধ্যে ছিলো—আমর ইবন হিশামের বাঁদী সারা, আসওয়াদ ইবন আবদুল মুত্তালিবের বাঁদী গুররা এবং উমাইয়া ইবন খালফের বাঁদী কুতাইরা। এরা সবাই ছিলো সুন্দরী রূপসী, সুমিষ্ট কণ্ঠের অধিকারী। মনা মাতানো নাচ–গানে পারদর্শী। তারা নেচে গেয়ে গোটা সমাবেশকে মাতাল করে রাখতে পারতো।

আবু জেহেল প্রতিশত সৈন্যের জন্য একজন করে অধিনায়ক নির্ধারণ করেছিলো। প্রতিটি অধিনায়কের এক–একটি ঝাণ্ডা প্রদান করা হয়েছিলো। সবচেয়ে বড় পতাকাটি ছিলো স্বয়ং আবু জেহেলের কাছে। যখন এই সৈন্য বাহিনী রওয়ানা হলো, বাগাড়ম্বড়ে, জাঁকজমকে তারা সম্মুখে অগ্রসর হলো। লৌহবর্ম এবং হাতিয়ার—অস্ত্র–শস্ত্রগুলোর উপরে সূর্যের রশ্মি পড়ছিলো আর সেগুলো ঝলমল ঝলমল করছিলো। এই বাহিনী 'সানিয়াতুল বাইযা' নামক টিলার সামনে দিয়ে অতিক্রম করছিলো। সেখানে পূর্ব থেকেই টিলার উপরে বসা ছিলো আদ্দাস নামক সেই গোলামটি। সে ছিলো শায়বা এবং

উতবার পরিবারের লোকজনের মতই। সে শায়বা এবং উতবা দুইভাইকে প্রথমেই এই অভিযানে বের হতে নিষেধ করেছিলো। যখন সেনাবাহিনী তার সামনে দিয়ে অতিক্রম করছিলো, তখন শায়বার সওয়ারী তার সামনে আসলো। আদ্দাস দৌড়ে টিলার উপর থেকে নিচে অবতরণ করলো এবং উতবা,শায়বার কাছে এসে তাদের রেকাব (অশ্বের জিনের সঙ্গে সংলগ্ন পদদ্বয় রাখার জন্য লোহার আংটিবিশেষ)গুলোতে চুম্বন করলো। সে বললো, আমি আপনাদের নুন–নিমক খেয়েছি এবং প্রতিপালিত হয়েছি আপনাদের গৃহেই। আপনাদেরকে আমি পূর্বেও বলেছি, বুঝিয়েছি আপনারা যেন এই অভিযানে অংশগ্রহণ না করেন। আপনারা আমার কথার প্রতি কেন কর্ণপাত করছেন না?

উতবা ঃ আদ্দাস! অন্তরে এই ধারণা বদ্ধমূল হয়েছে যে, মুহাম্মাদ নবী। এজন্যই তুই আমাদের বারণ করছিস।

আদ্দাস উত্তেজিত কণ্ঠে বললো ঃ আল্লাহর শপথ! তিনি আল্লাহর নবী, কোন সন্দেহ নেই তিনি রাসূলুল্লাহ। তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে সাফল্য লাভ করতে পারবেন না। আমি ভবিষদ্বাণী করছি না, তবে যে কথাটি আমার মনের গহীনে বদ্ধমূল হয়েছে তা ব্যক্ত না করে পারছি না। তার বিরুদ্ধে যারা লড়াই করতে যাবে, তারা ধ্বংস হয়ে যাবে। রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে আজ পর্যন্ত কোন জাতি আল্লাহর গজব থেকে রক্ষা পায়নি। এখনও সময় আছে ফিরে আসুন, সামনে অগ্রসর হবেন না।

উতবা ঃ তুই নিশ্চিন্ত থাক, মুহাম্মাদ রসূল নয়। আস্ত একটা যাদুকর। তুই সাদাসিধে মানুষ, তাকে রসূল বিশ্বাস করে বসে আছিস। তুই দেখ, আমাদের আক্রমণ মুহাম্মাদ এবং তার সাঙ্গপাঙ্গদের সমূলে ধ্বংস করে ছাড়বে। আদ্দাসের আঁখিযুগল অশ্রুসজল হয়ে উঠলো। সে বললো, দুর্ভাগ্য কোন কথা নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করতে দেয় না। আপনারা অপারগ। প্রকৃতি আপনাদের কাছ থেকে রাসূলের সাথে বেয়াদবী এবং তাকে কষ্টদান এবং মুসলমানদের নির্যাতনের প্রতিশোধ অবশ্যই নেবে। এজন্য আপনারা স্বীয় বধ্যভূমির দিকেই তাড়িত হচ্ছেন। আপনারা আপনাদের এই বিশাল বাহিনীর উপর অহং বোধ করছেন। কোন সন্দেহ নেই, সাধারণ লোকদের মোকাবিলায় এ বাহিনী বিশাল ও শক্তিশালী। তবে মনে রাখবেন, আল্লাহর রাসূলের সামনে এদের কানাকড়িও মূল্য নেই। এই বিশাল বাহিনী আপনাদের রক্ষা করতে পারবে না। মুহাম্মাদ (সাঃ) এবং তার সাথীদের হাত থেকে আপনাদের বাঁচাবার কোন শক্তি নেই। হঠকারিতায় লিপ্ত হবেন না। জেদ ধরবেন না। ফিরে চলে আসুন।

উতবা খিলখিল করে হেসে উঠলো। সে বললো, আদ্দাস! তোর নিমকহালালীতে কোন সন্দেহ নেই। তবে তুই ভীতু, কাপুরুষ। তোর মনে যে কথাটি বদ্ধমূল হয়েছে সেটি অন্তর থেকে বের করতে পারিস না। তুই দেখবি সফলতা আমাদের পদচুম্বন করবে। বিজয়ীর বেশে আমরা ফিরে আসবো।

আদ্দাস ঃ হায়! আমি যদি না দেখতাম সে দৃশ্য। আফসোস! আমি আমার দায়িত্ব পালন করেছি। তবে আপনাদের মৃত্যু আপনাদের পিছু হটতে দিচ্ছে না। এই বলে আদ্দাস স্বীয় আঁচল দিয়ে চোখের অশ্রু মুছলো। উতবা এবং শায়বা সম্মুখপানে অগ্রসর হলো। হাকীম ইবন হিযামও এই আলোচনা শুনছিলো। তার মনেও সন্দেহের উদ্রেক হলো, কিন্তু সেও ফিরে আসার হিম্মত পেলো না।

মূলতঃ ব্যাপারটি ছিলো এই যে, কুরাইশের নেতৃস্থানীয় লোকগুলো এ লড়াইকে ধর্মযুদ্ধ আখ্যা দিয়ে আওড়িয়েছিলো। ফলে যে কেউ এ যুদ্ধ থেকে পিছু হঠতো কিংবা পিছনে থেকে যেত সেই কাপুরুষ অথবা সংশয়ী-দোদুল্যমান আখ্যা পেতো। তার ইয্যত-সম্মান ভূলুণ্ঠিত হয়ে যেতো। প্রভাব-প্রতিপত্তি শেষ হয়ে যেতো। জনগণের দৃষ্টিতে সে প্রতীয়মান হতো হেয় এবং নীচু হিসাবে। এজন্য তারা পিছনে হঠে থাকতে পারেনি। বিশাল বাহিনী 'মাররুয জাহরান' নামক স্থানে অবস্থান করলো। সেখানে তাঁবু প্রস্তুত করা হলো। শুরু হলো ত্রিপ্রহর। আরম্ভ হলো নৃত্য-গীতের পালা। একটি সুবিশাল শিবিরের ব্যবস্থা করা হলো। নীচে ফরশ বিছানো হলো। কয়েকটি মসনদ তৈরী করা হলো। মসনদগুলোতে এসে সমাসীন হলো শীর্ষস্থানীয় নেতৃবৃন্দ। জনগণ ফরশের উপরেই বসলো। মাঝখানে একটি চাঁদোয়া বিছানো হলো। তার উপর বিশিষ্ট গায়িকা সারা, গুররা, কুতাইরা এবং অন্যান্য নায়িকা-গায়িকা এসে উপবেশন করলো। তাদের পরিধানে ছিলো নৃত্য-গীতের বিশেষ পোশাক। সালোয়ার, কামিজ এবং হাঁটু পর্যন্ত প্রলম্বিত আরবী আলখাল্লা। রং-বেরংয়ের দোপাট্টা ও উড়না তাদের মাথায় শোভা পাচ্ছিলো। একটি করে কালো রুমালও তাদের মাথায় বেঁধে রাখা হয়েছিলো। সোনালী কারুকার্য খচিত এই পোশাক গায়িকা-নায়িকাদের সৌন্দর্য আরও বিকশিত করে তুলছিলো। তাদের হাতে ছিলো বাদ্যযন্ত্র। তারা অর্ধপ্রলম্বিত হয়ে একদিকে বসে ছিলো। তাদের বসার এই ঢং-ও জনগণের দৃষ্টিতে খুবই আকর্ষণীয় ও প্রিয় মনে হচ্ছিলো। সবার দৃষ্টি পতিত হচ্ছিলো তাদের উপর। আবু জেহেল, উমাইয়া, আবুল বাখতারী, উতবা, শায়বা, হারিস প্রমুখ নেতৃবৃন্দ তাদের প্রতি অপলক নেত্রে তাকিয়ে আছে। জামআ, নাওফাল ইবন খুয়াইলিদ এবং অন্যান্য নেতৃবৃন্দ শরাব ভর্তি সুরাপাত্রগুলো হাতে নিয়ে ঢক ঢক করে

মাদকদ্রব্য গিলছিলো। লোকজন অধীরচিত্তে নাচ–গান দেখার জন্য অপেক্ষমান। অবশেষে আবু জেহেলের ইঙ্গিতে বাধ্যযন্ত্র হাতে নিলো সারা। আর বাদ্যযন্ত্রের মধ্যে ছিলো দোতারা। সে বাদ্যযন্ত্র বাজাতে আরম্ভ করলো। বাদ্যের তারগুলো বাজতে আরম্ভ করলো। সারা বাদ্যের তালে তালে ধীরে ধীরে গান আরম্ভ করলো। সবগুলো মেয়েই বাদ্যযন্ত্রে হাত লাগালো। বাদ্যের তারগুলো থেকে মৃদু সুর পরিবেশকে আনন্দঘন করে তুললো। বাদ্যের ঝুমুর ঝুমুর আওয়াজ সুমিষ্ট সুর গুঞ্জরিত হয়ে উঠলো। সারা যতই গাইতে গাইতে দাড়াতে লাগলো, ক্রমশঃ তার স্বর তেজস্বী হতে লাগলো। অতঃপর সে দাঁড়িয়ে গেলো। এদিক ওদিক হেলেদুলে নেচে–গেয়ে লোকদের মাতাল করতে লাগলো। এমনিভাবে খুব দ্রুত সে হেলেদুলে চক্কর দিতে লাগলো। সে যত দ্রুত ঘুরছিলো, বাদ্যের সুর ততই তীব্র আকার ধারণ করলো। সে নৃত্য করছিলো আর বাদ্যযন্ত্রের সুর বাজছিলো সুতীব্র আকারে। সাথের যুবতীরাও তেজগতিতে বাদ্যযন্ত্র বাজাচ্ছিল। সবগুলো বাদ্যযন্ত্র একই সাথে এরূপভাবে বাজছিলো যেন একটিই বাদ্যযন্ত্র। অল্পকিছুক্ষণ পর সারার নাচের পালা শেষ হলো। নাচ–গান এবং হেলাদুলায় বিশেষ পরিশ্রমের কারণে সারার চেহারা রক্তিম আকার ধারণ করলো। গোটা সমাবেশে বাহবা এবং মারহাবার আওয়াজ প্রতিধ্বনিত হলো। নেতৃবৃন্দ তাকে সাবাশ দিচ্ছিলো আর জোরে শোরে জমে উঠেছিলো শরাবের আসর। এবার আবার সারা গাইতে আরম্ভ করলো। নিজেও বাদ্যযন্ত্র বাজাতে আরম্ভ করলো। অন্যান্য ষোড়শী যুবতীরাও তার সাথে তাল মিলিয়ে বাদ্যযন্ত্রে আওয়াজ তুললো।

সারার আওয়াজ খুবই সুমিষ্ট সুরেলা। তার প্রতিটি কাব্যাংশেই লোকজন উচ্ছসিত হয়ে উঠলো। নেতৃবৃন্দ হয়ে উঠলো মাতোয়ারা। আনন্দ–উৎফুল্লে শরাবের পাত্রে বার বার চুমুক দিচ্ছিলো তারা। কেউ কেউ সারাকে টাকা–পয়সা, স্বর্ণমুদ্রা, রৌপ্যমুদ্রা উপঢৌকন দিচ্ছিলো। এভাবে কিছুক্ষণ চলার পর সারার গানবাদ্যের ইতি হলো।

তারপর আসলো গুররা। প্রথমে কুতাইরা নাচলো এবং গাইলো। তারপর গাইলো গুররা। আবু জেহেল সেদিন সেনাবাহিনীর কিছুসংখ্যক লোককে দাওয়াত দিয়েছিলো। কয়েকটি উষ্ট্রী জবাই করলো। তন্মধ্যে জবাইকালে একটি উট অর্ধ জবাই অবস্থায় উঠে দৌড় দিলো। লোকজন অন্যান্য উটের চামড়া ছিলছিলো এবং এ উটটিকে দাঁড়াতে দেখে হেসে উঠলো। তারা মনে করেছিলো এটি খুব সহসাই মাটিতে লুটিয়ে পড়বে। কিন্তু না তা হলো না। এই উটটি দৌড়তে দৌড়তে কর্তিত গর্দান নিয়ে উন্মাদ অবস্থায় পালাতে লাগলো। যেদিক দিয়ে সে উটটি যাচ্ছিল, রক্তের ধারা সেদিক

ভাসিয়ে গেলো। গোটা সেনাবাহিনীর অবস্থানস্থলে উটটি এমনভাবে চক্কর লাগালো যে, প্রায় প্রতিটি তাঁবুর পাশ দিয়ে সেটি অতিক্রম করলো। যেই তাঁবুর পাশ দিয়ে সেটি যাচ্ছিল রক্তের ধারা সেদিকেই বিস্তৃতি লাভ করে চলছিলো। হাকীম ইবন হেজাম বলেন ঃ আমি উটটিকে দৌড়তে দেখেছি। লক্ষ্য করলাম যে, প্রতিটি তাঁবুর পাশেই সে উটের রক্ত ঝরেছে। বিষয়টিকে আমি মারাত্মক অশুভ লক্ষণ মনে করলাম। তখনই আমি ইবন হানযালিয়া (আবু জেহেল)–এর কাছে গেলাম। এই বিষয়টির আলোচনা করে তাকে বললাম ঃ বিষয়টি বড়ই অশুভ মনে হচ্ছে। আপনি আর অগ্রসর হবেন না। এখানেই বসেই কাফেলার অপেক্ষা করুন।

আবু জেহেল মুখ বিকৃত করে বললো ঃ এটা সম্ভব নয়। আমরা মুসলমানদের রক্ত বহাতে বেরিয়েছি। তাদের খুন এভাবে বহাবো যেভাবে উটের খুন বহানো হয়েছে। এটা কোন অশুভ লক্ষণ নয়, বরং শুভ লক্ষণ।

হাকীম বলেন ঃ জাতির উপর আল্লাহর গযব আসন্ন ছিলো তাই আবু জেহেল কোন কথার প্রতি কর্ণপাত করেনি। নিরুপায় আমি নিশ্চুপ হয়ে গেলাম।

২৯
পরামর্শ

যে ষাটজন সাহাবীকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুরাইশের এ বাণিজ্যিক কাফেলার উপর আক্রমণ করার জন্য প্রেরণ করেছিলেন, তারা খুব দ্রুত সফর করে 'রাবিগ' নামক স্থানে গিয়ে পৌঁছলেন। সেখানে যেয়ে তারা জানতে পারলেন, আবু সুফিয়ান মুসলমানদের আগমণের সংবাদ পেয়ে গেছে। তাই অত্যন্ত দ্রুত সে এই স্থান অতিক্রম করে গেছে। মুসলমানদের ভয়ে নদীর কিনার হয়ে বদরের দিকে চলে গেছে। এই কাফেলা এভাবেই নিরাপদে চলে যেতে পারলো—এই ভেবে সাহাবায়ে কেরাম খুবই মনক্ষুন্ন হলেন। তাদের আফসোস হলো। কারণ, তাদের আশা পূর্ণ হলো না। যেহেতু আবু সুফিয়ানদের পশ্চাতধাওয়া করে আর হাতের নাগালে পাওয়ার আশা ছিলো না এইজন্য সাহাবায়ে কেরাম ফিরে চলে আসার মনস্থ করলেন। বাস্তব সত্যও তাই যে, এই অভিযানে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরামকে একেবারে এই উদ্দেশ্যেই প্রেরণ করেননি যে, বাণিজ্যিক কাফেলার মালামাল ছিনতাই করবে, তাদের উপর আক্রমন করবে। তাঁর লক্ষ্য উদ্দেশ্য ছিলো, মক্কার পৌত্তলিকদের সতর্ক করা। যেন

তারা বুঝে আগামীতে কখনও সাহাবীদের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করলে তার পরিণতি ভালো হবে না। বরং তাদের বাণিজ্যিক কাফেলাকে শাম অভিমুখে ব্যবসা–বাণিজ্য করতে যেতে দেয়া হবে না। যেহেতু মক্কাবাসীরা জীবিকা নির্বাহই করে ব্যবসা–বাণিজ্যের উপর, সেহেতু এটা তাদের জন্য বিরাট ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়াবে। ফলশ্রুতিতে গোটা কওম ধ্বংস হয়ে যাবে। সাহাবায়ে কেরাম পরস্পরে পরামর্শ করলেন। চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হলো, ফিরে যাওয়া। ফলে তারা প্রত্যাবর্তন করলেন। খুব দ্রুত মনযিলগুলো অতিক্রম করে মদীনা মুনাওয়ারায় তাঁরা প্রবেশ করলেন।

মুসলমানদের নিয়ম ছিলো, অভিযানে বেরুবার সময় প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে যেতেন। আবার যখন ফিরে আসতেন তখন সর্বপ্রথম প্রিয়নবীর দরবারে এসে সে অভিযানের বিস্তারিত খবরাখবর শুনিয়ে স্বীয় বাসগৃহে প্রত্যাবর্তন করতেন। এজন্য সবাই সর্বপ্রথম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হলেন। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন মসজিদে নববীতে অবস্থান করছিলেন। সাহাবায়ে কেরাম নবীজীকে সালাম করলেন। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের সালামের জওয়াব দিলেন। সাহাবায়ে কেরাম এসে বসলেন নবীজীর সামনে। নবীজী জিজ্ঞেস করলেন, তাদের কুশল এবং সংবাদাদি।

উবাইদুল্লাহ ইবনুল হারিস ছিলেন এই দলের অধিনায়ক, তিনি আরয করলেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা পৌছার পূর্বেই আবু সুফিয়ান তার দলবল নিয়ে বদরের দিকে চলে গেছে।

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঃ আল্লাহ তা'আলার কাছে এটাই মঞ্জুর ছিলো। আমাদের লক্ষ্য–উদ্দেশ্য এটুকুই ছিলো। যাতে মক্কার কুরাইশরা এ কথা অনুধাবন করে যে, আমাদের প্রতি হস্তক্ষেপের পরিণতি ভালো হবে না। আমরা তাদের বাণিজ্যিক কাফেলার যাতায়াত বন্ধ করে দেবো।

আবু সুফিয়ান তো মুসলমানদের হাত থেকে এখান থেকে রক্ষা পেয়ে গেলো। কিন্তু তাদের উপর মুসলমানদের প্রভাব বিস্তার করলো। সম্ভবতঃ এবার মক্কার কাফিরদের চোখ খুলবে এবং গরীব মুসলমানদের বিরুদ্ধে শত্রুতা থেকে বিরত হবে।

নবীজী (সাঃ) ইরশাদ করলেন ঃ এবার তোমরা যাও। বিশ্রাম করো। সবাই চলে গেলেন।

সাহাবায়ে কেরামের প্রত্যাবর্তনের পর কয়েক দিন অতিক্রম হলো। এলো দুজন বেদুইন। তারা রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে

আরয করলো ঃ মক্কার কুরাইশ অত্যন্ত শানশওকত, জাঁকজমকে বিশাল বাহিনী নিয়ে মদীনা মুনাওয়ারার উপর আক্রমণের উদ্দেশ্যে অগ্রসর হয়ে আসছে। এই সংবাদ শুনে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভীষণ উদ্বিগ্ন ও উৎকণ্ঠিত হলেন। কিন্তু তিনি মুখে কিছু বললেন না, নীরব থাকলেন। বোধ হয় তিনি দেখতে চেয়েছিলেন যে, সাহাবায়ে কেরাম এবং মদীনার মুশরিক, ইয়াহুদীদের উপর এই সংবাদের প্রতিক্রিয়া কী দেখা দেয়। সাহাবায়ে কেরামের মনে চিন্তা ঢুকলো মুশরিক, ইয়াহুদী এবং মুনাফিকরা হলো খুবই উল্লসিত। একজন অপরজনকে মুবারকবাদ দিতে লাগলো। বিশেষতঃ আবদুল্লাহ ইবন উবাই এতই আনন্দিত হলো যে, সে প্রকাশ্যেই বলে বেড়াতে লাগলো, এবার আর মুসলমানদের কল্যাণ (রক্ষা) নেই। কুরাইশের বাণিজ্যিক কাফেলার উপর এরা আক্রমণ করতে গেছিলো, তারা ভাবেনি কুরাইশ দুর্বল নয়।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট মুশরিক এবং ইয়াহুদীদের সব সংবাদই নিয়মিত পৌছতো। মুসলমানদের অন্তরে যে পেরেশানী সেটাও নবীজী (সাঃ) লক্ষ্য করলেন। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন মুহাজির এবং আনসারের সমস্ত সম্মানিত এবং জ্ঞানবান লোকদেরকে মসজিদে নববীতে একত্রিত করলেন। তিনি বললেন ঃ

"হে মুসলমানগণ! ইসলামের উন্নয়ন ইসলামের শত্রুদের গায়ে কাঁটারূপে বিদ্ধ হয়েছে। তারা ইসলামের আলোকে মুখের ফুৎকারে নিভিয়ে দিতে চায়। ইসলাম শান্তির পয়গাম নিয়ে এসেছে। মুসলিম জাতি, শান্তি ও নিরাপত্তার পতাকাবাহী। মক্কার কুরাইশরা মুসলমানদের মিটিয়ে দিতে চায়। তাদের বিশাল বাহিনী অনেক অস্ত্র-শস্ত্র ও রসদপত্র নিয়ে আমাদের উপর আক্রমণ করার জন্য প্রস্তুতি নিয়ে আসছে। এই সেনাবাহিনীর সাথে কুরাইশের সমস্ত নেতৃবৃন্দ এবং প্রভাবশালী লোকজন আছে। যেন মক্কা মুয়াযযমা তার সমস্ত কলিজার টুকরোগুলোকে তোমাদের মোকাবিলায় পাঠিয়েছে। কাফিরদের মোকাবিলায় তোমাদের দল একেবারেই নগণ্য। তাছাড়া তোমরা অস্ত্র-শস্ত্রহীন। না আছে তোমাদের কাছে সওয়ারী, না লৌহবর্ম, না অন্যান্য যুদ্ধের সাজসরঞ্জাম।

তবে এটা হচ্ছে ইসলাম ও কুফরের লড়াই। কুফর ইসলামের উপর প্রভাব বিস্তার করতে চায়। আর আল্লাহ তা'আলা চান ইসলামকে বিজয়ী করতে। ইসলামের চেহারা উজ্জ্বল হবে মুসলমানদের মাধ্যমে। তোমরা ভেবে-চিন্তে বলো, মক্কার কাফিরদের বিরুদ্ধে মোকাবিলা করার ব্যাপারে তোমাদের কি মতামত?

হযরত উমর (রাযিঃ) ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাদেরকে বহু কষ্ট দেয়া হয়েছে। আমাদের প্রতি মারাত্মক নির্যাতন করা হয়েছে। আমাদের নিশ্চিহ্ন করার জন্য চলেছে বহু-প্রচেষ্টা। কাফিরদের এই চেষ্টা-প্রচেষ্টাকে নিস্ফল করে দিতে হবে। আমরা যুদ্ধের জন্য অপেক্ষা করছিলাম। আল্লাহ তা'আলা আমাদের জিহাদের হুকুম দিয়েছেন। আমাদের বক্ষে জিহাদের জোশ এবং শাহাদাতের তামান্নার নহর প্রবাহিত হচ্ছে। আমরা মক্কার কাফিরদের বিরুদ্ধে মোকাবিলা করার জন্য প্রস্তুত। আমার রায় হচ্ছে তাদের বিরুদ্ধে অবশ্যই মোকাবিলা করা উচিত।

হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাযিঃ) ঃ দাঁড়িয়ে বললেন, ইয়া নাবীয়াল্লাহ! এতে কোন সন্দেহ নেই যে, আমরা সংখ্যায় খুব কম। তবে আমরা আমাদের শক্তির উপর ভরসা করছি না। আল্লাহর শক্তির উপর আমাদের ভরসা। আমরা বর্বরতার যুগেও বীর ছিলাম। কারও বিরুদ্ধে মোকাবিলায় পিছপা হইনি। এখন তো আমরা মুসলমান। আমরা জানি জিহাদের কত সওয়াব ও মূল্য। আমরা রণাঙ্গনকে প্রশান্তির দোলনা মনে করি। আমরা বনী ইসরাইলের মতো নই। যারা হযরত মুসা (আঃ)কে সম্বোধন করে বলেছিলো ঃ "আপনি আর আপনার প্রভু যান তাদের (কওমে আমালিকার) বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে। আমরা এখানেই ঠাঁয় বসে থাকবো।"

আমরা এখানে বসে তামাশা দেখবো না।

হযরত আলী (রাযিঃ) ঃ এটা বাস্তব কথা, আমরা বনী ইসরাইলের মতো নই। তারা কাপুরুষতার পরিচয় দিয়েছিলো। আর আমরা বলবো, আপনি মদীনায় অবস্থান করুন। আমরা কাফিরদের বিরুদ্ধে লড়বো। আপনার ঘামের স্থলে আমরা খুনের নদী বইয়ে দিবো। আমাদের জীবন বেঁচে থাকতে কারো ক্ষমতা নেই প্রিয়নবীর চোখের দিকে চোখ তুলে তাকাবে। যারা এমনটি করবে, তাদের মাথার খুলি উড়িয়ে দেবো।

মিকদাদ ঃ মক্কাবাসীদের অহংবোধ তাদের বীরত্বের উপর। আমরা যতদিন মক্কায় ছিলাম, আমাদের উপর তারা নির্যাতন চালিয়েছিলো, আমাদের কষ্ট-যাতনা দিয়েছিলো। এরফলে তাদের মধ্যে এই ধৃষ্টতা এবং বাহাদুরী সৃষ্টি হয়েছে যে, এবার তারা মদীনায় আমাদের উপর আক্রমণ করার জন্য উদ্যত হয়েছে। তাদের খবর নেই, যতদিন পর্যন্ত আমরা মক্কায় অবস্থান করছিলাম আল্লাহ তা'আলা তাদের বিরুদ্ধে আমাদেরকে তলোয়ার ধারণ করার অনুমতি দেননি। আমরা ততদিন তাদের জুলুম-নির্যাতন এবং বাড়াবাড়ি সহ্য করেছিলাম। কিন্তু এবার আল্লাহ তা'আলা আমাদের জিহাদের নির্দেশ দিয়েছেন। এখন যদি তারা আমাদের বিরুদ্ধে মোকাবিলা করতে আসে তাহলে

খবর আছে। আমাদের তলোয়ার তাদের বাতলে দেবে যে, বাহাদুরী এমনই হয়। তারা যুদ্ধ ঘোষণা করেছে, এই যুদ্ধের চ্যালেঞ্জ আমাদের গ্রহণ করা উচিত।

এসব লোক নিজেদের মতামত প্রকাশ করছিলেন। সেখানে মুহাজির এবং আনসার সবাই ছিলেন। মুহাজিরদের সংখ্যা ছিলো কম। এতক্ষণ পর্যন্ত আনসারীদের মধ্য থেকে কেউ কোন বক্তব্য রাখছিলেন না। আনসারীদের সাথে এই চুক্তি হয়েছিলো যে, মদীনায় যে কেউ হামলা করলে তারা তা প্রতিহত করবে। প্রিয়নবী (সাঃ)–এর ইচ্ছে ছিলো, মদীনা থেকে বেরিয়ে মোকাবিলা করার। এজন্য তিনি বারবার বিষয়টি জিজ্ঞেস করছিলেন। আনসারীগণ বুঝতে পেরেছিলেন, এখন প্রিয়নবী (সাঃ) আমাদের কাছ থেকে জবাব নিতে চাচ্ছেন।

হযরত সা'দ (রাঃ) বলে উঠলেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাদের দিকে ইঙ্গিত করছেন?

প্রিয়নবী (সাঃ) ঃ হাঁ।

সা'দ (রাঃ) ঃ আমাদের মাতা–পিতা আপনার প্রতি উৎসর্গ হোক। আমরা আপনাকে আল্লাহর রসূল বলে মনে করি। তাই আপনার প্রতি ঈমান আনয়ন করেছি। এটা কি করে সম্ভব যে, আল্লাহর রসূল, আমাদের রাহবর, কওমের নেতা, ইসলামের ঝাণ্ডাবাহী, সারাবিশ্বব্যাপী শান্তি ও নিরাপত্তার পয়গামবাহী, মুহাম্মাদ (সাঃ) কাফিরদের মোকাবিলার জন্য যাবেন আর আমরা ঘরে বসে থাকবো। কাফিররা বিশাল বাহিনী নিয়ে অস্ত্র–শস্ত্র ও রসদপত্র নিয়ে আসছে আমরা তাদের ভয় করি না। জীবনের শেষ নিঃশ্বাসটুকু যতক্ষণ পর্যন্ত অবশিষ্ট থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা তাদের বিরুদ্ধে লড়ে যাবো।

হযরত আবু আইয়ুব আনসারী ঃ ভুল হয়েছে আমাদের। প্রথমেই আমাদের মতামত প্রকাশ করা উচিত ছিলো। ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাদের ধনসম্পদ, আমাদের জান আপনার জন্য উৎসর্গ হোক। আমাদের গর্ব আমরা মুসলমান। তাওহীদের দৌলত আমরা পেয়েছি, আল্লাহকে আমরা চিনতে পেরেছি। আমরা আপনাকে ছেড়ে কিভাবে পিছটান দিতে পারি। আমাদের শিরা–উপশিরায় খুন টগবগ করছে। যতক্ষণ আমাদের রগ–রেশায় রক্ত চালু থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা তাদের বিরুদ্ধে লড়তে থাকবো।

প্রিয়নবী (সাঃ) ঃ আল–হামদুলিল্লাহ! তোমরা যথার্থ সিদ্ধান্ত দিয়েছো। মুসলমান ভাইসব! জিহাদের চেয়ে বড় কোন ইবাদত নেই। জিহাদের চেয়ে বেশী সওয়াব কোন ইবাদতে নেই। একজন মুজাহিদ যখন জিহাদের জন্য ঘর

থেকে বেরিয়ে পড়ে তখন আল্লাহ তা'আলা তার সমস্ত গোনাহ মাফ করে দেন। বেহেশতের সব দরজাই তার জন্য উন্মুক্ত করে দেয়া হয়। ডাগর চক্ষুবিশিষ্ট হুরগুলো তাদের অপেক্ষায় জান্নাতের দরজায় এসে দাঁড়িয়ে থাকে। তার জন্য বেহেশতে প্রাসাদ তৈরী করা হয়। সে যখন শাহাদাত লাভ করে তখনই সে প্রাসাদের অধিকারী হয়। আর যদি সে বিজয় লাভ করে, গাজী হয়ে ফিরে আসে তখন সে প্রাসাদ তার জন্যই রেজিষ্ট্রি করে রাখা হয়। যখন সে মৃত্যু লাভ করবে অথবা শহীদ হবে তখন তাতে প্রবেশ করবে। তোমরা প্রস্তুতি নাও। আগামীকাল যথাযথভাবে এজন্য লোকজন নির্বাচন করা হবে। লোকজন স্বতঃস্ফূর্তভাবে একেকজন করে এখান থেকে উঠে চলে গেলো।

৩০
রাফিদার দুষ্টুমি

মাসউদ এবং রাফিদা উভয়েই যুহরীর তাঁবুতে রাত্রিযাপন করলো। সুবহে সাদেকের সময় উঠে দুজনেই ফজরের নামায আদায় করলো। সালিমা, তার আম্মু, তার ভাই ও পিতা স্ব স্ব কাজে মশগুল। মাসউদ বললো ঃ রাফিদা! তুমি তো এখনও সফরের যোগ্য হয়েছো বলে মনে হয়নি।

রাফিদা মুচকি হাসলো। সে বললো, মনে হয় আরও কিছুকাল এখানে অবস্থান করতে মনস্থ করছেন।

মাসউদ ঃ আমার ইচ্ছা.......। না, আমি আর থাকতে ইচ্ছে করছি না। এখানে থেকে আমার কি কাজ?

রাফিদা হেসে উঠলো। সে বললো, কাজ তো নেই তবুও অবস্থান করতে চাচ্ছেন।

মাসউদ ঃ যদি তুমি থাকতে চাও, তাহলে বাধ্য হয়ে আমাকেও থাকতে হবে।

রাফিদা ঃ না, আমি আপনাকে বাধ্য করতে চাই না। আমি প্রস্তুত। উটনী প্রস্তুত করুন।

মাসউদ ঃ আচ্ছা, ঠিক আছে আমি যুহরীর কাছ থেকে আর তুমি উম্মে সালিমার কাছ থেকে অনুমতি নাও।

রাফিদা ঃ আমার ধারণা, সালিমার কাছ থেকে আপনার অনুমতি নেয়া উচিত।

মাসউদ মনে করেছিলো, তার মনের চোর সম্পর্কে কেউ অবহিত নয়। কিন্তু ভিতরে ভিতরে রাফিদা তা ধরে ফেলেছিলো। তাই মাসউদ উদ্বিগ্ন

হলো। সে কথা বানিয়ে বললো, সালিমার কাছ থেকে অনুমতি মানে?

রাফিদা ঃ নিজের মনকে প্রশ্ন করুন।

এরা দুজন তাঁবুর বাইরে বসে কথোপকথন করছিলো। ঘটনাক্রমে সালিমাও মাসউদ ও রাফিদার অজান্তে সেখানে এসে পৌছলো। তারা দুজনের কেউ টের পেলো না, তাকে দেখতে পেলো না। সে এসে একেবারে তাদের নিকটবর্তী হয়ে গেলো। তাদের কথা শুনতে পেলো। সে লুকিয়ে রইলো খেজুরগাছের ডালার পিছনে।

মাসউদ ঃ সালিমাকে বোধহয় তোমার কাছে খুব ভালো লাগে?

রাফিদা ঃ নিজের কথা বলুন।

মাসউদ ঃ আমার কথা বলছো তুমি? আমার কাছে তো প্রতিটি মেয়েই ভালো মনে হয়।

রাফিদা ঃ তবে সালিমাই বোধহয় সবচেয়ে প্রিয়।

মাসউদ ঃ আরেক বিতর্কে জড়িয়ে পড়েছো। যেতে চাইলে তাড়াতাড়ি করো। জলদি প্রস্তুতি নাও।

রাফিদা ঃ আমার আর কি প্রস্তুতির প্রয়োজন। উটনী প্রস্তুত করুন।

মাসউদ ঃ যদি পথিমধ্যে জ্বরাক্রান্ত হয়ে পড়ো তাহলে?

রাফিদা ঃ আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, আমার জ্বর আসবে না।

মাসউদ ঃ তাহলে চলো।

দুজনেই উঠে দাঁড়ালো। খেজুরের ডাল এতটুকু মোটা ছিলো না যে, পিছন দিক থেকে সালিমাকে দেখা যায় না। সালিমা পূর্ব থেকেই আশংকা করছিলো যে, হয়তো তারা তাকে দেখে ফেলবে। এজন্য এ দুজনের দাঁড়ানোর সাথে সাথেই খেজুরগাছের আড়াল থেকে বেরিয়ে দূর থেকে বলতে লাগলো— আপনারা দুজন নির্জনে এখানে কি আলাপচারিতায় লিপ্ত?

মাসউদ তাকে দেখলো। নজর আর ফিরাতে পারলো না। রাফিদা তাকে বললো যে, রওয়ানা সম্পর্কে আলোচনা হচ্ছিলো।

সালিমা তার কাছে এসে দাঁড়ালো। সকাল বেলা সালিমার চেহারা লাল সুন্দর টকটকে ফুলের মতো মনে হচ্ছিলো। সে তাকে লক্ষ্য করে বললো, আপনাদের কষ্ট হচ্ছে?

রাফিদা ঃ তকলীফ! ঘরের মতই তো আরাম পেয়েছি।

সালিমা ঃ তাহলে তাড়াহুড়া করছেন কেন? তোমার শরীর কি এখনই সুস্থ হয়ে গেছে?

রাফিদা ঃ আমার শরীর পুরোপুরি ঠিক হয়ে গেছে।

সালিমা ঃ আচ্ছা আম্মুর কাছে জিজ্ঞেস করুন।

মাসউদ ঃ আমি তাকে প্রথমেই বলেছিলাম, কিন্তু রাফিদা একধরনের জেদী মেয়ে।

সালিমা মাসউদকে তাকিয়ে দেখলো। মায়াবিনী এই চেহারার দিকে মাসউদও দৃষ্টিপাত করলো। চার দৃষ্টি একত্রিত হলো। মাসউদের মনে কম্পন সৃষ্টি হলো। সালিমা বললো, জেদের কথা তো ভিন্ন, অন্যথায় এখনো তার আরামের প্রয়োজন রয়েছে।

মাসউদ ঃ কিন্তু তাকে বুঝাবে কে?

রাফিদা মুচকি হেসে বললো, আমি তো প্রথমেই অনুধাবন করেছিলাম, তিনি এখান থেকে যেতে চাচ্ছেন না। মন তাকে যেতে দেয় না। সালিমার চেহারা তখন প্রফুল্ল হয়ে উঠলো। সে বললো, কিন্তু আপনার মন কি যেতে চাচ্ছে?

রাফিদা ঃ আমার যাওয়া আর থাকার প্রশ্নই নেই, তিনি থাকলে আমিও থাকবো। তিনি চলে গেলে আমিও চলে যাবো।

সালিমা ঃ তুমি ঠিক বলেছো। সে বিস্ময়কর মনোহারী দৃষ্টিতে মাসউদের দিকে তাকাচ্ছিল। এবার আপনি বলুন।

মাসউদ অনিচ্ছাকৃতভাবে বলে ফেললো, আমার সিদ্ধান্ত তোমার উপর নির্ভরশীল। তুমি যা হুকুম দিবে আমি তাই করবো।

রাফিদা ঃ বেচারা মজনু হয়ে গেছে। এ কথা বলেই দুষ্টুমীর দৃষ্টিতে রাফিদা মাসউদের দিকে তাকালো।

মাসউদ বললো, এটা হলো বোনের পক্ষ থেকে ভাইকে সম্বোধন।

এবার রাফিদা পর্দার আড়ালে চলে গেলো। হাজির হলেন উম্মে সালিমা। তিনি এসে বললেন, তোমরা তিনজন এখানে দাঁড়িয়ে কি আলোচনা করছো? তোমরা কি নাস্তা খাবে না?

সালিমা ঃ রাফিদা চলে যাওয়ার কথা বলছে।

উম্মে সালিমা ঃ এখনও তোমার শরীর পুরোপুরি সুস্থ হয়নি।

রাফিদা দেখতো, ফুলের মত চেহারা শুকিয়ে চুপসে আছে।

রাফিদা ঃ আম্মু! আপনার অনুমতি ছাড়া আমরা যাবো না।

উম্মে সালিমা ঃ স্বীকার করছো?

রাফিদা ঃ হাঁ, স্বীকার করছি।

উম্মে সালিমা ঃ এসো তো আগে নাস্তা করে নাও। সবাই তার পিছু পিছু চললো। তাঁবুর ডানদিকে একটি ছায়াদার জায়গা ছিলো। তার নিচেই যুহরী এবং নাইল বসে ছিলেন। মাসউদ তাদের কাছে এবং সালিমা, রাফিদা তাদের সামনে গিয়ে বসলো। নাইলের আঁখিযুগল রাফিদার সৌন্দর্যমণ্ডিত চেহারার

উপর স্থির হয়ে গেলো। উম্মে সালিমা বললেন ঃ রাফিদা যেতে চাচ্ছে। এ কথা শোনা মাত্রই যেন নাইলের দেহে একটি ঘুষি পড়লো। চেহারা তার ফ্যাকাশে হয়ে গেলো। আবেদনের দৃষ্টিতে সে রাফিদার দিকে তাকালো। যেন সে বলছে, তুমি যেয়ো না। এখানেই অবস্থান করো। রাফিদার নজরও তার প্রতি নিবদ্ধ হলো। সেও সবকিছু অনুধাবন করতে পারলো।

যুহরী বললেন ঃ বেটি! এখন তোমরা কোথাও যেয়ো না। এখানেই থাকো। জানতে পারলাম, কুরাইশ এবং মুসলমানদের মধ্যে সংঘর্ষ আরম্ভ হয়েছে। পথ বিপদজনক।

মাসউদ চৌকান্না হয়ে যুহরীর দিকে তাকালো এবং জিজ্ঞেস করলো, যুদ্ধের সিদ্ধান্ত কি হয়ে গেছে?

যুহরী ঃ কুরাইশ নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেছে। এজন্য মনে হচ্ছে যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী।

মাসউদ ঃ তাহলে তো আমাদেরকে মদীনায় পৌঁছে যেতে হবে।

যুহরী ঃ কেন?

মাসউদ ঃ মুসলমানরা সংখ্যালঘু। আমি তাদের সেনাবাহিনীতে অংশগ্রহণ করবো। মনে হয় আল্লাহ তা'আলা জিহাদের হুকুম দিয়েছেন।

যুহরী ঃ জিহাদের নির্দেশে ব্যাপক মুসলমানদের আনন্দিত ও প্রফুল্ল মনে হচ্ছে। ব্যাপার কি?

মাসউদ ঃ মুসলমানগণ এতদিন পর্যন্ত কষ্ট-তকলীফ সহ্য করে আসছেন। তারা অপেক্ষমান ছিলেন আল্লাহর নির্দেশের। আল্লাহ তা'আলা মুসলমানদের অসহায়ত্ব এবং অপারগতার প্রতি অনুকম্পা করে জিহাদের নির্দেশ দিয়েছেন। এবার মুসলমানরা প্রতিশোধ নিতে পারবেন।

উম্মে সালিমা নাস্তা হাজির করলেন। একদিকে তিনি নিজেও বসে গেলেন। সবাই নাস্তা খেতে আরম্ভ করলো। রাফিদা লাজুক নববধুর ন্যায় ছোট ছোট লোকমায় খাচ্ছিলো। অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই সবার নাস্তার কাজ সমাপ্ত হলো। উম্মে সালিমা ঝুটা ইত্যাদি এখান থেকে সরিয়ে নিলেন। মাসউদ যুহরীকে সম্বোধন করে বললো ঃ এবার আমাদের অনুমতি দিন।

যুহরী ঃ বেটা! তোমাদের দুই ভাইবোনের প্রতি আমার স্নেহ-মহব্বত সৃষ্টি হয়ে গেছে। যেমন ভালোবাসা ও স্নেহ-মমতা সৃষ্টি রয়েছে নাইল এবং সালিমার প্রতি। আমার মনোবাসনা হচ্ছে তোমরা দুজন এখানে থাকো। কিন্তু যদি যেতেই চাও তাহলে আমি আর জোর করবো না।

সালিমা ঃ রাফিদাকে তো আমি কখনো যেতে দেব না।

জুহরী ঃ বেটি! আমরা তো জোর-জবরদস্তি করতে পারি না। এটা

মাসউদের মর্জি। সে চাইলে রাফিদাকে রেখে যেতে পারে, অন্যথায় সাথে নিয়ে যেতে পারে।

মাসউদ ঃ আপনার সাথে মুসলমানদের সাথে কোন চুক্তি হয়েছে?

যুহরী ঃ হাঁ, আমরা তাদের মিত্র।

মাসউদ রাফিদাকে সম্বোধন করে বললো ঃ তুমি এখন আমার সাথে মদীনায় যাবে, না আমার প্রত্যাবর্তন পর্যন্ত এখানেই অবস্থান করবে?

রাফিদা ঃ আমি সালিমা আপুর কাছে থেকে যাবো।

এতদশ্রবণে সালিমা এবং নাইলের চেহারা চমকে উঠলো।

মাসউদ ঃ আচ্ছা ঠিক আছে, তুমি এখানেই থেকে যাও। আমি যাচ্ছি জিহাদে অংশগ্রহণ করতে। যদি জীবিত থাকি তাহলে ফিরে আসবো আর যদি প্রত্যাবর্তন না করি তাহলে তোমার ইচ্ছা—মদীনায় চলে যাবে অথবা যেখানে ইচ্ছে যেতে পারো। এই বলে সে উঠলো। নাইল তার সাথে আলিঙ্গন করলো। তার উট প্রস্তুত করে নিয়ে এলো। মাসউদ নাইল, যুহরী এবং উম্মে সালিমাকে অভিবাদন জানিয়ে রওয়ানা করলো।

৩১
ইবন উবাই-এর ষড়যন্ত্র

অসহায় মুসলমানরা জিহাদের জন্য প্রস্তুতি শুরু করেছেন। প্রস্তুতি আর কি নিবে, তাদের কাছে তেমন কোন অস্ত্র-শস্ত্র ছিলো না। তাদের কাছে ছিলো না লৌহবর্ম এবং অন্যান্য সমসাময়িক অস্ত্র-শস্ত্র। যাদের কাছে তলোয়ার ছিলো, তাঁরা তলোয়ার ধার করছিলেন। যাদের কাছে নেজা ছিলো, তাঁরা সেগুলো ধারাচ্ছিলেন। তীরের পাখাগুলোকে সোজা এবং চোখা বানাচ্ছিলেন। মদীনার মুশরিক এবং ইয়াহুদীরা জানতে পারলো যে, মুসলমানরা যুদ্ধ প্রস্তুতি নিচ্ছেন। তারা অনতিবিলম্বেই মক্কাবাসীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে রওয়ানা করবেন। তারা এটাও জানতে পেরেছিলো যে, মক্কাবাসী খুব শান-শওকত ও জাঁকজমকে বিশাল অস্ত্রসম্ভার সহকারে বিরাট বাহিনী নিয়ে আসছে। তাদের ধারণা ছিলো, মুসলমানরা সংখ্যালঘু। তারা দুর্বল, নিরীহ, নিরস্ত্র। এরা কিছুতেই কুরাইশের বিরুদ্ধে জিতে উঠতে পারবে না। মুশরিকদের মধ্যে এরূপ কিছু লোক ছিলো যারা মুসলমানদের সাথে মিলে মিশে চলতো। বাহ্যতঃ তারা ছিলো মুসলমানদের প্রতি সহানুভূতিশীল কিন্তু নেপথ্যে তারা লিপ্ত ছিলো মুসলমানদের মূলোৎপাটনে। তাদের নেতৃত্ব দান করছিলো আবদুল্লাহ ইবন উবাই।

সে যখন জানতে পারলো, মুসলমানরা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছেন তখন খুব আনন্দিত হলো। সে মনে করেছিলো, মক্কাবাসীদের সাথে মুসলমানদের সংঘর্ষে এরা অবশ্যই মারা পড়বে। সে ভাবলো, মুসলমানদের মধ্যে কুধারণা, কাপুরুষতা, হীনমন্যতা এবং ভয়-ভীতি সৃষ্টি করে দেয়া হবে। অথবা তাদের মধ্যে অনৈক্য ও ফাটল সৃষ্টি করে দেয়া হবে। ফলে সে মদীনাবাসীদের প্রতি সহানুভূতিশীলরূপে শয়তানের মতো তাদেরকে প্রতারিত করতে লাগলো। বারবার তাদের কাছে গেলো। সর্বপ্রথম গেলো সাদ ইবন মুয়ায (রাঃ)-এর কাছে। তার কাছে যেয়ে বললো ঃ আপনার প্রতি আমি বড়ই সহানুভূতিশীল। আপনি মুসলমান হয়েছেন, ভালো করেছেন। হয়তো আপনি এ ধর্মকে ভালো মনে করেছেন। মুহাম্মাদ (সাঃ) এবং মুসলমানদের সাহায্য সহযোগিতা করাও অসংগত-অনুচিত কোন ব্যাপার নয়। মদীনার উপর মক্কাবাসীরা হামলা করলে চুক্তি মোতাবেক আপনারা এবং আমরা সবাই মিলে মোকাবিলা করতাম। কিন্তু মুহাম্মাদ (সাঃ) মদীনার বাইরে যেয়ে তাদের বিরুদ্ধে মোকাবিলা করতে চাচ্ছেন। আমাদের এবং আপনাদের এইরকম কোন চুক্তি ছিলো না। আমাদের এবং আপনাদের এখানেই থাকা উচিত। আপনি তাদের সাথে যাবেন না।

সা'দ (রাঃ) কড়া দৃষ্টিতে তার দিকে তাকালেন এবং বললেন ঃ তুমি আমাকে বিভ্রান্ত করতে এসেছো? তুমি জানো না আমরা মদীনার আনসারীরা রসূলুল্লাহ (সাঃ)কে কতটা ভালবাসি? তাঁর কতটা আনুগত্য করি? তিনি লড়তে যাবেন আর আমরা এখানেই বসে থাকবো? এটা আমাদের শান পরিপন্থী। সহানুভূতির বিরোধী, মহবত-ভালোবাসা ও ভ্রাতৃত্বের খেলাফ। আবদুল্লাহ ইবন উবাই লজ্জায় মুখ লাল করে সেখান থেকে প্রস্থান করলো। এরপর আর কোন কথা বলার ধৃষ্টতা তার হলো না।

সেখান থেকে উঠে সে চলে গেলো আউস ইবন সাবিত-এর নিকট। তার কাছে যেয়ে বললো, মক্কার কুরাইশরা পরিপূর্ণ প্রস্তুতি নিয়ে আসছে। মুসলমানরা কোনক্রমেই তার মোকাবিলা করতে পারবে না। সা'দ ইবন মুয়াযকে আমি বলেছিলাম, আপনারা মুহাজিরদের সাথে যাবেন না। তিনি বলেছেন, আপনি যথার্থ পরামর্শ দিয়েছেন। আমিও তাই ভেবেছিলাম। যাবার ব্যাপারে আমি বিভিন্ন রকমের টালবাহানা করবো। আপনি আউস এবং অন্যান্যদের বলবেন, তারা যেন না যান। কেন তারা নিজের জাতিকে ধ্বংস করতে যাবেন। ঝগড়া তো কুরাইশের সাথে মুহাম্মাদ ও তার সাথী-সঙ্গীদের সাথে। আমাদের সাথে তো কোন বিরোধ নেই। আমরা গায়ে পড়ে কেন তাদের শত্রু হবো। আমি আপনার কাছে এসেছি, আপনিও যাবেন না।

আউস তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তার দিকে তাকালেন। বললেন ঃ আউযুবিল্লাহি মিনাশ শায়তানির রাজীম। অর্থাৎ, বিতাড়িত শয়তান থেকে আমি আল্লাহর কাছে পানাহ চাইছি। বস্তুতঃ তুমি এক মানব শয়তান। এসেছো আমাকে বিভ্রান্ত করার জন্যে। সাদ ইবন মুয়ায ইসলামের একজন বীর সেনানী। তিনি আবু উবাইদাহ ইবনুল জাররাহ–এর ভাই। কখনও তিনি এরূপ কথা বলতে পারেন না। আমরা কোন পার্থিব স্বার্থে মুহাম্মাদ (সাঃ)এর সঙ্গ অবলম্বন করিনি। তাঁকে আল্লাহর রাসূল মনে করি। আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে তাঁর সাথে চলছি। জীবন–মৃত্যু আমাদের তাঁরই সাথে। তিনি মদীনায় থেকে লড়াই করলে আমরা তাঁর সাথে আছি। মদীনার বাইরে গিয়ে যুদ্ধ করলেও আমরা তাঁর সাথে থাকবো।

ইবন উবাই এখানেও সফল হলো না। তার ভাবনা ছিলো আউস তার কথাবার্তা শুনে সাদের প্রতি কুধারণা পোষণ করবেন। কিন্তু তিনি তার কথাই বিশ্বাস করলেন না। ফলে, আবদুল্লাহ ইবন উবাই এর চেহারা ফ্যাকাশে হয়ে গেলো। সে তো মুসলমানদের বিরোধিতা এজন্যেই করছে যে, তার কাল্পনিক রাজপ্রাসাদ ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যাচ্ছে। এখনও পর্যন্ত আউস এবং খাযরাজ উভয় গোত্রের উপর তার অনেকটা প্রভাব রয়েছে। কিন্তু উভয় কবীলার কিছু সম্মানিত ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করে ফেলেছেন। তাদের ইসলাম গ্রহণের কারণে আবদুল্লাহ ইবন উবাই এর শান ও প্রভাবে ভাটা পড়েছে। সে শাহী মুকুট যেটি উভয় গোত্র মিলে তৈরী করেছিলো, যে রাজমুকুট কিছুদিনের মধ্যে তার মাথায় পরানো হতো সেসব ভেস্তে যাচ্ছে। রাজত্ব তার হাত থেকে ছুটে যাচ্ছে।

ইবন উবাই আউসের কাছ থেকে উঠে চলে এলো। এবার সে আরেকটি পদ্ধতি অবলম্বন করলো। গেলো মুহাজিরদের কাছে। সে জানতো আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) নম্র স্বভাবী এবং দয়াপ্রবণ, ভদ্র, সুসভ্য এবং মজবুত ব্যক্তি। তিনি তার কথা মনোযোগ দিয়ে শুনবেন। এজন্য সে হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ)–এর কাছে গিয়ে পৌঁছলো।

আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) তার সম্পর্কে ওয়াকিফহাল ছিলেন। ইবন উবাইকে দেখে হযরত সিদ্দীকে আকবর (রাঃ) বললেন, কি ব্যাপার ইবন উবাই? কি মনে করে আসলেন?

ইবন উবাই ঃ কি বলবো, হয়তো আপনি জানেন, মুসলমানদের প্রতি আমার প্রচুর সহানুভূতি রয়েছে। সম্ভবতঃ আপনি এটাও জানতে পেরেছেন যে, মদীনাবাসী আমাকে তাদের সম্রাট বানাতে চেয়েছিলো। রাজমুকুটও তারা তৈরী করেছিলো। এমতাবস্থায় আপনাদের রাসূল আগমন করলেন। লোকজন

আমার কাছে আবেদন করেছিলো যেন অতি দ্রুত মুকুট পরানোর সেই অনুষ্ঠানটি আমি করে ফেলি। কিন্তু আমি তাদের বুঝালাম, এখন নয়। যেসব মুসলমান মদীনায় আগমন করেছেন প্রথমে দেখো শহরবাসী তাদের সাথে কি ব্যবহার করে। তারাও শহরবাসীর সাথে কিরূপ আচরণ করে। ফলে আমি তখন মাথায় রাজমুকুট পরার সেই অনুষ্ঠানটি স্থগিত করে রেখেছি। আপনারা এসেছেন আর শহরবাসী আপনাদের সাথে এবং আপনারা শহরবাসীদের সাথে সদ্ব্যবহার দেখিয়েছেন। হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ)এর প্রভাব-প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পেতে আরম্ভ করেছে। এতে আমি বড়ই আনন্দিত। তিনি আন্তর্জাতিক আরেকটি চুক্তিও করেছেন। এতে আমি আরও বেশী খুশী হয়েছি। আমার মনের তামান্না হচ্ছে, সে রাজমুকুটটি যেন মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর মাথায়ই পরিয়ে দেওয়া হয়।

আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) হাতের ইশারায় তাকে আলোচনা থেকে বারণ করলেন। সে খামোশ হলে আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) বললেন ঃ এরূপ কথা বলবেন না, ইবন উবাই! ফখরে দোআলম হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) রাজত্বের কোন আকাংখাই পোষণ করেন না। তিনি আল্লাহর রাসূল। মহান রাব্বুল আলামীনের পয়গাম্বর। তাঁর আগমন ঘটেছে সৃষ্টিকে শির্‌ক-কুফর থেকে বাঁচানোর জন্য। খোদাদ্রোহীদেরকে আল্লাহর সামনে আত্মসমর্পণ করানো এবং ভ্রান্ত উপাসনা থেকে সরিয়ে প্রকৃত উপাস্য আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের ইবাদতের দিকে পথপ্রদর্শনের জন্য। তিনি রাজমুকুট অথবা রাজত্বের কোন মনোবাসনাই পোষণ করেন না। এই তামান্না তাঁর অন্তরে নেই।

ইবন উবাই ঃ তিনি চান না। তবে আমি নিজ থেকে আমার মনের কথা প্রকাশ করলাম।

আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) ঃ এটাই যখন আপনার মনের আশা তাহলে আপনি ইসলাম গ্রহণ করছেন না কেন?

ইবন উবাই ঃ এটা ধর্মীয় ব্যাপার। একটি ধর্ম বর্জন করা সহজ ব্যাপার নয়। যে ধর্মের উপরে আমাদের পিতা-প্রপিতারা ছিলেন, যে ধর্মের কোলে আমাদের চোখ উন্মেলিত হয়েছে, ক্ষণিকের মধ্যেই সেই ধর্ম কিভাবে বিসর্জন দেই?

আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) ঃ আপনি ঠিক বলেছেন। বাপ-দাদাদের ধর্ম বর্জন করা জটিল কাজ। কিন্তু আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আমাদের প্রতি এই এহসান করেছেন যে, সর্বপ্রথম আমাদেরকে সৃষ্টির সেরা বানিয়েছেন। তার দ্বিতীয় অনুগ্রহ হলো, আমাদেরকে বুদ্ধি-জ্ঞান দান করেছেন। আমাদের দায়িত্ব হলো, সেই বুদ্ধি-বিবেককে কাজে লাগানো এবং চিন্তা-ফিকির করে কাজ

করা। আমাদের হাতে গড়া প্রতিমাগুলো কি উপাস্য হতে পারে? ওগুলোর কোন শক্তি আছে? ওগুলোর মধ্যে যদি কোন শক্তি—সামর্থ্য থাকতো তাহলে কি মানুষের হাতে এগুলোকে তৈরী করা সম্ভব হতো? এগুলো তো নিজে নিজেই তৈরী হয়ে যেতো। অতএব, এসব প্রতিমার পূজা–অর্চনা কেন করছেন? ওগুলো বাদ দিয়ে সেই সত্তারই ইবাদত করা উচিত যিনি সেসব প্রতিমাকে সৃষ্টি করেছেন।

ইবন উবাই ঃ এই প্রতিমাগুলোকে তৈরী করেছে মানুষ। মানুষ কিভাবে পূজনীয় হতে পারে?

আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) ঃ আফসোস! সেসব লোকের উপর যারা এতটুকু চিন্তা করতে পারে যে, মানুষ উপাস্য হতে পারে না। অথচ তারা এতটুকু ফিকির করে না যে, মানুষের বানানো প্রতিমাগুলো কিভাবে উপাস্য হতে পারে।

ইবন উবাই ঃ আপনি সত্য বলেছেন। আমরা কখনও এতটা গভীরে যেয়ে চিন্তা করিনি। এসব বিষয়ে গভীরভাবে লক্ষ্য করিনি।

আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) ঃ অতীতে যদি চিন্তা না করে থাকেন তাহলে এখন করুন।

ইবন উবাই ঃ আপনার আজকের আলোচনা আমার চক্ষু খুলে দিয়েছে। আমি আপনাকে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি অবশ্যই এসব বিষয় নিয়ে গভীরভাবে গবেষণা করবো।

আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) ঃ আল্লাহ আপনাকে সত্য পথ প্রদর্শন করুন।

ইবন উবাই ঃ যে কথাটি আমি বলতে এসেছিলাম, সেটি বলাই হলো না।

আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) ঃ বলে ফেলুন।

ইবন উবাই ঃ আমি জানতে পেরেছি, মক্কাবাসীদের উপর আক্রমণ করার জন্য রাসূলুল্লাহ (সাঃ) অভিযানে বের হতে যাচ্ছেন।

আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) ঃ আপনি ভুল শুনেছেন। ব্যাপারটি হলো, মক্কাবাসী আমাদের উপর আক্রমণ করার জন্য আসছে। আমরা যাচ্ছি তাদের প্রতিহত করতে।

ইবন উবাই ঃ বিষয়টি বোধ হয় তাই হবে। সারকথা, আপনারা মক্কাবাসীদের বিরুদ্ধে লড়তে যাচ্ছেন।

আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) ঃ এখনও আপনি ভুল বুঝেছেন। আমরা লড়তে যাচ্ছি না বরং আমাদের বিরুদ্ধে যারা লড়তে আসছে তাদের মুকাবিলা করতে যাচ্ছি। তারা যদি আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ না করে, পিছু হটে যায়, আমরাও তাদের বিরুদ্ধে লড়তে যাবো না। আমরা ফিরে চলে আসবো।

ইবন উবাই ঃ আমি বিষয়টি বুঝতে পেরেছি। আপনারা বোধহয় আনসারীদেরকেও নিজেদের সাথে নেয়ার জন্য প্রস্তুত করেছেন।

আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) ঃ আমরা তাদের উদ্বুদ্ধ করিনি। তারা নিজেরাই আমাদের সাথে যাওয়ার জন্য উদ্বুদ্ধ হয়েছেন।

ইবন উবাই ঃ কিন্তু আনসারীরা এই অভিযানে যেতে অপ্রস্তুত। তাদের মধ্যে বাদানুবাদ হচ্ছে। তারা বলতে চায়, আমাদের চুক্তি ছিলো কেউ যদি মদীনার উপর আক্রমণ করতে আসে তাহলে আমরা তাদের প্রতিহত করবো। বাইরে যেয়ে কেন আমরা যুদ্ধ করবো?

আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) ঃ ইবন উবাই! আপনার আলোচনা থেকে ফিতনার গন্ধ আসছে।

ইবন উবাই ঃ আমি সত্য বলছি।

আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) ঃ আনসারীদের প্রতি আমাদের পূর্ণ আস্থা আছে। তাঁরা কখনও এরূপ বলতে পারেন না। এসব কথা বলে আপনার কি মতলব?

ইবন উবাই ঃ এটাই যে, আপনারা তাদের ধর্তব্যে আনবেন না। আপনাদের কথায় তারা যদি রওয়ানাও করে তাহলেও পথিমধ্য থেকে প্রত্যাবর্তন করবে।

আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) ঃ তারা মুসলমান এবং পাক্কা মুসলমান। ইবন উবাই! আমরা তাদের প্রতি পূর্ণ আস্থা রাখি। আপনার শয়তানী কথাবার্তায় আমরা বিভ্রান্ত হবো না। ইবন উবাই এখানেও ক্ষিপ্ত হলো। ব্যর্থ হলো। লজ্জিত হয়ে এখান থেকে প্রত্যাবর্তন করলো।

৩২
মুজাহিদদের অভিযাত্রা

রাসূলে আকরাম (সাঃ) সাহাবায়ে কেরামকে যুদ্ধ প্রস্তুতির নির্দেশ দিলেন। সেদিন রাত্রে মদীনায় ঈদের রাত্রের মতো হৈচৈ হচ্ছিলো। বেশির ভাগ মুসলমান রাত্রে ঘুমাননি। একজন অপরজনের কাছে যাতায়াত দেখা সাক্ষাৎ করলেন। সামান্য কিছু সময় ঘুমিয়েছেন রাত্রের শেষ প্রহরে। সকালে আযান শোনা মাত্রই সবাই ঘুম থেকে জাগ্রত হয়েছেন। খুব দ্রুত নিজেদের মানবিক প্রয়োজন সেরে মসজিদে নববীতে পৌঁছলেন। দুই রাকাত সুন্নত নামায আদায় করলেন। অতঃপর জামাআত সহকারে দুই রাকাত ফরয নামায আদায় করলেন। সবাই নিরব হয়ে বসলেন নামায শেষে। কেউ কেউ ক্ষীণ আওয়াজে

কুরআন তেলাওয়াত করতে লাগলেন। সূর্যোদয়ের পর মহানবী (সাঃ) ইশরাকের নামায আদায় করলেন এবং অন্যান্য অনেক সাহাবীও ইশরাক পড়লেন।

নামায শেষে প্রিয়নবী (সাঃ) সাহাবায়ে কেরামকে সম্বোধন করে বললেন ঃ হে আমার সাহাবী সম্প্রদায়! তোমরা শুনেছো, মক্কা থেকে কাফিররা আমাদের উপর আক্রমণ করার জন্য আসছে। তোমরা এটাও শুনেছো যে, আবু সুফিয়ানের নেতৃত্বে কুরাইশের যে বাণিজ্যিক দলটি শাম থেকে আসছিলো তারাও মুসলমানদের হাত থেকে রক্ষা পেয়ে পালিয়েছে। আমরা তো কাফিরদের মুকাবিলা করার জন্য যাচ্ছি, কিন্তু বাণিজ্যিক কাফেলার সাথেও আমাদের দেখা হবার সম্ভাবনা রয়েছে। তাদের উপর আক্রমণও হতে পারে। অতঃপর মদীনায় আমাদের পরিবার–পরিজন থাকবে। তাদেরও রক্ষণাবেক্ষণের প্রয়োজন আছে। অতএব, কিছু লোককে মদীনায় থাকতে হবে। অতএব, যথার্থ কৌশলই অবলম্বন করতে হবে। যেসব পরিবারে একাধিক লোক রয়েছে, তাদের মধ্যে কেউ থাকবে কেউ যাবে। তোমাদের কি পরামর্শ এ ব্যাপারে?

আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) ঃ যদিও মদীনার মুশরিক এবং ইয়াহুদীদের সাথে চুক্তি হয়েছে তবুও তাদের ব্যাপারে কোন আস্থা রাখা সম্ভব নয়। কারণ, তারা বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারে। এজন্য প্রিয়নবী (সাঃ) যে বিষয়টি চিন্তা করেছেন সেটি সঙ্গত।

সাদ ইবন মুয়াজ (রাঃ) ঃ এ কথাটি আমিও বলতে চাচ্ছিলাম। রাত্রে যখন আমি বিছানায় আরাম করছিলাম তখন আমি এ বিষয়টি কল্পনা করেছিলাম।

প্রিয়নবী (সাঃ) এ বিষয়টি নিজেও উপলব্ধি করেছেন। বস্তুতঃ নবী করীম (সাঃ)এর প্রস্তাবই যথাযথ এবং নেহায়েত জরুরী।

আবু আইউব আনসারী (রাঃ) ঃ কিন্তু এই সিদ্ধান্ত নেয়া জটিল, এখানে কারা থাকবে আর কারা যাবেন নবীজীর সাথে?

প্রিয়নবী (সাঃ) ঃ এ বিষয়টি লোকদের মর্জির উপর ছেড়ে দেয়া উচিত।

হযরত উমর (রাঃ) ঃ সম্ভবতঃ জনসাধারণ এ বিষয়টি পরস্পরে মিমাংসা করতে পারবে না।

নবী করীম (সাঃ) ঃ এটা এমন কোন বিষয় নয় যে, নিজেরা সিদ্ধান্ত নিতে পারবে না।

হযরত উমর (রাঃ) ঃ যে পরিবারে দুইজন সেই পরিবার থেকে একজন যাবে, একজন এখানে থাকতে পারে। কিন্তু যে ঘরে দুইয়ের অধিক ব্যক্তি,

তারা কিভাবে সিদ্ধান্ত নিবে?

প্রিয়নবী (সাঃ) ঃ এর সমাধান এই হওয়া উচিত যে, যে ঘরে তিন ব্যক্তি থাকবে তাদের মধ্যে একজন এখানে থাকবে। যে পরিবারে চার ব্যক্তি তন্মধ্যে দুইজন এখানে থাকবে। পাঁচজন হলেও দুজন থাকবে। ছয় অথবা সাত জন হলে তিন জন থাকবে।

আউস ঃ এ বন্টনও যথার্থ।

নবী করীম (সাঃ) ঃ যেহেতু সবাই উপস্থিত আছে তাই এখনই বাছাইয়ের কাজটা হয়ে যাক। বাছাইয়ের সময় বাদানুবাদ শুরু হলো। সবাই চান রাসূলে কারীম (সাঃ)এর সাথে যেতে। এ নিয়ে বাক-বিতণ্ডা হলো। এমনকি বাদানুবাদ শুরু হলো ভাইয়ে ভাইয়ে, পিতা-পুত্রে। হযরত সাদ (রাঃ) এবং তার পিতা হযরত হুশাইমার বাক-বিতণ্ডা দীর্ঘতর হলো। সাদ (রাঃ) স্বীয় পিতা হুশাইমাকে বললেন ঃ প্রিয় আব্বু! আমি আপনার অনুগত সন্তান। অতীতেও আমি কোন অবাধ্যতা করিনি, ভবিষ্যতেও করবো না। এ মুহূর্তে একটাই আবেদন করতে চাচ্ছি আপনার দরবারে।

হুশাইমা ঃ প্রিয় বৎস! আমি বুঝতে পেরেছি তুমি কি দরখাস্ত করতে চাও। তোমার যে আরযু, আমারও তাই আকাংখা। প্রিয়নবী (সাঃ)এর সাথে আমি যেতে চাই। তুমি আমাকে যেতে দাও।

সাদ ঃ আমি গণীমতের মাল চাই না, নাম-সুনাম চাই না। সুখ্যাতির কাঙ্গাল নই আমি। আমি চাই জান্নাত। শহীদ হলে বিনা হিসাব-কিতাবে জান্নাত পাওয়া যায়। জিহাদ করলে শাহাদাত নসীব হয়। কোন পার্থিব স্বার্থ হলে আমি আপনার ব্যাপারে কোন প্রকার হস্তক্ষেপ অবশ্যই করতাম না। কিন্তু ব্যাপারটি তো সম্পূর্ণ পরকালীন। অনুগ্রহপূর্বক আপনি আমাকে এ থেকে বঞ্চিত করবেন না। (১. তারীখে আলমে ইসলাম ঃ ১ম খণ্ড।)

হুশাইমা ঃ প্রিয় বৎস! তুমি যুবক, আমি বৃদ্ধ। তোমার জীবনে কত জিহাদেরই তো সুযোগ আসতে পারে। আর আমার তো এক পা কবরে চলে গেছে। জানিনা কখন আমার মৃত্যু এসে যায়, আর জিহাদের সওয়াব থেকে বঞ্চিত হয়ে যাই। অতএব, তুমি আমাকে যেতে দাও।

সাদ ঃ আপনি জানেন, রাসুলুল্লাহ (সাঃ)-এর নেতৃত্বাধীন তাঁর পতাকাতলে এ-ই হচ্ছে প্রথম জিহাদ। এই জিহাদে অংশগ্রহণ আমার মনের বিরাট সাধ। এবার আমাকে যেতে দিন। যদি আমি জীবন্ত ফিরে আসি তাহলে আপনার সাথে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ—ভবিষ্যতে কখনও আমি আর এরূপ জেদ ধরবো না।

হুশাইমা ঃ আমার মনোবাসনা ছিলো তুমি তোমার মা এবং স্ত্রীর কাছে

থাকো। তাদের এবং মুসলমানদের পরিবার–পরিজনদের রক্ষণাবেক্ষণ করো। যুবকরা এ কাজ ভালো করে আঞ্জাম দিতে পারে।

সাদ ঃ পরিবারের দেখাশুনা বয়স্করাই ভালো করতে পারেন। যুদ্ধ করা তো যুবকদের কাজ।

হুশাইমা ঃ আরে একটু লক্ষ্য তো করবে। বিশ্ববাসী কি বলবে যে, ছেলেকে জিহাদের জন্য পাঠিয়ে দিয়ে নিজে ঘরে বসে আছে।

সাদ ঃ আব্বু! আমি যদি না যাই, তাহলে এ বদনামীর কলংক আমার মাথায় লাগবে। সবাই বলবে, বৃদ্ধ বাপকে যুদ্ধে প্রেরণ করে একটি তাগড়া যুবক ঘরে বসে আছে। আপনি বলুন, আমি লোকসমাজে মুখ দেখাতে পারবো?

হুশাইমা ঃ আচ্ছা, তাহলে দুজনই চলো।

সাদ ঃ এটাও সম্ভব নয়। কারণ, প্রথম তো মেয়েদের কাছে আমাদের দুজনের কোন একজন থাকা আবশ্যক। দ্বিতীয়তঃ রাসূলুল্লাহ (সাঃ)এর নির্দেশ, একজন বাড়ীতে থাকবে আরেকজন জেহাদে যাবে। প্রিয়নবী (সাঃ)এর আদেশ কিভাবে অমান্য করবো আমরা।

হুশাইমা ঃ প্রিয় বৎস! তাহলে কি করা যাবে?

সাদ ঃ আপনি আমায় অনুমতি দিন।

হুশাইমা ঃ আচ্ছা, ঠিক আছে তাহলে একটা কাজ করো, লটারী দাও।

সাদ ঃ রাসূলুল্লাহ (সাঃ)–এর নিকট থেকে এর অনুমতি নিতে হবে।

হুশাইমা ঃ ঠিক আছে, নিয়ে এসো।

তারা উভয়েই প্রিয়নবী (সাঃ)এর দরবারে হাজির হলেন। সেখানে গিয়ে দেখলেন, এই ধরনের আরো বহু মুকাদ্দমা নিয়ে অনেকেই হাজির হয়েছে। হুশাইমাও নিজের এবং সাদ (রাঃ)এর বিষয়টি পেশ করলেন। দরখাস্ত করলেন, তাদের লটারীর অনুমতি দিতে।

প্রিয়নবী (সাঃ) লটারীর অনুমতি দিলেন। লটারীতে নাম আসলো হযরত সাদ (রাঃ)–এর। তিনি খুব আনন্দিত হলেন। হুশাইমা বললেন ঃ আমি অন্যায়ভাবেই তোমার সাথে বাদানুবাদে লিপ্ত হয়েছি। এই সৌভাগ্য তোমারই। যাও, আল্লাহ তোমার তামান্না পূর্ণ করুন।

ছেলে সম্মানিত পিতার হস্ত চুম্বন করলেন। অতঃপর যাদের মধ্যে এই বিষয় নিয়ে বাদানুবাদ চলছিলো, তারাও এরূপ লটারী দিলেন। লটারীতে যাদের নাম আসলো না, তারা সবাই হতাশ হলেন।

প্রিয়নবী (সাঃ) ঃ তোমরা সবাই প্রস্তুত হয়ে মসজিদের সামনে সমবেত হও। আমি আমার অসুস্থা কন্যা রুকাইয়্যাকে একটু দেখে আসি।

প্রিয়নবী (সাঃ)এর আদরের দুলালী হযরত রুকাইয়্যা (রাঃ) দীর্ঘদিন ধরে অসুস্থ ছিলেন। তাঁর বিবাহ সম্পন্ন হয়েছিলো হযরত উসমান গণী (রাঃ)–এর সাথে। হযরত উসমান গণী (রাঃ) ছিলেন বিশাল বিত্তবৈভবের মালিক। প্রিয়নবী (সাঃ) মসজিদ থেকে উঠে হযরত উসমান (রাঃ)–এর বাড়ী পৌঁছলেন। যদিও তখন পর্দার হুকুম নাযিল হয়নি, মহিলারা বোরখাবিহীন যাতায়াত করতো এবং এরূপ কামিজ পরিধান করতো যেগুলো গলা থেকে বুক পর্যন্ত ফাড়া থাকতো। সে হিসাবে শুধু চেহারাই নয়, গলা এবং সিনা পর্যন্ত নজরে আসতো। তবে রাসূলুল্লাহ (সাঃ)এর এ নিয়ম ছিলো, যখন তিনি ঘরে অথবা কোন কন্যার বাড়ীতে যেতেন তখন দরজায় দাঁড়িয়ে অনুমতি প্রার্থনা করতেন। অনুমতি পেলে ঘরের অভ্যন্তরে প্রবেশ করতেন। এর উপকারিতা ছিলো এই যে, ঘরের মধ্যে মেয়েলোক কে কি অবস্থায় আছে, তাতো জানা নেই। বিনা অনুমতিতে হঠাৎ করে প্রবেশ করলে হয়ত কারো কোন কষ্ট হতে পারে, অথবা হতে পারে লজ্জিত।

আফসোস! আজকে মুসলমানরা প্রিয়নবী (সাঃ)এর এই সুন্নতের উপর খুবই কম আমল করে থাকে। তারা মনে করে আমাদেরই ঘর, আমাদের বাড়ী, যখন ইচ্ছে চলে যাবো। এটা ঠিক যে, সেটা নিজের ঘর, যখন ইচ্ছে যেতে পারবে তবে নবীর সুন্নতের উপর আমল করা শুধু ভালই নয় বরং আবশ্যক। কেউ কেউকে বলতে শুনেছি যে, তারা এরূপ আকস্মিক ঘরে প্রবেশ করে লজ্জা পেয়েছে।

যাহোক, প্রিয়নবী (সাঃ) গৃহের দরজায় দাঁড়িয়ে প্রথমতঃ অনুমতি প্রার্থনা করলেন। হযরত উসমান (রাঃ) বাইরে বেরিয়ে আসলেন। নবীজী (সাঃ)কে সাথে নিয়ে তিনি ঘরে প্রবেশ করলেন। নবীজীর প্রিয় কন্যা হযরত রুকাইয়্যা (রাঃ) গৃহে সাধারণ একটি বিছানার উপরে পড়ে আছেন। গায়ে তাঁর জ্বর। আনমনা অবস্থায় পড়ে আছেন। প্রিয়নবী (সাঃ)এর কদম মুবারকের আওয়াজ শুনে তিনি জাগ্রত হলেন। নবীজীকে দেখে সালাম করলেন। সালামের জওয়াব দিলেন নবীজী। বসে পড়লেন তাকিয়ার পাশে। কপালের উপর হাত রেখে আন্দাজ করলেন জ্বর কি পরিমাণ। কুশলাদি জিজ্ঞেস করলেন। দম করলেন কিছু দুআ পড়ে। প্রিয় কন্যাকে লক্ষ্য করে বললেন ঃ আদরের দুলালী! আমি জিহাদে রওয়ানা হচ্ছি। লোকজন প্রস্তুত। আমি বেশীক্ষণ দেরী করতে পারছি না।

হযরত রুকাইয়্যা (রাঃ) আফসোসের দৃষ্টিতে প্রিয়নবীর চেহারার দিকে তাকালেন। হযরত উসমান (রাঃ) আরয করলেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাকেও সাথে নিয়ে চলুন।

প্রিয়নবী (সাঃ) ঃ রুকাইয়্যা অসুস্থ। তুমি রুগীর শুশ্রূষায় এখানেই থেকে যাও।

প্রিয়নবী (সাঃ) ওখান থেকে মসজিদে তাশরীফ নিয়ে এলেন। ইত্যবসরে সবাই এসে উপস্থিত হলেন। হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) সেই ঝাণ্ডাটি হাতে নিলেন যেটি নবী করীম (সাঃ) তৈরী করেছিলেন হযরত উবাইদা (রাঃ)–এর জন্য। নবী করীম (সাঃ) হযরত আবু লুবাবা ইবন মুনযির (রাঃ)কে মদীনার শাসক নিয়োগ করলেন। অর্থাৎ, নিজের স্থলাভিষিক্ত বানালেন। মদীনার ঊর্ধ্বাংশ যাকে আলিয়া বলা হয়, তার আমীর নিযুক্ত করলেন হযরত আসিম ইবন আদী (রাঃ)কে।

রাসূলে আকরাম (সাঃ) সামনে কদম বাড়ালেন। হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) ঝাণ্ডা হাতে নিয়ে উত্তোলন করলেন। পত্ পত্ করে পতাকা উড়ছে। সমস্ত সাহাবায়ে কেরাম সজোরে আল্লাহু আকবার ধ্বনি তুললেন।

সাহাবায়ে কেরাম জাঁকজমকে জিহাদে রওয়ানা করলেন। পৌত্তলিক এবং ইয়াহুদীরা তাদের দিকে চোখ তুলে তাকাতে লাগলো।

৩৩
জিহাদের স্পৃহা

১২ই রমযানুল মুবারক ২য় হিজরীর রোববার দিন। প্রিয়নবী (সাঃ) মুজাহিদীনে ইসলামকে সাথে নিয়ে মদীনায়ে মুনাওয়ারা থেকে রওয়ানা হলেন। এই সৈন্যবাহিনীর সাথে অল্পবয়স্ক কিছু বালক সাহাবী ছিলেন। তাদের বাপ–ভাইয়েরা যতই তাদেরকে বুঝিয়ে শুনিয়ে উপদেশ দিয়ে বাড়ীতে রেখে যাওয়ার চেষ্টা করলেন কিন্তু তারা ফিরলেন না। বরং খোষামোদ–তোষামোদ করে তারা সেনাবাহিনীর সাথেই রয়ে গেলেন।

বুয়ুতুস সাকইয়া একটি জনপদের নাম। এটি মদীনার সংলগ্ন কুবা এলাকার সন্নিকটে। নবী করীম (সাঃ) সেখানে বালক সাহাবীদেরকে নিজের সামনে তলব করলেন। বালকের সংখ্যা ছিলো অনেক। কোন কোন ঐতিহাসিক বালকদের সংখ্যা ৬০ বলে উল্লেখ করেছেন। তন্মধ্যে বিখ্যাত লোকদের যেসব বালক সন্তান ছিলেন তাদের নামের তালিকা নিম্নরূপ ঃ

১। আবদুল্লাহ ইবন উমর ইবন খাত্তাব (রাঃ)

২। উসামা ইবন যায়েদ (রাঃ)

৩। রাফে ইবন খাদীজ (রাঃ)

৪। বারা ইবন আযিব (রাঃ)

৫। উসাইদ ইবন হুযাইর (রাঃ)

৬। যায়েদ ইবন আরকাম (রাঃ)

৭। যায়েদ ইবন সাবিত (রাঃ)

৮। উমায়র ইবন আবিস (রাঃ)

তাছাড়া আরো অনেক ছিলেন মহিলা। সবাই নবী করীম (সাঃ)এর কথার প্রতি খুব গুরুত্বারোপ করতেন। তাঁর কথা মেনে চলতেন। রাসূলে আকরাম (সাঃ) বালকদেরকে নিজের সম্মুখে তলব করলেন, হযরত বেলাল হাবশী (রাঃ) গোটা বাহিনীতে এ হাজিরার ঘোষণা দান করলেন। ঘোষণা শোনামাত্রই সমস্ত বালক সাহাবী প্রিয়নবী (সাঃ)এর সামনে এসে হাজির হলেন। নবীজী (সাঃ) তাদের দেখে বললেন ঃ প্রিয় বৎসরা! তোমরা এখনো কমবয়স্ক। তোমাদের যাবার প্রয়োজন নেই। তোমরা বাড়ীতে ফিরে যাও।

এতদশ্রবণে সবাই নিশ্চুপ হয়ে গেলেন। কেউ কোন কথা আরয করার সাহস পেলেন না। কিন্তু তাদের অন্তরে ছিলো জিহাদী জোশ, শাহাদাতের স্পৃহা। এজন্য তাদের মনের আকাংখা ছিলো, যে যত কিছুই বলুক সব কথা শোনার পরেও তাদেরকে যেন অনুমতি দেয়া হয়। অতএব, হযরত উমায়ের (রাঃ) আরয করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! জিহাদে যাবার বড়ই আকাংখা আমাদের অন্তরে। আপনি যদি আমাদের ফেরত পাঠান তাহলে আমাদের মন ভেঙ্গে যাবে।

প্রিয়নবী (সাঃ) ঃ তোমরা এখনো কমবয়স্ক। কখনও যুদ্ধে অংশগ্রহণ করোনি। তোমাদের জানা নেই যুদ্ধের আগুন কত তেজ ও প্রচণ্ড। কত দ্রুত এ অগ্নি দাউ দাউ করে জ্বলে উঠে। আগুনের লেলিহান শিখা ছড়িয়ে পড়ে। কেউ তার আওতায় আবদ্ধ হলে জ্বলে পুড়ে ভষ্ম হয়ে যায়।

উমায়ের ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা যুদ্ধের বহু উপাখ্যান শুনেছি। আমরা জানি, লড়াইয়ের সূচনা কিভাবে হয় এবং পরবর্তীতে কি রূপ ধারণ করে। আমাদের অন্তরে শাহাদাতের আকাংখা। আমরা শহীদ হলে কি জান্নাতের উপযুক্ত হবো না?

প্রিয়নবী (সাঃ) ঃ হবে না কেন? আল্লাহর রহমত ব্যাপক। যারা শুধুমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনে জিহাদ করে, চাই পুরুষ হোক কিংবা মহিলা বা বালক, শাহাদত লাভ করলে জান্নাতে যাওয়া তার জন্য সুনিশ্চিত।

উমায়ের ঃ তাহলে আমাদের অনুমতি দিন। আমরা শহীদ হয়ে জান্নাতে প্রবেশ করতে চাই।

প্রিয়নবী (সাঃ) ঃ প্রিয় বৎসরা! তোমাদের এখনও বয়স হয়নি। খুব সম্ভব যুদ্ধের ভয়াবহতা দেখে তোমরা পালাতে আরম্ভ করবে। যারা রণক্ষেত্র

থেকে পলায়ন করে আল্লাহ তাদের প্রতি অসন্তুষ্ট হন। এর ফলে তোমরা সওয়াবের স্থলে গুনাহ অর্জন করবে।

উমায়ের ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা জান দেব কিন্তু আমাদের কদম পিছু হটবে না। বস্তুতঃ আমাদের মনের আকাংখা হচ্ছে, আপনি আমাদের মুরুব্বীদের নিয়ে একদিকে থাকুন। আর মক্কার নিয়ন্ত্রণহীন তথাকথিত সম্মানিত নেতাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য আমাদেরকে অনুমতি দিন। আমরা তাদের শিক্ষা দিয়ে ছাড়বো। প্রমাণ করবো যে, আল্লাহর বান্দা এবং রাসূলের গোলাম, ইসলামপ্রিয়, ধর্মের জন্য উৎসর্গকৃত যুবকরা কত বড় বীরবাহাদুর হয়ে থাকে।

প্রিয়নবী (সাঃ)এর নিকট তার কথাগুলো খুবই ভালো লাগলো। তিনি বললেন, আমার স্নেহের যুবকরা! তোমাদের এই জিহাদী জোশ শত সহস্র প্রশংসার যোগ্য। মুসলমান প্রতিটি নর–নারী এবং বালকের অন্তরে জিহাদের এরূপ স্পৃহা থাকা উচিত। জিহাদের এই জোশ–স্পৃহা ঈমানী শক্তির প্রমাণ। তবে যে যুদ্ধে আমরা যাচ্ছি সেটি হচ্ছে ইসলাম ও কুফরের প্রথম যুদ্ধ। আল্লাহ ভালো জানেন, এই যুদ্ধের পরিণাম কি। এইজন্য তোমরা বাড়ীতে চলে যাও। এটাই তোমাদের জন্য শ্রেয়।

রাফে ইবন খাদীজ (রাঃ) ঃ প্রিয়নবী (সাঃ)এর আনুগত্য আমাদের উপর ফরয। তবে ফিরে গেলে আমাদের মনে কষ্ট হবে। আমরা নিরাশ হবো।

প্রিয়নবী (সাঃ) ঃ আচ্ছা, ঠিক আছে তাহলে তোমরা দাঁড়াও। আমি নেজার উপর চিহ্ন দিচ্ছি। যাদের দেহ এ পরিমাণ লম্বা হবে তারা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে পারবে। এই বলে নবী করীম (সাঃ) নেজার মধ্যে চিহ্ন লাগালেন এবং বালকদের মাপতে আরম্ভ করলেন। অনেকেই চিহ্নিত দাগ সমান দীর্ঘ হলেন না। তারা মাপে টিকলেন না। রাফে ইবন খাদীজের পালা আসলো—তিনি প্রিয়নবী (সাঃ)–এর হাত থেকে নেজাটি নিজে নিয়েই নিজের দেহ পরিমাপ করতে আরম্ভ করলেন। তার দেহ সামান্য একটু ছোট ছিলো মাপের তুলনায়। এই দেখে তাড়াতাড়ি তিনি পায়ের পাঞ্জার উপর দাঁড়িয়ে মাপ নিলেন। প্রিয়নবী (সাঃ)কে সম্বোধন করে তিনি বললেন, দেখুন, আমার দেহ মাপে টিকে গেছে। প্রিয়নবী (সাঃ)এর নিকট তাঁর এই বিচক্ষণতা ভীষণ পছন্দ হলো। তিনি মুচকি হাসলেন। বললেন, তোমার এই বিচক্ষণতা প্রশংসার দাবীদার। জিহাদের স্পৃহা তোমাকে এই বিচক্ষণতা শিখিয়েছে। যাও তোমাকে অনুমতি দিলাম, তুমি মুজাহিদদের অন্তর্ভুক্ত।

এতদশ্রবণে রাফে ইবন খাদিজ এতই আনন্দিত হলেন যেন দুনিয়ার বিশাল দৌলত পেয়ে গেছেন।

এলো উমায়ের ইবন ওয়াক্কাসের পালা, তার দেহও মাপের তুলনায় কিছুটা ছোট ছিলো। নবীজী (সাঃ) তাঁকে প্রত্যাবর্তনের নির্দেশ দিলেন। ফলে উমায়ের কাঁদতে আরম্ভ করলেন। তার কান্না নবীজীর অন্তরে ভীষণ প্রভাব বিস্তার করলো। ফলে তিনি তাকে সাথে যাওয়ার অনুমতি দিলেন। তিনিও খুব খুশী হলেন। তাঁর বড় ভাই সাদ তাঁর গলায় তরবারী ঝুলিয়ে দিলেন।

আরেকটি বালককে পরিমাপ করার পর নবীজী বললেন ঃ তুমি এখনো ছোট। বালক সাহাবী আরয করলেন, আমি উমায়ের থেকে বড়। আপনি মাপুন। নবী করীম (সাঃ) তাকে উমায়ের (রাঃ)এর সাথে দাঁড় করালেন। সে সাহাবী পায়ের পাঞ্জার উপর উঁকি মেরে দাঁড়ালেন। ফলে, উমায়ের-এর তুলনায় এক ইঞ্চি বড় প্রমাণিত হলেন। তাঁর এই আচরণও নবীজীর (সাঃ) কাছে খুব পছন্দ হলো। তাকেও নবীজী (সাঃ) মুজাহিদদের অন্তর্ভুক্ত করলেন।

আরেক বালক আরয করলেন, আমি উমায়ের অপেক্ষা অধিক শক্তিশালী এবং বীরবাহাদুর। নবী করীম (সাঃ) উমায়েরের সাথে তাঁকে কুস্তিতে লাগিয়ে দিলেন। এই বালক হযরত উমায়ের (রাঃ)কে ধরাশায়ী করে ফেললেন। প্রিয়নবী (সাঃ) তাকেও সাথে নিয়ে নিলেন। অন্যান্যদের দিলেন ফেরত।

(তারীখে ইসলাম ঃ ১ম খণ্ড ঃ পৃষ্ঠা ২৭।)

রাসূলে আকরাম (সাঃ) মুসলিম মুজাহিদদের সংখ্যা গণনা করে দেখলেন। সর্বমোট ৩১০ জন। অবশ্য ঐতিহাসিক গ্রন্থাবলীতে ৩১৩-র কথা উল্লেখ রয়েছে। এদের মধ্যে কারো নিকটই লৌহবর্ম ছিলো না। না ছিলো পূর্ণাঙ্গ অস্ত্র-শস্ত্র। কারো কাছে তলোয়ার থাকলে নেজা ছিলো না, নেজা থাকলে তলোয়ার ছিলো না। তীর-কামানও সবার কাছে ছিলো না। সওয়ারীগুলোর মধ্যে ছিলো ৭০টি উট, ২টি ঘোড়া। ১টি অশ্ব ছিলো হযরত যুবাইর (রাঃ)-এর, অপরটি মিকদাদ (রাঃ)-এর।

৩১৩ জন মুজাহিদের মধ্যে ৮০ জন ছিলেন মুহাজির আর ২৩৩ জন ছিলেন আনসার।

জোহরের নামাযের সময় হলো। হযরত বেলাল (রাঃ) আযান দিলেন। কূপের পানি দ্বারা সবাই অযু করলেন। নামায পড়লেন জামাতে। প্রিয়নবী (সাঃ) নামায পড়ে মদীনাবাসীদের জন্য দুআ করলেন—আয় আল্লাহ! তোমার বান্দা, তোমার বন্ধু, তোমার নবী হযরত ইবরাহীম (আঃ) মক্কাবাসীদের জন্য দুআ করেছেন। আর তোমার বান্দা, তোমার নবী মুহাম্মাদ দুআ করছে মদীনাবাসীদের জন্য। তুমি তাদের উপর বরকত নাযিল করো। তাদের সা এবং মুদ্দে (পরিমাপের নির্ধারিত ওজন) এবং তাদের ফলগুলোতে, তাদের

শস্যদানায়। হে পরওয়ারদিগার! মদীনাকে আমাদের প্রিয় বানিয়ে দাও। তার প্রতি আমাদের আকর্ষণ সৃষ্টি করো। মদীনায় যেসব বিপদ–আপদ, বালা–মুসিবত রয়েছে সেগুলো লাখমের দিকে স্থানান্তরিত করো (লাখম একটি স্থানের নাম)। হে আমার পরওয়ারদিগার! মদীনার দুই প্রস্তরময় উপত্যকার মধ্যবর্তী জায়গাকে আমি নিরাপদ হেরেম স্থির করেছি, যেমনিভাবে তোমার দোস্ত হযরত ইবরাহীম (আঃ) মক্কাকে হেরেম স্থির করেছেন।

এই স্থানটিতে মাসউদও এসে পৌঁছে গেলো। পৌঁছুলো আদী ইবনুর রাগবাও। তখন আবদুল্লাহ ইবন আমর হুযূর (সাঃ)এর খিদমতে হাজির হলেন। তিনি আরয করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এই স্থানটিতে অবস্থান করুন। সেনাবাহিনীর খবর নিন। আমাদের অন্তরে জিহাদের পূর্ণ স্পৃহা বিদ্যমান। এটি একটি শুভলক্ষণ যে, বনী সালামা যখন মক্কার ইয়াহুদীদের উপর আক্রমণ করেছিলো তখন এই স্থানটিকেই মনযিল বানিয়েছিলো। এখানেই তাদের সৈন্যদের সম্পর্কে খোঁজখবর নিয়েছিলো। যারা যুদ্ধের উপযোগী নয় সেসব লোককে এখান থেকেই বিদায় দেয়া হয়েছে। যারা যুদ্ধের উপযুক্ত এখানেই তাদের হাতে অস্ত্র–শস্ত্র বন্টন করে দেয়া হয়েছে।

ইয়াহুদীরা যখন মক্কার দিকে রওয়ানা হলো অথচ তারা ধনসম্পদ, জাঁকজমক, ব্যবসা–বাণিজ্য এবং জনবলের দিক দিয়ে সবার শীর্ষে ছিলো, তা সত্ত্বেও বনী সালামা তাদের উপর বিজয় লাভ করেছিলো। মক্কার ইয়াহুদীরা পরাস্ত হয়েছিলো চিরতরে। আল্লাহ যদি ইচ্ছা করেন তাহলে ইসলামের শত্রুরাও পরাস্ত হবে। পূর্বে যেমন আমরা প্রফুল্ল হয়েছিলাম, এরূপ ভাবেই মুসলমানরা আনন্দিত হবে। আল্লাহ তা'আলা আপনার আঁখিযুগলকে ঠাণ্ডা করবেন।

প্রিয়নবী (সাঃ) ঃ আমরা অশুভ বলতে কোন জিনিসে বিশ্বাসী নই। তবে আল্লাহ তা'আলার কাছে আশা করি ইসলামেরই বিজয় হবে।

১২ই রমযানুল মুবারক, ২ হিজরী, রোববার দিন প্রিয়নবী (সাঃ) আসরের নামায পড়ে সৈন্যদেরকে যাত্রার নির্দেশ দিলেন। মুসলমানরা পূর্বেই প্রস্তুত ছিলেন। হুকুম পাওয়ামাত্র রওয়ানা হলেন। সাবাহায়ে কেরাম ছিলেন আনন্দিত, প্রফুল্ল। তাঁদের মনে আনন্দের জোয়ার বইছে। যেন কোথাও থেকে ধনসম্পদ আনতে যাচ্ছেন।

সাবাহায়ে কেরাম উচ্চস্বরে নারায়ে তাকবীর—আল্লাহু আকবার ধ্বনি তুললেন এবং নিয়মিত সেনাবাহিনীর মতোই পথ অতিক্রম করতে লাগলেন।

৩৪

আবু সুফিয়ানের কাফেলা

আবু সুফিয়ান যমযমকে প্রেরণ করার পর নিজেও বাণিজ্যিক কাফেলার সাথে খুব দ্রুত রওয়ানা হলো। তার আশংকা ছিলো যদি মুসলমানরা তাদের উপর আক্রমণ করে, লুণ্ঠন চালায় তাহলে তার সাথী-সঙ্গীরা মুসলমানদের সাথে কুলিয়ে উঠতে পারবে না। কাফেলা লুণ্ঠিত হবে নির্ঘাত। তাই খুব দ্রুত কোন মনযিলের তোয়াক্কা না করে পথ অতিক্রম করছিলো। এ কারণেই মুসলমানদের হাত থেকে তারা রক্ষা পেয়ে যায়। মুসলমানরা তাদের উপর আক্রমণ করতে পারেনি।

আবু সুফিয়ান ছিলো চৌকান্না-বিচক্ষণ। সে আগে-পিছে অনেক গোয়েন্দা পাঠিয়েছে মদীনার দিকে। তাদের নির্দেশ দিয়েছে দূর থেকে মুসলমানদের দেখলেই দৌড়ে এসে আমাদের সংবাদ দিবে। গোটা কাফেলার মধ্যে মুসলমানদের আক্রমণের ভয় ভীতি ছড়িয়ে পড়েছিলো। তাদের মনে এই ফিকির এতটাই বিস্তার করেছিলো যে, খাওয়া-দাওয়া, আরাম-বিশ্রাম কিছুতেই তাদের মন বসছিলো না। চিন্তায় তারা অস্থির হয়ে পড়ছিলো। আরামের সময়, খাওয়ার সময়, ঘুমানোর সময় যখনই মুসলমানদের কথা মনে আসতো তখন যেন বুকের উপর কেউ ঘুষি মারতো। খাওয়া-দাওয়া বিশ্রাম ছেড়ে দিয়ে উঠে যেতো।

এই অবস্থা শুধু জনসাধারণের মধ্যেই ছিলো না বরং বড় বড় নেতা এমনকি আবু সুফিয়ানেরও ছিলো এই অবস্থা। যতই তারা মদীনার নিকটবর্তী হচ্ছিলো, উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা ততই তাদের বৃদ্ধি পাচ্ছিলো। অবশেষে তারা এসে পৌঁছলো বদরের সন্নিকটে। ওখানে এসে 'রাওহা' নামক স্থানে তারা অবস্থান করলো। এখানে এসে তাদের পেরেশানী বৃদ্ধি পেলো বহুগুণে। বিদঘুটে অন্ধকার রাত্র। চতুর্দিকে অন্ধকার ছেয়ে আছে। বার বার আশংকা হচ্ছিলো না জানি মুসলমানরা নিকটে কোথাও অবস্থান নিয়েছে। আবু সুফিয়ান বিশেষ বিশেষ কয়েকজন লোককে নিজের কাছে ডাকলো। সে রাত্রে আবু সুফিয়ান মুসলমানদের ভয়ে তাঁবুও স্থাপন করেনি। একটি কার্পেটের উপরে আবু সুফিয়ান উপবেশন করে আছে। ৫/৬ ব্যক্তি তার কাছে আসলো। তন্মধ্যে ছিলো আমর ইবন আস, মাখরামা ইবন নাওফল। আবু সুফিয়ান বললো, এ পর্যন্ত তো ভালোয় ভালোয় সময় অতিক্রান্ত হলো। বদবখত মুসলমানদের সম্মুখীন হতে হলো না। কিন্তু এখন আমরা এমন একটি স্থানে এসে পৌঁছেছি যেখানে মুলকে শামের রাস্তা এবং মদীনার পথ দু'টোই মিলিত হয়েছে মক্কার

পথে। আশংকা হচ্ছে কোথাও বদরের কাছে মুসলমানরা ঘাপটি মেরে বসে আছে কিনা। আমরা সেখানে পৌঁছলে অকস্মাৎ হয়তো তারা হামলা করতে পারে। এছাড়া অন্য কোন পথও নেই যে পথ অবলম্বন করে আমরা মক্কায় পৌঁছে যেতে পারবো। অতএব, আমাদের পরামর্শ দাও, এ মুহূর্তে আমাদের করণীয় কি?

আমর ইবনুল আস ঃ আপনি আজকে বলছেন। আমার কয়েক দিন থেকে মুসলমানদের পক্ষ থেকে আক্রমণের বিরাট আশংকা হচ্ছিলো। বদরের এই শস্য–শ্যামল এলাকা আমাদের অতি দ্রুত ছেড়ে যাওয়া উচিত। সম্ভবতঃ আমরা বদর পেরিয়ে এসেছি। তা সত্ত্বেও বদরের আশপাশের এলাকাও আমাদের অতিক্রম করে যাওয়া উচিত। উচিত হলো কয়েকজন বিচক্ষণ বীর বাহাদুর বদর পর্যন্ত যেয়ে দেখে আসবে। দুশমনরা কোথাও গুপ্ত ঘাঁটিতে অবস্থান নিয়েছে কিনা।

মাখরামা ঃ আমার সিদ্ধান্তও তাই। আমার আশংকা মুসলমানরা বদর, অথবা বদরের নিকটবর্তী কোথাও অবশ্যই অবস্থান করে থাকবে। আমাদের আগমনের দিন–ক্ষণ তারা হিসাব করে রাখবে। যদি জানা যায় যে, মুসলমানরা কোথাও নিকটেই অবস্থান করছে, তাহলে ফিরে যেয়ে আমরা 'তাবুকে' অবস্থান করবো। আর তারা যদি নিকটবর্তী না থাকে তাহলে বদরের কাছ দিয়েই আমরা বেরিয়ে যাবো।

আবু সুফিয়ান ঃ আমাদের সাথী–সঙ্গীরা মুসলমানদের ব্যাপারে খুবই ভীত–সন্ত্রস্ত। কাজেই সংবাদ নেয়ার জন্য তাদের কাউকে পাঠানো নিরাপদ নয়। তাদের উপর ভরসা করা যায় না। হয়তো ভয় পেয়ে পথিমধ্য হতেই ফিরে এসে এমনিই সংবাদ দিবে এবং আমাদেরকে প্রশান্ত করবে। কিংবা ভয়–ভীতি দেখাবে। অতএব, চলো, আমি এবং তোমরা দুজন (আমর ইবনুল আস, মাখরামা) উটের উপর আরোহণ করে রাত্রে বদর পর্যন্ত যেয়ে ঘুরে আসবো। এটাই ভাল মনে হয়।

আমর এবং মাখরামা উভয়েই তৈরী হলো।

আবু সুফিয়ান ঃ আমতা আমতা করে বললো, আচ্ছা ঠিক আছে, চলো এখন যেয়ে শুয়ে থাকি। সকালের খানিকটা আগে যেয়ে দেখে আসবো।

দুজন উঠে চলে গেলো। আবু সুফিয়ান দিক নির্দেশনা দিলো যে, উটগুলোর মুখ থেকে যেন কোন শব্দ বের না হয়। অন্যথায় শত্রু নিকটবর্তী থাকলে তারা টের পেয়ে যাবে। তারা আক্রমণ করতে পারে। এই দিকনির্দেশনার পর উটগুলোকে নিরব রাখার জন্য বিভিন্ন রকমের কৌশল অবলম্বন করা হলো। রাত্রের কিছুক্ষণ অতিক্রান্ত হলো। গোটা কাফেলার সবাই ঘুমিয়ে পড়লো।

চোখ খুললো আবু সুফিয়ানের। দেখলো সকাল হয়ে গেছে। ভীত–সন্ত্রস্ত হয়ে সে ঘুম থেকে উঠলো। আমর ইবনুল আস, মাখরামাও তখন এসে পৌঁছলো। তিনজনই নিজ নিজ সওয়ারীর উপর আরোহন করে রওয়ানা করলো বদর অভিমুখে। বদর সেখান থেকে মাত্র কয়েক মাইল দূরে।

সেদিনেরই এক ঘটনা। আবু সুফিয়ান স্বীয় দুই সহযোগীকে নিয়ে বদরের দিকে যাচ্ছিলো। দিনের কিছু অংশ অতিক্রান্ত হলো। দুইজন উষ্ট্রারোহী বদরের কূঁয়ার নিকট আসলেন। এরা দুজন ছিলেন অভিজাত আরবদের পোশাক পরিহিত। সেখানে তখন বদর এলাকার একজন সম্মানিত অধিবাসী মাজদী দাঁড়ানো ছিলেন। তাঁরা দুজন ছিলেন লাবীস ইবন আমর, আদী ইবন আবির রাগবা। এদের দুজনকে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) সেনাবাহিনীর আগমনের পূর্বেই শত্রুদের ব্যাপারে গোয়েন্দাগিরির জন্য প্রেরণ করেছিলেন। লাবীস মাজদীকে জিজ্ঞেস করলেন, শাম দেশ থেকে প্রত্যাবর্তনকালে কোন কাফেলা কি এখানে এসে অবস্থান করেছে?

মাজদী ঃ না।

লাবীস ঃ কুরাইশের সেনাবাহিনীর অবস্থান সম্পর্কে কিছু জানেন?

মাজদী ঃ না। তবে এতটুকু জানি কুরাইশের একটি কাফেলা আসন্ন ছিলো। তবে তারা আসেনি। এই বলে মাজদী চলে গেলেন। লাবীস এবং আদী স্ব স্ব উট বসালেন এবং বড় বড় পানির পাত্রে পানি ভর্তি করলেন। তখন দুটি মেয়ে পরস্পরে কথোপকথন করছিলো। লাবীস এবং আদী তাদের কথাবার্তা গভীরভাবে শুনছিলেন। একটি মেয়ে বললো ঃ আরে বোন! তুমি আমার সে পাওনা টাকাটা দিচ্ছো না কেন? অনেক দিন হলো তোমার কাছে আমি টাকা পাওনা। তুমি আমার টাকাটা কবে দিবে?

দ্বিতীয় মেয়েটি বললো ঃ বারযাহ! তুমি ভয় পাচ্ছ কেন? তোমার টাকা অতি শীঘ্রই আমি পরিশোধ করবো। কুরাইশের যে দলটি রাওহা নামক স্থানে অবস্থান করছে, কাল পরশু তারা এখানে এসে পৌঁছবে। তাদের কাছে আমার কিছু দ্রব্যাদি বিক্রি করে তোমার ঋণ পরিশোধ করে দিবো।

দুটি মেয়ের একটির নাম ছিলো বারযাহ। এ দুটো ছোকরি ছিলো জুহাইনা গোত্রের লোকদের দাসী। লাবীস আদীকে সম্বোধন করে বললেন, বুঝতে পেরেছেন? যে কাফেলার আমরা সন্ধান করছি সে কাফেলাটি রাওহায় অপেক্ষা করছে। তারা আজকালকার মধ্যেই বদরে এসে পৌঁছবে। তাড়াতাড়ি চলুন। দ্রুত যেয়ে রাসূলুল্লাহ (সাঃ)কে সংবাদ দিই।

দুজন উটের উপর আরোহণ করে রওয়ানা হলেন। তাঁদের যেতে না যেতেই আবু সুফিয়ান, আমর এবং মাখরামা সেখানে যেয়ে পৌঁছলো। মাজদী

কোথাও থেকে ঘুরে ফিরে পুনরায় সেখানে এসে পৌঁছলেন। তিনি ছিলেন গোত্রপতি। আবু সুফিয়ান তাকে চিনে ফেললো। সে তাকে লক্ষ্য করে বললো ঃ মাজদী! তুমি জান, মুসলমানরা কি আশেপাশে কোথাও অবস্থান করছে?

মাজদী ঃ না। মুসলমানরা আশেপাশে কোথাও অবস্থান করছে বলে আমি শুনিনি।

আবু সুফিয়ান ঃ সত্যি করে বলো। যদি মিথ্যে বলে থাকো তাহলে তোমার সাথে কুরাইশের শত্রুতা আরম্ভ হবে। এই শত্রুতা তোমাকে ধ্বংস করে ছাড়বে।

মাজদী ঃ আমি সত্য করে বলছি। তবে দু'ব্যক্তিকে আমি এই স্থানে কূঁপের কিনারায় দেখেছিলাম। তারা আপনাদের কাফেলা সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করছিলো।

আবু সুফিয়ান তাড়াতাড়ি স্বীয় উট- বসালো। মাজদী যে স্থানটির প্রতি ইঙ্গিত করেছিলো সেখানে গেলো। সেখানে উটের বিষ্টা পড়েছিলো। সে উটের এই বিষ্টাগুলোকে নাড়াচাড়া দিয়ে পরীক্ষা করলো এবং বললো, এগুলোর মধ্যে নিম্ন ধরণের খেজুরের বিচি পাওয়া গেলো। ইয়াসরিবের উটগুলোর খাদ্য এগুলো। এটা সুনিশ্চিত যে, এরা দু'জন মুহাম্মাদের গোয়েন্দা। তারা কাফেলা সম্পর্কে সংবাদ দেয়ার জন্য চলে গেছে। আমরা বেঁচে গেছি। চলো, দ্রুত চলো।

এই বলে এরা তিনজন উষ্ট্রীর উপরে আরোহণ করে দ্রুত রাওহায় এসে পৌঁছলো। এসেই কাফেলাকে প্রস্তুতির নির্দেশ দিলো। খুব দ্রুত তৈরী হলো কাফেলা। সেখান থেকে খুব জলদি সমুদ্রের কিনারে কিনারে চলছিলো। বদরকে বাম দিকে রেখে তারা পথ অতিক্রম করলো। যেহেতু মুসলমানদের আগমনের আশংকা ছিলো তাদের মনে, এজন্য পড়ি আর মরি অবস্থায় দ্রুত স্থান ত্যাগ করলো। অবশেষে বদরের সীমানা তারা ছাড়িয়ে গেলো। পৌঁছে গেলো মক্কার রাস্তার সন্নিকটে। সেখানে পৌঁছে জানতে পারলো, কুরাইশের সেনাবাহিনী তাদের সাহায্যে এসেছিলো। তারা চলে গেছে বদরের দিকে।

আবু সুফিয়ান কায়েস নামক এক ব্যক্তিকে সেখানে পাঠালো। তাকে বলে দিলো, তুমি আবু জেহেল প্রমুখকে বলবে—বাণিজ্যিক কাফেলা সহি–সালামতে, নিরাপদে মক্কা অঞ্চলে পৌঁছে গেছে। মুসলমানদের সঙ্গে কোন সংঘর্ষ হয়নি। আপনারা ফিরে চলে আসুন। এতদশ্রবণে কায়েস উটের উপর আরোহণ করে রওয়ানা হলো।

৩৫
আরেকটি সতর্কবাণী

কুরাইশ বাহিনী বাগাড়ম্বরে খুব জাঁকজমকে চলছিলো। তাদের সাথে ছিলো কিছু হাবশী ক্রীতদাস। তারা সেনাবাহিনীর আগে আগে চলছিলো নেজা হাতে লম্ফঝম্প করে। যারা আরোহী ছিলো তারা খুব শানশওকতে দাম্ভিকতার সাথে পথ অতিক্রম করছিলো। এভাবে পথ চলা রাসূলে আকরাম (সাঃ)এর নিকট ছিলো অপছন্দনীয়। তাই তিনি মুসলমানদের সতর্ক করে দিলেন। কুরআনে কারীমের নিম্নোক্ত আয়াত শুনালেন ঃ

ওয়ালা তাকূনূ কাল্লাযীনা খারাজূ মিন দিয়ারিহিম বাতারাও ওয়া রিয়াআন্নাস।

অর্থাৎ, তোমরা তাদের ন্যায় হবে না, যারা দম্ভভরে লোক দেখাবার জন্য স্বীয় ঘরবাড়ী হতে বেরিয়েছিলো। —সূরা আনফাল ঃ ৪৬।

আবু জেহেল এই বিশাল বাহিনীর দিকে তাকিয়ে খুবই আনন্দিত হলো। তার দৃঢ় বিশ্বাস ছিলো, সে মুসলমানদের সমূলে নিপাত করবে। এ কারণেই সে দম্ভ ও অহংকার সহকারে বললো যে, মুহাম্মাদ এবং তার সাঙ্গপাঙ্গদের ধারণা, তারা যেভাবে 'বাতনে নাখলে' অবস্থিত কাফেলার উপর আক্রমণ করে মালামাল ছিনতাই করেছে ঠিক অনুরূপ আবু সুফিয়ানের কাফেলার উপরে তারা বিজয় লাভ করবে। লাত ও উযযার শপথ, কক্ষণো এরূপ হতে পারে না। বস্তুতঃ মুসলমানরা আমাদের হুমকি দিয়ে তাদের মৃত্যু আহ্বান করেছে। মউত ক্রমশঃ তাদের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। হে কুরাইশ! তোমরা শুভ সংবাদ গ্রহণ করো। তোমাদের উপাস্যগুলোর অবমাননা যারা করেছে, তোমরা তাদের সমূলে বিনাশ করে দিবে। তোমাদের দেব–দেবীগণ ক্রোধান্বিত হয়ে পড়েছেন। তাদের ক্রোধ ও গযব মুসলমানদের উপর নিপতিত হয়েছে। তারা তোমাদের দয়ার উপরে টিকে আছে। এত বিশাল আকারের জোটবদ্ধ একটি দল শত্রুর সাথে কখনও মুকাবিলা করেছে বলে কুরাইশ কখনও দেখেনি।

প্রতিটি মনযিলে কোন না কোন নেতা বহু উট জবাই করেছে। খাইয়েছে প্রচুর সংখ্যক লোকদের। এক মনযিলে আবু জাহল দশটি উট জবাই করেছে। গর্দান কর্তিত পলায়নপর উটটিও তার উটগুলোর অন্তর্ভুক্ত ছিলো। সেই উটটি রক্তাক্ত অবস্থায় তাদের তাঁবুগুলোর পাশ দিয়ে গোটা সেনা ছাউনি এলাকা প্রদক্ষিণ করেছিলো। দ্বিতীয় মনযিলে সাফওয়ান ইবন উমাইয়া নয়টি উট জবাই করে খাইয়েছিলো লোকজনকে। তৃতীয় মনযিলে 'কুদাইদ' নামক স্থানে

সুহাইল ইবন আমর জবাই করেছিলো দশটি উট। সে মনযিলে পানির কোন অস্তিত্ব পাওয়া যায়নি। পানির তালাশে তারা বেরিয়েছিলো। দুর্ভাগ্য তাদের! পথ ভুলে ময়দানের মধ্যেই তারা ঘুরছিলো। সেখানে শায়বা জবাই করেছিলো নয়টি উট এবং লোকদেরকে দাওয়াত করে খাইয়েছিলো। একেবারে ভোরবেলায়ই এরা আবার পথ চলতে আরম্ভ করলো। অনেক চেষ্টা প্রচেষ্টার পর তারা আসল পথ খুঁজে পেলো। কিছুদূর চলেই পৌঁছলো জুহফা নামক স্থানে। লোকজন ভয় পেয়ে গেলো যে, আবার এমন হয়ে পড়ে কিনা যে, ময়দানে আর জঙ্গলে এরূপ বিভ্রান্ত অবস্থায় আমরা ঘুরতে থাকবো আর মুসলমানরা আমাদের কাফেলার উপর আক্রমণ করে সফলকাম হয়ে যাবে। কিন্তু যখন রাস্তা পুনরায় পেয়ে গেলো তখন আর তাদের আনন্দের সীমা রইল না। তা সত্ত্বেও কিছুসংখ্যক লোক কু-ধারণার শিকার হয়ে রইলো। যারা এরূপ কু-ধারণা পোষণকারী ছিলো, উতবা এবং শায়বা তাদের অন্যতম। এরা দুজন এক পাশে দাঁড়িয়ে কথোপকথন করছিলো। শায়বা উতবাকে সম্বোধন করে বললো ঃ উতবা! আতিকার স্বপ্ন কি তোমার স্মরণ আছে?

উতবা ঃ স্মরণ আছে। আমার মনে এখনও ভীতি জাগরুক। আশংকা হচ্ছে প্রকৃত অর্থে আমরা বধ্যভূমির দিকেই তাড়িত হচ্ছি কিনা?

এ মুহূর্তে আবু জেহেল তাদের সন্নিকটে এসে পৌঁছলো। আবু জেহেলের নিয়ম ছিলো, সে সর্বদাই সেনাবাহিনীর পিছনে থাকতো। যাতে কেউ হীনমন্যতায় ভুগে সাহস হারিয়ে পলায়ন করতে না পারে। লোকজনও তার খুব খাতির তোয়াজ করতো। ভয় পেতো তাকে। আবু জেহেল উতবা এবং শায়বার কাছে এসে বললো, তোমরা দুজন কি আলাপচারিতায় লিপ্ত?

উতবা ঃ আমরা আতিকার স্বপ্ন সম্পর্কে আলোচনা করছিলাম।

আবু জেহেল তেলেবেগুনে জ্বলে উঠলো। সে বললো, কি তাজ্জব! বনু হাশেম এবং তাদের আওলাদ আবদুল মুত্তালিবের। তারা এতটুকুতেই ক্ষান্ত হয়নি যে, তাদেরই একজন নবুওয়তের দাবী করেছে। আর গোটা কওমকে লিপ্ত করেছে ফিতনায়। কত বড় বিস্ময়ের ব্যাপার, যে সব উপাস্যগুলোকে আমাদের পিতা-প্রপিতারা পূজা করতেন, সেসব উপাস্যগুলো সম্পর্কে মুহাম্মাদ বলছে, এসব মিথ্যা। তাদের কথায় প্রতীয়মান হয় আমাদের মুরুব্বীরা আহমক ছিলেন। যার ফলে ভ্রান্ত প্রতীমাগুলোর উপাসনা করতেন। আমাদের আত্মমর্যাদাবোধের কি হলো যে, আমরা এরূপ কথা শুনতেই থাকবো আর চুপচাপ বসে থাকবো। যারা এইসব বিভ্রান্তিমূলক কথাবার্তা বলে, আমাদের উচিত তাদের হত্যা করে ফেলা, যে নবুওয়তের দাবী করে তার প্রাণ সংহার করা। মানুষের বিবেক বুদ্ধি কি লোপ পেয়ে গেলো? যে

খোদাকে কেউ দেখেনি তার অস্তিত্ব আছে কি নাই তাও জানা নেই, তারই ইবাদত করছে। যে খোদা আমাদের সামনে বিদ্যমান, যেগুলোকে আমরা সবাই দেখছি সেগুলোরই নিন্দাবাদ করা হচ্ছে। ভাইয়েরা আমার! আতিকার স্বপ্ন শুধু একটি স্বপ্ন মাত্রই। কিংবা এ স্বপ্ন শুধু সেজন্যই তৈরী করা হয়েছে যাতে আমাদের মধ্যে কু-ধারণা এবং হীনমন্যতা, কাপুরুষতা সৃষ্টি হয়। তোমরা সবাই ভালো করে শুনে নাও, আমরা যখন বিজয়ীর বেশে মক্কায় প্রত্যাবর্তন করবো তখন আবদুল মুত্তালিবের সন্তানদের সাথে সেই আচরণই করবো যা আমরা মনে মনে ভেবেছি।

শায়বা ঃ আবদুল মুত্তালিবের সন্তানদের সাথে আমার অন্য কোন সংশ্রব নেই। তবে আমাদের সাথে তাদের আত্মীয়তার সম্পর্ক রয়েছে। এজন্য আমরা তাদের প্রতি খেয়াল রাখি। তাদেরকে আমরা সত্যবাদী মনে করি। আমি মুহাম্মাদের বিরুদ্ধে মুকাবিলায় যাওয়াটাকে ভালো মনে করি না।

উতবা ঃ আমিও এটাকে সুনজরে দেখছি না। বরং আমার তো লজ্জা লাগছে।

শায়বা ঃ আমার অবস্থাও অনুরূপ। চলো আমরা দুজনেই ফিরে চলে যাই।

আবু জেহেল কিংকর্তব্যবিমূঢ় অবস্থায় তাদের দিকে তাকালো। বললো, তোমরা প্রত্যাবর্তনের ইচ্ছে করছো? আমার কাছে বিষয়টি বিস্ময়কর মনে হচ্ছে! তোমরা কি স্বজাতি এবং নিজেকে অপমান করতে চাইছো? তোমাদের মাথায় কাপুরুষতার অপবাদ লাগাতে চাইছো? বীরবাহাদুরদের সাহসকে খাটো করতে চাইছো? অথচ তোমরা এই অভিযানে এইজন্যই যাচ্ছো যাতে তোমাদের নাম-সুনাম, প্রভাব-প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পায়, আলোকোজ্জ্বল হয়। নিজের ধর্মের মান উঁচু রাখার চেষ্টা করো। আতিকার স্বপ্ন তোমাদেরকে হীনমন্য বানিয়ে ফেলেছে। তোমরা কি মনে করেছো যে, ভুখা-নাঙ্গা, সংখ্যালঘু, দুর্বল মুসলমানরা তোমাদের উপর বিজয় লাভ করবে? হুবলের শপথ করে আমি বলছি, কস্মিনকালেও এরূপ হবে না। বিজয় আমাদেরই হবে।

শায়বা ঃ বিজয় আমাদের হোক কিংবা মুহাম্মাদের, তবে দ্বন্দ্বটা তো আমাদের মধ্যে হচ্ছে পরস্পরে। স্বজাতিই তো পরস্পরে সংঘর্ষের মাধ্যমে ধ্বংস হচ্ছে। আবু জেহেল! এখনো সময় আছে। দূরদর্শিতার মাধ্যমে কাজ করুন। জাতিকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিবেন না। ফিরে চলুন।

আবু জেহেল ঃ কি নিরর্থক কথাবার্তা তোমরা বলছো? শরীরের একটা অংশ যদি পঁচে গলে নষ্ট হয়ে যায়, সে অংশটুকুকে শরীরের সাথে কেউ

কখনও রেখে দেয়? না অপারেশন করে ফেলে দেয়? অপারেশন করে না ফেলার অর্থ হলো, গোটা শরীরকে নষ্ট করে দেয়া। বুদ্ধিমানের কাজ হলো, পঁচা গলা অংশ ফেলে দিয়ে দেহকে রক্ষা করা। সমাজের যারা নিকৃষ্ট এবং মুখরা ঐ সমস্ত লোকদেরকে হত্যা করা খুবই ভালো এবং পুণ্যের কাজ। তোমরা যদি প্রত্যাবর্তনই করতে চাও তাহলে চলে যাও। এ কথা বলেই আবু জেহেল সামনে অগ্রসর হলো।

উতবা ঃ আবু জেহেল বড়ই অলুক্ষণে। সে নিজেও ডুববে, জাতিকেও ডুবাবে। মুহাম্মাদের সাথে আমাদের সন্তানও আছে। চলো, আমরা দুজন ফিরে যাই।

শায়বা ঃ আমার মনও তাই চায়। কিন্তু যদি ফিরে যাই তাহলে লোকজন আমাদের গালিগালাজ করবে। চলো, আর কি করবো। সবার সাথেই থাকতে হবে। এই বলে তারাও কুরাইশ বাহিনীর সাথে রওয়ানা হলো। 'জুহফা' নামক স্থানে অবস্থান করলো সবাই। উতবা ইবন রবীয়া দশটি উট জবাই করলো। লোকদের খাওয়ালো। উল্লেখ্য, যেসব উট জবাই করা হতো সেগুলো ছিলো সওয়ারীর উট ছাড়া স্বতন্ত্র। পরদিন সকালবেলায় জুহাইম ইবন সালত একটি স্বপ্ন দেখলো। সেই স্বপ্নের ইতিবৃত্ত সে লোকদের শুনালো। সে বললো, আমি ছিলাম তন্দ্রাচ্ছন্ন। অশ্ব হাঁকিয়ে এক ব্যক্তি আমার কাছে এসে দাঁড়ালো। লোকটি চিৎকার করে বলতে লাগলো, হে কুরাইশ সম্প্রদায়! রবী'আর দুই সন্তান, উতবা এবং শায়বা নিহত হয়েছে। জামআ ইবন আসওয়াদেরও প্রাণসংহার করা হয়েছে। মারা পড়েছে উমাইয়া ইবন খালফ, আবুল বাখতারী, আবুল হাকাম, নাওফল ইবন খুওয়াইলিদ এবং অন্যান্য আরও অনেক সম্মানিত নেতৃবৃন্দ। সুহাইল ইবন আমর গ্রেফতার হয়েছে। হারিস ইবন হিশাম নিজের ভাইকে ছেড়ে পালিয়েছে। তখনই কোন একজন চিৎকার করে বললো, অশুভ পরিণতির সম্মুখীন হে কুরাইশ জাতি! তোমরা দ্রুত তোমাদের বধ্যভূমির দিকে যাত্রা করো।

এই আরোহী একটি উটের বুকে নেজা মারলো। বইতে আরম্ভ করলো রক্তের ফোয়ারা। সেনাবাহিনীর মধ্যে এই উটটি পলায়নপর হলো। প্রতিটি তাঁবুর পার্শ্ব তার রক্তে রঞ্জিত হলো। এই স্বপ্ন দেখে আমি ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে উঠে বসলাম। লোকজন এই স্বপ্ন বৃত্তান্ত শুনে আরও ভীত-সন্ত্রস্ত হলো। হীনবল হয়ে পড়লো তারা। যাদের নিহত হবার কথা স্বপ্নে বর্ণিত হলো, সত্যায়নের জন্য তারা তার কাছে এসে সংবাদ জিজ্ঞেস করলো।

ফলে, এদিন যাত্রা মূলতবী করা হলো। লোকজন উদ্বিগ্ন উৎকণ্ঠিত। আবু জেহেল এই সংবাদ শুনে বললো, এ আবদুল মুত্তালিবের সন্তান! এ দেখি

আরেক নবী হয়েছে। কি মুসীবতের ব্যাপার! এই বংশে যে নবীর ধারা শুরু হয়ে গেছে। আতিকা গায়েব জানার দাবী করেছে। এবার জুহাইমও গায়েবী জ্ঞানের দাবী করে বসলো। আসলে এসব কিছুই নয়। এগুলো কোন স্বপ্নই নয়, গায়েব–টায়েবও নয়। নবী–টবিও কিছু্য নয়। এর আসল মতলব হলো, আমরা যেন মুহাম্মাদের বিরুদ্ধে লড়তে না যাই। এরা খুব ভালো করে জানে, আমাদের এই বিশাল বাহিনী মুহাম্মাদ এবং তার সাথী–সঙ্গীদের প্রাণসংহার করে ছাড়বে। এই জন্য এরা আত্মীয়তার সম্পর্কের টানে আমাদের বারণ করতে নেমেছে। অবলম্বন করেছে বিভিন্ন কৌশল। সবাই কান খুলে শুনে নাও, আমরা ভীত নই, নই পিছু হটবার মত ব্যক্তিত্ব। মুহাম্মাদ এবং তার সাঙ্গপাঙ্গদের মূলোৎপাটনের বাসনা নিয়ে আমরা অভিযাত্রা করেছি। তাদের উৎখাত করে ছাড়বো। ধুলিস্মাৎ করে ছাড়বো নতুন ধর্মকে।

উতবা এবং শায়বা এই স্বপ্ন শুনে বললো ঃ এটা হলো দ্বিতীয় সতর্কবাণী। তারা আরও বললো যে, মুহাম্মাদ আল্লাহর রসূল। আমরা কেন তার বিরুদ্ধে লড়তে যাবো। যদি সে সত্য নবী হয়ে থাকে তাহলে বিজয়ী হবে অবশ্যই। আমরা তার বিরুদ্ধে লড়াই করতে যেয়ে কেন মারা পড়বো। আর যদি সে সত্য নবী নাই হয়ে থাকে তাহলেও তো সে আমাদের আত্মীয়–আপনজন। তার বিরুদ্ধে কেন আমরা যুদ্ধ করতে যাবো।

এরা দুজন ফিরে চলে আসার জন্য প্রস্তুত হলো। ইতোমধ্যে এলো আবু জেহেল। সে বললো ঃ তোমরা দুজন কি শলাপরামর্শ করছো?

উতবা, শায়বা ঃ আমরা ফিরে চলে যাবার জন্য মনস্থ করেছি।

আবু জেহেল ঃ আমি মনে করি, এটা কোন স্বপ্নই নয় বরং আমাদেরকে প্রত্যাবর্তন করানোর একটি ষড়যন্ত্র। ফিরে যেয়ে স্বজাতিকে অপমান করো না। তোমরা যদি ফিরে যাও তাহলে সবাই তোমাদের কাপুরুষ বলবে। বদনাম হবে তোমাদের। লোকজন তোমাদেরকে এবং তোমাদের বংশের লোকদেরকে ঘৃণার দৃষ্টিতে, হেয় নজরে দেখবে। তোমরা কি তা বরদাশত করতে পারবে? এটুকু বলার জন্যই আমি তোমাদের কাছে এসেছি।

শায়বা ঃ হে ইবন হানযালিয়া (আবু জেহেল)! আমাদেরকে বারবার সতর্ক করা হচ্ছে। ভবিষ্যতে সংঘটিতব্য বিষয়াবলী সম্পর্কে অবহিত করা হচ্ছে আমাদেরকে। জ্ঞানের কাজ হবে আমাদের সতর্ক হওয়া, বধ্যভূমির দিকে না যাওয়া বরং ফিরে চলে যাওয়া।

আবু জেহেল ঃ এটা হবে মারাত্মক আহম্মকি। মুসলমানরা মনে করবে আমরা তাদের ভয়ে ভীত–সন্ত্রস্ত হয়ে ফিরে চলে গেছি। তারা তখন সিংহে পরিণত হবে। ধৃষ্টতা তাদের বেড়ে যাবে। আমাদের কাফেলার উপর হামলা

করে আমাদের ব্যবসা–বাণিজ্য খতম করে দিবে। গোটা জাতি কপর্দকহীন, হত–দরিদ্র হয়ে পড়বে। আমি কিভাবে বুঝাবো যে, মুসলমানদের পদদলিত করা উচিত এবং এ বিষয়টি কত জরুরী। বিভিন্ন প্রকার সংশয়–সন্দেহ ও জল্পনা–কল্পনায় মাথা ঘামাবে না। বিজয় আমাদের সুনিশ্চিত। এত বিশাল বাহিনী থাকা সত্ত্বেও আমরা পরাস্ত হবো বলে বিশ্বাস করো?

শায়বা ঃ আমরা তো শুধু একটি কথাই বুঝি, তুমি নিজেও ধ্বংস হবে আর আমাদেরও হালাক করবে। চলো, আমরা তোমার সাথেই আছি। আবু জেহেল খুশিতে আটখানা। উতবা এবং শায়বার জন্য সেদিনই আবু জেহেল শরাবের একটি বড় পাত্র ভর্তি করে পাঠিয়ে দিলো।

৩৬
আবু জেহেলের হঠকারিতা

কুরাইশ বাহিনী এখনও জুহফায় অবস্থানরত। একজন বেদুঈন একটি উটনীর উপর আরোহণ করে হাজির হলো। তার পাগড়ীর উপর একটি রুমাল এরূপভাবে বাঁধা যার কারণে তাকে চেনা যাচ্ছিলো না। সেনাবাহিনীর নিকটে এসে লোকটি উটনীর উপর থেকে অবতরণ করলো। অনুপ্রবেশ করলো ক্যাম্পে। সে দেখলো, স্থানে স্থানে উটের মাংস চুলার উপরে রান্না করা হচ্ছে। কোথাও কোথাও ভুনা করা হচ্ছে। কোথাও মক্কার কাফিররা শরাবের পাত্র থেকে ঢক ঢক করে মদ গিলছে।

উটনীর উপর আরোহী এই বেদুঈন সামনে অগ্রসর হলো। মনে হলো, কোন বিশেষ তাঁবু সে অন্বেষণ করছে। অতএব, অগ্রসর হতে হতে আবু জেহেলের তাঁবুর কাছে থামলো। উটনীটিকে বাঁধলো। আবু জেহেলের তাঁবুর নিকট লোকটি যেয়ে পৌছলো। সেই তাঁবুর সামনে নেতার শান–শওকত বুঝাবার জন্য ছোট একটি ছায়াদার জায়গার ব্যবস্থা করা হয়েছিলো। সেখানে শামিয়ানার নিচে বসে ছিলো আবু জেহেল, জামআ, হারিস, আখনাস ইবন শরীক, উমাইয়া এবং আরও কিছুসংখ্যক বেদুঈন। আগন্তুক বেদুঈন জামা এবং সালোয়ারের উপর ঢিলা আস্তিন বিশিষ্ট একটি আলখাল্লা পরেছিলো। এটা ছিলো পায়ের গিরা পর্যন্ত প্রলম্বিত। মাথায় পাগড়ি, পাগড়ির উপর রুমালটি এরূপ ভাবে পরেছিলো যে, তার সামনের দিকটার দুই কোণা বুকের উপর ঝুলন্ত ছিলো। আর পিছনের দুটো লেজ ছিলো স্কন্ধদ্বয়ের উপর। পাগড়ির উপর রুমাল জালি দ্বারা বাঁধা। জুব্বার মধ্যে বুকের উপর বাঁধা ছিলো একটি বন্ধনী মেখনা। তার মধ্যে খঞ্জর ঢুকানো ছিলো। তলোয়ারটি

ছিলো তার পার্শ্বদেশে ঝুলন্ত। দীর্ঘ কদম ফেলে সে ছাউনীর ভিতর প্রবেশ করলো। সেখানে যেয়ে বললো, লাত, উয্যা তোমাদের সহায়তা করুন।

বেদুঈনটি সন্নিকটে পৌছলে আবু জেহেল তাকে চিনতে পারলো। সে ছিলো কায়েস ইবন আমরী। আবু জেহেল তাকে লক্ষ্য করে বললো, ওহো! কায়েস নাকি? হুবল আমাদের প্রতি দয়া করুন। তুমি তো বাণিজ্যিক কাফেলার সঙ্গে গিয়েছিলে? কি সংবাদ কাফেলার?

কায়েস ঃ কাফেলা দুশমনদের আক্রমণ থেকে রক্ষা পেয়েছে। সহি–সালামতে মনযিলে মকসুদ পর্যন্ত পৌছে গেছে।

এ সংবাদ শুনে সবাই আনন্দে আটখানা। কায়েস তার আলোচনার ধারা অব্যাহত রেখে বললো ঃ আবু সুফিয়ান আমাকে আপনার কাছে এইজন্য প্রেরণ করেছেন যাতে আপনাকে এই সুসংবাদ শুনাই যে, কাফেলা নিরাপদ রয়েছে এবং আপনার দরবারে এ আবেদন জানাই যে, আপনি তো কাফেলার সাহায্যের জন্য এসেছিলেন। কাফেলার কোন কষ্ট–তকলীফ হয়নি। অতএব, আপনি ফিরে চলে আসুন।

আবু জেহেল ঃ ফিরে চলে যাবো?

কায়েস ঃ হাঁ, ফিরেই চলে আসুন। কারণ, আমাদের লক্ষ্য–উদ্দেশ্য অর্জিত হয়ে গেছে।

আবু জেহেল তার সাঙ্গ–পাঙ্গদের দিকে সাধারণ একটি নজর দিয়েই বললো, তোমাদের কি মত্?

উতবা এবং শায়বাও তখন সে মজলিসে উপস্থিত। উতবা শায়বাকে লক্ষ্য করে বললো ঃ এই মরদুদের এখনো ফিরে যাবার ইচ্ছে নেই বলে মনে হচ্ছে।

উমাইয়া ঃ আমি আপনাদের সাথে এসেছিলাম। আপনার যে ইচ্ছা আমার মনোবাসনাও তাই।

আখনাস ইবন শরীক ঃ আমরা কাফেলার সাহায্য এবং তাদের হেফাজতের উদ্দেশ্যে এসেছিলাম। লাত, উযযা কাফেলার হেফাজত করেছে। কাজেই এবার ফিরে যাওয়া উচিত।

শায়বা ঃ বাস্তব কথাও তাই। আমরা এসেছিলাম কাফেলার মদদের জন্য। কাফেলা সুখ–শান্তিতে নিরাপদেই লক্ষ্যস্থলে যেয়ে পৌছেছে। এবার সামনে অগ্রসর হলে আমাদের কি লাভ?

যামআ ঃ এই দুই যুবকের বক্তব্যই সঠিক। কিন্তু তোমাদের পরামর্শ যদি অন্য কিছু হয়ে থাকে তাহলে সামনে বলতে পারো।

আবু জেহেল ঃ আখনাস বনী যুহরার মিত্র। বনী যুহরা বনী হাশেমের

আত্মীয়। শায়বা বনী হাশেমের আপনজন। তাদের উক্ত বক্তব্যই রাখার কথা। কারণ, তারা চায় না, মুহাম্মাদ এবং তার সাঙ্গপাঙ্গদের কোন কষ্ট-তকলীফ হোক। তবে চিন্তা করতে হবে, বে-দ্বীন মুসলমানদের আমাদের কাফেলার উপর আক্রমণ করার চিন্তার ধৃষ্টতা কিভাবে হলো। এর কারণ একটাই যে, আমাদের ভয় তাদের অন্তর থেকে উধাও হয়ে গেছে। আমরা এখানে কোনকিছু না করে ফেরত চলে গেলে মুসলমানদের ধৃষ্টতা আরও বেড়ে যাবে। তাদের সাহস বৃদ্ধি পাবে। অতএব, আমাদের আরও সামনে অগ্রসর হওয়া উচিত। আজকালকের মধ্যে বদরে মেলা বসবে। আমরা বদরে যাবো। সেখানে তিনদিন অবস্থান করবো। লোকজনকে দাওয়াত করবো। জাঁকজমকে খাবো, খাওয়াবো। শরাব পান করবো, উৎসব করবো। গোটা আরবের সব কবীলার লোক আমাদের স্থির প্রতিজ্ঞা ও সাহসিকতা প্রত্যক্ষ করবে। প্রভাব পড়বে সবার উপর আমাদের। মুসলমানরাও ভীত-সন্ত্রস্ত ও প্রভাবিত হবে। অতঃপর আমরা ফিরে চলে যাবো। সবাই একযোগে বললো, হাঁ, আপনার রায় ঠিক।

কায়েস ঃ আবু সুফিয়ান পয়গাম পাঠিয়েছেন যদি আপনারা ফিরে না যান তাহলে যেন কণ্ঠশিল্পী, গায়িকাদের অবশ্যই ফেরত পাঠিয়ে দেন। কারণ, এসব কণ্ঠশিল্পী গায়িকা জাতীয় সম্পদ। সুরেলা ও সুমিষ্ট কণ্ঠের অধিকারিণী। এরা সুন্দরী, মায়াবিনী, ষোড়শী। গোটা হেজাজে তাদের সুখ্যাতি রয়েছে।

আবু জেহেল ঃ হাঁ, তা অবশ্য করা যাবে। এটা মেনে নেয়া যায়। গায়িকাদের অবশ্যই ফেরত পাঠানো হবে। ফলে, এসব গায়িকাদের হাওদার উপর আরোহণ করিয়ে তখনই জুহফা থেকে মক্কা অভিমুখে ফেরত পাঠানো হলো। আবু জেহেল সেনাবাহিনীকে যাত্রার নির্দেশ দিলো। লোকজন তাদের তাঁবু উপড়াতে লাগলো। গোছাতে আরম্ভ করলো তাদের মাল-সামান। লোকজন যখন রওয়ানার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিলো তখন আখনাস ইবন শরীক বনী যুহরার কাছে পৌছলো। তারাও তখন তাঁবু উপড়াচ্ছিলো। আখনাস বনী যুহরার শীর্ষস্থানীয় লোকদের আলাদা ডেকে বললো ঃ হে বনী যুহরা! তোমরা এসেছিলে কাফেলার সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে। তোমাদের বাণিজ্যিক কাফেলা তো নিরাপদ রয়েছে। আবু জেহেলের সাথে মুহাম্মাদের সাথে অন্তর্দ্বন্দ্ব। সে চায় তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে, তাদের হত্যা করতে। কিন্তু মুহাম্মাদ তোমাদের ভাগ্নে। যদি সে সত্যিই নবী হয় তাহলে তার কারণে তোমরা ইহ-পরকালীন ইযযত-সম্মানের অধিকারী হবে। আর যদি সে মিথ্যুক হয় তাহলে নিজের ভাগ্নেকে হত্যা করে গোটা জগদ্বাসীর সামনে কেন তোমরা অপমানিত হবে? চলো আমরা ফিরে যাই।

জনৈক ব্যক্তি বললো ঃ কিন্তু আবু জেহেল এবং জাতিকে কি জবাব দিবে?

আখনাস ঃ আবু জেহেল কমবখত, সে স্বজাতিকে ধ্বংস করতে চায়। বাকী রইলো জাতির প্রশ্ন। এ বিষয়টি আমার সোপর্দ করো। ব্যর্থতার ইলজাম আমি আমার মাথায় তুলে নেবো। আগে তোমরা প্রস্তুতি নাও।

সবাই একযোগে বললো ঃ আমরা প্রস্তুত।

আখনাস ঃ তাহলে একটা কাজ করো, যখন সেনাবাহিনী রওয়ানা হবে তখন আমি চিৎকার আরম্ভ করে উঠবো, 'আমাকে সর্প দংশন করেছে।' তোমরা সবাই আমার পাশে এসে ভীড় জমাবে। তোমাদের যদি অভিযাত্রার কথা বলা হয়, তাহলে তোমরা বলবে আমাদের সাথী সুস্থ হয়ে উঠলে আমরা পরক্ষণে আসছি। আর যদি সে মারা যায় তাহলে তাকে দাফন-কাফন করে আসবো। অতএব, এই সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত হলো। অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই সৈন্যসামন্ত রওয়ানা করলো। কিছু লোক চলতে আরম্ভ করলো। আর আখনাস তখনই চিৎকার করে উঠলো, 'আমাকে সাপে দংশন করেছে।' গোটা বনু যুহরা তার আশে পাশে সমবেত হলো। এলো আবু জেহেল সহ আরও কিছুসংখ্যক লোক। তারা এসে বললো ঃ তোমরা রওয়ানা করো। প্রতিউত্তরে তারা বললো ঃ আমাদের সাথীকে সর্প দংশন করেছে। আমরা তার চিকিৎসা করাচ্ছিং।

আবু জেহেল ঃ তাকে পালকির উপর বসিয়ে নিয়ে চলো।

আখনাস ঃ না, আমি এই জমিতেই সমাহিত হতে চাই।

বাধ্য হয়ে আবু জেহেল তাকে সেখানে রেখেই চলে গেলো। তাগিদ দিয়ে তাদের বলে গেলো, রোগী একটু সুস্থ ও আরামবোধ করলেই তোমরা চলে আসবে। দু' তিন ঘন্টার মধ্যেই সাফ হয়ে গেলো পুরো ময়দান। চলে গেলো কুরাইশের সর্বশেষ ব্যক্তিটিও। এবার আখনাস উঠে বসলো। বললো, তোমরা প্রস্তুত হও।

সবাই সমস্বরে বললো ঃ বিলকুল তৈয়ার।

আখনাস ঃ খুব ভালো। তাহলে রওয়ানা করো। মনে করো আমরা বেঁচে গেছি।

অতএব এরা সবাই প্রত্যাবর্তন করলো। তারীখে ওয়াকিদীতে এদের সংখ্যা একশত বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এরা এমন আনন্দিত হয়েছে যেন জেলখানা থেকে মুক্তি পেয়েছে।[১]

টীকা ঃ ১. মাগাযিস সাদিকা ঃ পৃষ্ঠা ২৯।

৩৭
মুজিযা

হযরত রাসূলে আকরাম (সাঃ) 'বুয়ূতুস সাকইয়া' নামক স্থান থেকে রওয়ানা করলেন। এখানে নবীজী (সাঃ) দু'আ করলেন, 'আয় আল্লাহ! এরা মুসলমান, পদাতিক বাহিনী। তাদের তুমি আরোহণের ব্যবস্থা করো। এরা বস্ত্রহীন, তাদের পোশাকের ব্যবস্থা করো। এরা ক্ষুধার্থ, তুমি তাদের খানার ব্যবস্থা করো। এরা মুহতাজ–মুখাপেক্ষী, তাদের তুমি নিজ দয়ায় অমুখাপেক্ষী বানিয়ে দাও, ঐশ্বর্যশীল করো।

রাসূলে আকরাম (সাঃ) নিজ বাহিনীর মধ্যে একাধিক অধিনায়ক নিযুক্ত করলেন। পদাতিক বাহিনীর অধিনায়ক নিযুক্ত করলেন কায়েস ইবন আবী সা'সা'আহ (রাঃ)কে। আরোহীদের আমীর নিযুক্ত হলেন হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ)। প্রিয়নবী (সাঃ) একটি কূপের কাছে গিয়ে থামলেন। তিনি হযরত কায়েস ইবন আবী সা'সা'আহ (রাঃ)কে বললেন ঃ বাহিনীকে পুনরায় গণনা করো। তিনি গণনা করে বললেন, এরা সর্বমোট ৩১৩ জন। তন্মধ্যে রয়েছেন কয়েকজন বালকও।

এখান থেকে রওয়ানা করে 'বাতনুল আতীক'–এ পৌঁছলেন তাঁরা। সেখান থেকে মাকানকাসের পথে চললেন গিয়ে পৌঁছলেন 'বাতহা ইবন জুবাইরে'। প্রিয়নবী (সাঃ) একদিনে এতটুকু পরিমাণই সফর করতেন যাতে কারো কষ্ট না হয়। 'বাতহা ইবন জুবাইরে' পৌঁছার পর দ্বি–প্রহর হয়ে গেলো। সেখানে ছিলো একটি গাছ। সবাই সেখানে অবতরণ করে অবস্থান করলেন। নবী করীম (সাঃ) বৃক্ষটির ছায়ার নিচে গিয়ে বসলেন। হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) একত্র করলেন কতগুলো পাথর। তাঁরা সবে মিলে সেই গাছের নিচেই পাথরগুলো জমা করে একটি মসজিদের রূপ দান করলেন। রাসূলে আকরাম (সাঃ) জোহরের নামায এই মসজিদে জামাত সহকারে আদায় করলেন।

এ বৎসরই, অর্থাৎ দ্বিতীয় হিজরীতে রোযা ফরয হয়েছিলো। সফরে রাসূলে করীম (সাঃ) দুই দিন রোযা রেখেছিলেন। অতঃপর আর রোযা রাখেননি। লোকজনকেও বললেন ঃ তোমাদের রোযা রাখতে হবে না। অনেক সাহাবী অধিক সওয়াবের আশায় রোযা ভাঙ্গলেন না।

রাসূলে আকরাম (সাঃ) ঘোষণা দিলেন ঃ হে আমার সাহাবী সম্প্রদায়! তোমরা রোযা ভেঙ্গে ফেলো। এ সফরে রোযা ভেঙ্গে ফেলাই উচিত। আমি নিজেও রোযা ভেঙ্গেছি। তোমরা নিজেরাও তাই করো। তোমাদের যেন নাফরমানদের তালিকাভুক্ত না করা হয়। এই ঘোষণা শোনার সাথে সাথেই

সাহাবায়ে কেরাম রোযা ভেঙ্গে ফেললেন। কারণ, তাঁরা চান না তাদের ন্যম কিছুতেই অবাধ্যদের অন্তর্ভুক্ত হোক। যারা পূর্বে অধিক সওয়াবের আশায় রোযা ভাঙ্গেননি, তাঁরাও রোযা ভঙ্গ করলেন।

তার পরদিন রাসূলে আকরাম (সাঃ) এখান থেকে রওয়ানা করে মাল উপত্যকায় পৌছলেন। সেখানে কোন তাঁবু বা শিবির কিছুই ছিলো না। যেখানে অবস্থান করছিলেন সেখানে ছিলো বালুর উঁচু উঁচু টিলা। এসব টিলার নিচে এবং উটের ছায়ায় সাহাবায়ে কেরাম আশ্রয় নিলেন। অন্য কোন ছায়ার ব্যবস্থা তাদের ছিলো না। গরম এত তীব্র আকার ধারণ করেছিলো যে, মরুভূমির বালুগুলো প্রচণ্ড উত্তপ্ত হয়ে পড়েছিলো। এতো উত্তাপ যে, শস্যদানাও ভাজা হয়ে যাবার মতো। আরবদের পায়ের স্যাণ্ডেল এত গরম হয়ে যেতো যে, পায়ের তালু পর্যন্ত জ্বলতে আরম্ভ করতো। প্রবাহিত হয়েছিলো লু হাওয়া, যাকে বলা হয় 'বাদে সামূম'। এতো মারাত্মক তেজ হাওয়া বয়েছিলো যার ফলে বালুর টিলাগুলোকে এক জায়গা থেকে অপর জায়গার দিকে উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছিলো। প্রচণ্ড গরম শরীর ঝলসে দিচ্ছিলো। তেজ হাওয়ার ফলে বালুগুলো যখন শরীরের উপর পড়তো তখন গায়ে ফোসকা পড়ে যেতো। গায়ের মধ্যে যেন লাগতো অগ্নিস্ফুলিংগ। যেদিন নবীজী তিরইয়াক নামক স্থানে পৌছলেন সেদিন লু হাওয়া কিছুটা কম ছিলো। কিন্তু সূর্যের তাপ ছিলো প্রচণ্ড।

রাসূলে আকরাম (সাঃ)এর অনতিদূরেই একটি হরিণ এসে দাঁড়ালো। তখন রাসূলুল্লাহ (সাঃ)এর নিকটে দাঁড়ান ছিলেন হযরত সা'দ ইবন আবী ওয়াক্কাস (রাঃ)। রাসূলে কারীম (সাঃ) ইরশাদ করলেন ঃ সা'দ তুমি হরিণটি দেখেছো?

সা'দ (রাঃ) হরিণটির দিকে লক্ষ্য করেই কামানের মধ্যে তীর রেখে ধনুকের ছিলা টানলেন। প্রিয়নবী (সাঃ) দাঁড়িয়ে তার মাথা মুবারক সা'দ (রাঃ)এর কান এবং স্কন্ধদ্বয়ের মাঝখানে রেখে বললেন, সা'দ! তীর ছোড়ো। অতঃপর এ দু'আও করলেন, হে আল্লাহ! সা'দের তীরকে লক্ষ্যবস্তুতে পৌছাও। অতঃপর সা'দ (রাঃ) তীর ছুড়লেন। রাসূলে কারীম (সাঃ)এর প্রভাবে হযরত সা'দ (রাঃ)এর তীর লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে গিয়েছিলো। তার বিবরণ ঃ তীরটি এরূপভাবে যাচ্ছিলো যে, আমি মনে করেছিলাম লক্ষ্যভ্রষ্ট হবে। কিন্তু আমার বিস্ময়ের সীমা রইলো না যখন দেখলাম তীরটি ঠিকই হরিণের গর্দানে যেয়ে পড়লো। সেখানেই লুটিয়ে পড়লো হরিণটি। আমি প্রিয়নবী (সাঃ)এর দিকে তাকালাম। তিনি মুচকি হাসছিলেন। আমি অনুধাবন করতে পারলাম, এটা প্রিয়নবীর মুজেযা বা অলৌকিক ঘটনা।

রাসূলে আকরাম (সাঃ) আমাকে বললেন ঃ যাও, হরিণটিকে জবাই করে নিয়ে এসো।

সা'দ (রাঃ) বললেন, আমি দৌড়ে যেয়ে দেখলাম হরিণটি এখনও জীবিত। এটিকে জবাই করলাম। হাজির করলাম নবীজীর (সাঃ) সামনে। রাসূলে আকরাম (সাঃ) হরিণের গোশত টুকরো করিয়ে চামড়া দিয়ে ঢেকে রাখলেন। তিনি আমাকে নির্দেশ দিলেন, বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম পড়ে বন্টন করে দাও। অতএব, হরিণের গোশত সমস্ত সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে বন্টন করে দিলাম। মুসলমানদের কাছে ছিলো না জবাই করার মতো কোন উট, যেগুলো সাহাবায়ে কেরামের মাঝে বন্টন করা যায়। জবাইয়ের উটই বা পাবে কোত্থেকে, আরোহণের জন্যই তো তেমন উট ছিলো না। এরা সাথে করে নিয়ে এসেছিলেন খেজুর এবং ছাতু। কোন সময় খেজুর খেতেন আবার কখনও খেতেন পানি দিয়ে গুলিয়ে ছাতু। মদীনা থেকে বেরিয়ে এই উপত্যকার মধ্যেই হরিণের গোশত তাদের ভাগ্যে জুটলো।

মুজাহিদীনে ইসলাম প্রকৃত অর্থেই মুজাহিদ ছিলেন। তাঁরা নিজেদের নফসের বিরুদ্ধে জিহাদ করেছেন। ক্ষুধার্ত হলে খেজুর খেয়েছেন, একটু পানি পান করেছেন। প্রচণ্ড উত্তাপ যখন অনুভূত হয়েছে তখন বিশ্রাম নিয়েছেন উটের ছায়ায়। কোন কোন সময় প্রচণ্ড গরমের মুহূর্তে নিজের শরীরে ফোসকাও পড়েছে। মন বিষিয়ে উঠেছে, ভীত–সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছে কিন্তু তাদের ললাটে অসন্তোষের ভাঁজ পড়েনি। বিপদের মুহূর্তে সর্বদা তাঁরা মুচকি হেসেছেন। আল্লাহু আকবার! তাঁরা কিরূপ লোক ছিলেন। কতটুকু ধৈর্য ও অটলতা ছিলো তাঁদের মধ্যে। তাঁরা পার্থিব কোন কষ্টকেই কষ্ট মনে করেননি। কোন মুহূর্তেই কোন প্রকারের অভিযোগ–শেকায়েত ছিলো না তাঁদের মধ্যে। সময়মত জামাত সহকারে নামায আদায় করতেন। সামান্যতম শিথিলতাও এ ব্যাপারে তাঁরা প্রদর্শন করেননি। এসব সাহাবায়ে কেরামের নাম মুখে উচ্চারণ করাও আমাদের জন্য বেয়াদবী। দ্বীনের চেরাগ তাঁরা প্রজ্জ্বলিত করেছেন। সে আলোর দ্বারাই আজ পৃথিবী উজ্জ্বল।

এসব পূত–পবিত্র সাহাবায়ে কেরামের জীবনী লেখা এবং পড়ার মধ্য দিয়ে আমাদের মত গোনাহগারদের আখেরাত সুসজ্জিত হতে পারে। আয় আল্লাহ! আমাদের গোনাহ মাফ করে দিন। ইহ ও পরকালে উজ্জ্বল রাখুন আমাদের চেহারাগুলোকে। জাহান্নামের আগুন থেকে আমাদেরকে পরিত্রাণ দান করুন।

যাহোক, প্রিয়নবী (সাঃ) নির্দেশ দিয়েছিলেন একেকটি সওয়ারীর উপরে দু'জন/তিনজন করে পালাক্রমে আরোহণ করতে। তা সত্ত্বেও কোন কোন

সাহাবী স্বীয় পালা অন্যদের দান করেছিলেন। নিজে পায়দল চলতেন অন্যদের আরোহণ করার জন্য। মূলতঃ তাঁরা ছিলেন সওয়াবের কাঙ্গাল। প্রতিটি কাজেই তাঁরা সওয়াব অর্জন করতে চাইতেন।

হযরতে রাসূলে আকরাম (সাঃ) লাবীস এবং আদীকে কুরাইশের সংবাদ আনয়নের জন্য গোয়েন্দা হিসেবে পাঠিয়েছিলেন। এরা বদরে যেয়ে সংবাদ এনেছেন যে, আবু সুফিয়ানের কাফেলা সেখানে অত্যাসন্ন। রাসূলে আকরাম (সাঃ) ইরশাদ করলেন ঃ ইনশাআল্লাহ, আল্লাহ তা'আলা আমাদের দুটি থেকে যে কোন একটি দান করবেন। হয় কাফেলার গনীমতের মাল, না হয় কাফির সেনাবাহিনীর উপর বিজয়।

রাসূলে আকরাম (সাঃ) বহু মনযিল অতিক্রম করে ২য় হিজরীর ১৭ই রমযান শুক্রবার দিবাগত রাত্রে বদর নামক স্থানে গিয়ে পৌঁছলেন।

মূলতঃ বদর একটি কূপের নাম। এই নামের একটি জনপদও সেই কূয়ার সন্নিকটে আছে। সেখানে ছিলো বালুর অনেকগুলো টিলা। টিলাগুলো বিক্ষিপ্ত। এগুলো অত্যন্ত উঁচু এবং সুদীর্ঘ ছিলো। টিলাগুলোর পিছনে সৈন্য লুকিয়ে থাকলেও সন্ধান পাওয়ার কথা নয়। টিলার পাদদেশে ছিলো বদর নামক কূয়াটি।

সাহাবায়ে কেরাম সেখানে অবস্থান করলেন। জামাত সহকারে আদায় করলেন ইশার নামায। নামায শেষে কিছুসংখ্যক সাহাবী বালুর উপর বসে কুরআন শরীফ তেলাওয়াত করছিলেন। বিভিন্ন প্রকার ধর্মীয় বিষয়াদি সম্পর্কে আলোচনা করতে লাগলেন। সারকথা, তাঁরা সেখানে যেয়ে ঘুমাননি। যদিও দীর্ঘক্ষণ হলো সূর্য অস্তমিত হয়েছে। কিন্তু বালু এখনও ঠাণ্ডা হয়নি। এই উত্তপ্ত বালুতেই সাহাবায়ে কেরাম বিক্ষিপ্ত অবস্থায় পড়ে আছেন।

রাসূলে আকরাম (সাঃ) হযরত আলী (রাঃ), জুবাইর ইবন আওয়াম, সা'দ ইবন আবী ওয়াক্কাস, ইবন আমরকে তলব করে তাঁদের বললেন ঃ তোমরা খুব সতর্কভাবে এবং নীরবে কূয়ার কাছে যেয়ে কুরাইশের অবস্থা জেনে এসো। তবে দেখো, 'যরীব' পাহাড়ের দিকে যাবে। তার নিচে নেমে 'কালীব' পর্যন্ত পৌঁছবে। এরপরে সামনে অগ্রসর হবে না।

'যরীব' বদরের একটি পাহাড়ের নাম। 'যরীবের' পাদদেশে রয়েছে কালীব নামক একটি কূপ। নির্দেশ পাওয়া মাত্রই এরা রাতের অন্ধকারে সেখানে যেয়ে পৌঁছলেন। চাঁদ তখনও উদিত হয়নি। কিন্তু চাঁদের কিরণ দিগন্তে কিছুটা ছড়িয়ে পড়ছে। যাতে বোঝা যায়, অতি শীঘ্রই চন্দ্র উদিত হবে। এঁরা বালুর টিলার পিছন দিয়ে পেরিয়ে 'যরীব' পাহাড়ে পৌঁছলেন। সেখান থেকে অবতরণ করলেন নিচে। তখন চাঁদ উদিত হয়েছে। চাঁদের আলো ছড়িয়ে পড়েছে। কূয়ার

কাছে পৌঁছার পর তাঁরা দেখলেন, কুরাইশের কতগুলো দাস পানি বহন করছে। কূপ থেকে পানি ভর্তি করছে তাদের পাত্রগুলোতে। তাদের দেখে সাহাবায়ে কেরাম তাদের উপর আক্রমণ করলেন। অনেকগুলো গোলাম ভীত–সন্ত্রস্ত হয়ে "মুসলমান এসে গেছে, মুসলমান এসে গেছে" এই বলে চিৎকার করে পালাতে লাগলো।

তিনজন গ্রেফতার হলো তাদের হাতে। তন্মধ্যে একজন ছিলো উবায়দা ইবন সাদের গোলাম। দ্বিতীয় জন মুনইয়া ইবনুল হাজ্জাজের দাস আসলাম। তৃতীয় জন ছিলো উমাইয়া ইবন খালফের ক্রীতদাস রাফে'। হযরত আলী (রাঃ) সহ অন্যান্য সাহাবায়ে কেরাম তাদের গ্রেফতার করে রাসূলে কারীম (সাঃ)এর দরবারে হাজির করলেন। নবীজী তখন নামায আদায় করছিলেন। সাহাবায়ে কেরাম তাদের জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কারা? প্রতিউত্তরে তারা বললো, আমরা কুরাইশ সেনাবাহিনীর সাকি। সেনাবাহিনীর লোকজন পানি ভর্তি করে নিয়ে যাওয়ার জন্য আমাদের প্রেরণ করেছে।

সাহাবায়ে কেরাম জানতেন, আবু সুফিয়ানের কাফেলা এখানে কাছেই আশেপাশে কোথাও আছে। এজন্য তাঁরা মনে করলেন, সাকিরা মিথ্যা বলছে। এজন্য তাদের বললেন, তোমরা মিথ্যে বলছো। আসলে তোমরা আবু সুফিয়ানের কাফেলার লোক। এই বলে তাদের মারতে লাগলেন। মারের চোটে ওরা স্বীকার করলো, আমরা কাফেলার লোক। আবু সুফিয়ানের কাফেলা এই টিলার অপর দিকে অবস্থান করছে। ইতোমধ্যে রাসূলে আকরাম (সাঃ) নামায থেকে অবসর হলেন। তিনি বললেন, কত বড় আফসোসের কথা! ক্রীতদাসগুলো যখন সত্য বলছিলো তখন তোমরা তাদেরকে পিটিয়েছিলে। যখন মিথ্যা বলেছে তখন তাদের মার বন্ধ করে দিয়েছো।

সাহাবায়ে কেরাম আরয করলেন, এরা বলছে, কুরাইশ বাহিনী এসে গেছে।

প্রিয়নবী (সাঃ) ঃ তারা সত্য বলেছে।

প্রিয়নবী (সাঃ) গোলামগুলোকে সামনে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ কুরাইশের সেনাবাহিনী কোথায়?

একজন ক্রীতদাস আরয করলো, এই সুবিশাল টিলার পিছনে।

প্রিয়নবী (সাঃ) ঃ সেনাবাহিনীর সাথে কারা কারা এসেছে?

ক্রীতদাস ঃ আবু লাহাব ব্যতীত শীর্ষস্থানীয় সব নেতাই এসেছেন।

প্রিয়নবী (সাঃ) ঃ এদের কেউ প্রত্যাবর্তন করেছে?

গোলাম ঃ আখনাস ইবন শারীক বনী যুহরাকে নিয়ে ফিরে চলে গেছেন।

প্রিয়নবী (সাঃ) ঃ এই সেনাবাহিনীতে লোকসংখ্যা কত?

গোলাম ঃ প্রচুর লোক এসেছে। সঠিক সংখ্যা আমাদের জানা নেই।
প্রিয়নবী (সাঃ) ঃ দৈনিক তারা কতটি উট জবাই করে?
ক্রীতদাস ঃ একদিন দশটি, আরেক দিন নয়টি।
প্রিয়নবী (সাঃ) ঃ মনে হয় নয়শ থেকে হাজার হবে।

রাসূলে করীম (সাঃ) সাহাবায়ে কেরামকে নির্দেশ দিলেন, এ গোলামগুলোকে হেফাজতে রেখো। তাদেরকে কষ্ট দিবে না। সাহাবায়ে কেরাম তাদেরকে নিয়ে গেলেন। প্রিয়নবী (সাঃ) হযরত আম্মার ইবন ইয়াসির এবং মাসউদ (রাঃ)কে নির্দেশ দিলেন কুরাইশের সংবাদ আনতে। আদেশ পাওয়া মাত্র তাঁরা দুজন রওয়ানা হলেন।

৩৮
ভয়-ভীতি

কুরাইশের সাকীরা সত্য কথাই বলেছিলো। মক্কার কাফিররা বদরে এসে বালুর টিলার পিছনে একটি সুপ্রশস্ত ময়দানে অবতরণ করলো। তারা সাকীদেরকে যরীব পাহাড়ের পাদদেশে অবস্থিত কালীব নামক কূয়া থেকে পানি নেয়ার জন্য পাঠিয়েছিলো। পানি নেয়ার জন্য যখন এসেছিলো তখন ছিলো অন্ধকার। এর অল্পকিছুক্ষণ পরেই চন্দ্র উদিত হলো। চাঁদের আলো ছড়িয়ে পড়লো। কুরাইশ সেদিন দশটি উট জবাই করেছিলো এবং সেগুলোর গোশত ভুনা করছিলো। বিভিন্ন স্থানে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত ছিলো গোশত রান্না এবং ভুনা করা উপলক্ষ্যে। হঠাৎ আওয়াজ এলো, "হে কুরাইশ সম্প্রদায়! হুঁশিয়ার, সাবধান মুসলমান এসে গেছে!"

এই আওয়াজ গোটা সেনাবাহিনীতে গুঞ্জরিত হলো। যারাই এই আওয়াজ শুনেছে তাদের প্রতিটি ব্যক্তিই ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে থরথর করে কাঁপতে লাগলো। যারা খানা তৈরী করে খাবার ইচ্ছে করছিলো তাদের হাত থেকে খানা পড়ে গেলো। যারা গোশত ভুনা করছিলো তাদের হাত থেকে মাংসের টুকরা পড়ে গেলো আগুনের উপর। মোটকথা, কেউ খানা খেতে পারলো না।

হাকীম ইবন হিযাম বলেন, আমরা আমাদের তাঁবুতে মাংস ভুনা করছিলাম। আকস্মিক আওয়াজ এলো, "হে কুরাইশ সম্প্রদায়! হুঁশিয়ার, মুসলমান এসে গেছে।" আমার হাত থেকে গোশতের টুকরা পড়ে গেলো। ভয়ে সারা দেহ কাঁপতে লাগলো। বিশেষতঃ আমার অবস্থা এমন হলো, যেন পায়ের ভিতর থেকে মগজ শুকিয়ে গেছে। দাঁড়াতে চাইলাম পারলাম না।

আমি বললাম, লাত, উযযা অনিষ্ট সাধন করুন। এটা হলো ইবন হানজালিয়ার (আবু জেহেলের) কুফা। আবু জেহেল আমাদের সবাইকে জোরপূর্বক বধ্যভূমির দিকে নিয়ে এসেছে। এতে বুঝা যায়, কেউ এসে আগেই মুসলমানদের খবর পৌঁছে দিয়েছে। গোটা বাহিনীতে ভীতি ছড়িয়ে পড়েছে ব্যাপক আকারে। কওমের সম্মানিত এবং বাহিনীর অধিনায়কগণ একজন অপরজনের তাঁবুর দিকে ছুটাছুটি করতে লাগলো। উতবা ইবন রবী'আ হাকীম ইবন হিযামের কাছে দৌড়ে এসে বললো, হাকীম! হুবলের শপথ! আমি এখানে এসে মারাত্মক উদ্বেগ–উৎকণ্ঠায় সময় কাটাচ্ছি। আমি জানি না, তোমার কি অবস্থা।

হাকীম ঃ আমার অবস্থা আপনার চেয়েও খারাপ। ভয় ও উদ্বেগ এতটাই প্রভাব বিস্তার করেছে যার ফলে আমার হাত থেকে খানা পড়ে গেছে। পায়ের শক্তি উধাও হয়ে গেছে। দাঁড়াতেও পারছি না।

উতবা ঃ এই কুফা ইবন হানযালিয়ার আনুগত্যের। আমরা মারাত্মক বোকামী করেছি। যে কাফেলার সাহায্যে আমরা এসেছিলাম তারা তো বেঁচে গেছে। কিন্তু আমাদের মউত আমাদেরকে আমাদের বধ্যভূমির দিকে টেনে এনেছে। তোমার আশংকা হচ্ছে না যে, মুহাম্মাদের বাহিনী আমাদের উপর নৈশ আক্রমণ করবে?

হাকীম ঃ শুধ আশংকাই নয়, বরং আমার দৃঢ় বিশ্বাস। দেখুন, আকাশে ঘনঘটা ছেয়ে আছে। অন্ধকার বিদঘুটে আকার ধারণ করছে। আমাদের উচিত লোকদের এরূপ পরামর্শ দেয়া যাতে উট এবং ঘোড়াগুলো কোন প্রকার আওয়াজ করতে না পারে। অন্যথায় মুসলমানরা আমাদের উপস্থিতি সম্পর্কে টের পেয়ে যাবে। গোটা রাত জাগরণ করে সবাই পাহারাদারী করবে।

উতবা ঃ তুমি সুপরামর্শ দিয়েছো। এই বলে উতবা চলে গেলো এবং ঘোষণা করলো, উট এবং ঘোড়াগুলোর মুখ বেঁধে রেখো। যাতে এগুলো আওয়াজ না করতে পারে। সারারাত সবাই জাগ্রত থেকে পাহারাদারী করবে।

আকাশে তখন মেঘের ঘনঘটা। মেঘখণ্ড আকাশের চতুর্দিকে ছোটাছুটি করছে। সারাদিন ধরে প্রচণ্ড গরম ছিলো। এখন পরিবেশ মোটামুটি ঠাণ্ডা। সুমিষ্ট হাওয়া বয়ে চলেছে। কুরাইশ বাহিনী মুসলমানদের ভয়ে অগ্নিগুলো নিভিয়ে দিয়েছিলো। গোটা ক্যাম্প অন্ধকারে ছেয়ে আছে। পিনপতন নিরবতা বিরাজ করছে। এক ভুতুড়ে পরিবেশ। মনে হচ্ছে যেন এখানে কোন সেনাবাহিনীই অবস্থান করছে না। মক্কার কুরাইশরা উট এবং অশ্বগুলোর মুখে লাঠি দিয়ে পিটাচ্ছে যাতে একটুও আওয়াজ না হয়।

আম্মার এবং মাসউদ কঠোর নিরবতা অবলম্বন করে এখানে আসলেন।

সেনাবাহিনীর সন্নিকটে দাঁড়িয়ে কাফিরদের আচার–আচরণ পর্যবেক্ষণ করছেন। কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে সেখান থেকে ফিরে চলে গেলেন। কুরাইশ রাতভর ভয়ে জাগ্রত থাকলো। খাওয়া–দাওয়া পর্যন্ত করতে পারলো না। ক্ষুধার্ত পিপাসার্ত অবস্থায় বসে বসে কাল কাটালো।

গত রাত আবু জেহেল উতবার কাছে এসেছিলো। উতবা এবং হাকীম তখন একই স্থানে বসেছিলো। আবু জেহেল উতবাকে সম্বোধন করে বললো, কে বলে তুমি অধিনায়কের যোগ্য? তুমি লোকদেরকে রাত্রি জাগরণ এবং হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছো। এটা করে লোকজনের মনে ভীতির সঞ্চার করেছো। গোটা বাহিনী অস্থির। তোমার কি দৃঢ় বিশ্বাস! মুহাম্মাদ এবং তার সাঙ্গপাঙ্গরা আমাদের সেনাবাহিনীর উপর নৈশ আক্রমণে ঝাঁপিয়ে পড়বে? অথচ আমাদের বাহিনী এত বিশাল যে, পাহাড় উল্টে দিতে পারে। লাত ও উযযার শপথ, এটা কক্ষণো হতে পারে না। মুসলমানরা তো ভয়ে ভীত–সন্ত্রস্ত। এই বিশাল বাহিনী মক্কা থেকে বেরিয়েছে বলে কুরাইশ কখনো দেখেছে? তোমরা দেখবে আমাদের এই বাহিনী মুসলমানদের পিষে সমূলে নিপাত করবে। আমি কোনরূপ দ্বিধা–সংশয় ছাড়াই বলছি। তোমরা কাপুরুষ এবং লোকদেরকে তোমরাই হীনবল করছো। আমি আমার দল নিয়ে আলাদা অবস্থান করবো। সবাইকে তাগিদ দিয়ে বলছি, আমাদের হেফাজত কারুর করতে হবে না। আমি দেখবো, মুসলমানরা আমাদের উপর কিভাবে নৈশ আক্রমণ করে।

কতক্ষণ বকাঝকা করে আবু জেহেল এখান থেকে প্রস্থান করলো। উতবা বললো, এ লোকটি একেবারে অকর্মন্য, আস্ত একটি কুফা আর বেআক্কেল। মুহাম্মাদের শিষ্যরা আমাদের সাকীগুলোকে পর্যন্ত গ্রেফতার করে নিয়ে গেছে। অথচ এই খবীস লোকটার এখনও চোখ খোলেনি। আমরা তো তখনই তাকে নির্ভীক, বীরবাহাদুর মনে করতে পারি, যখন সে আমাদের সাকীদের তাদের কাছ থেকে ছাড়িয়ে আনতে পারবে।

হাকীম ঃ ওর কথা বলো না। এ এক পাড় মাতাল, দাম্ভিক, অহংকারী। আজকে আমার অভিজ্ঞতা হলো, বিবেক বুদ্ধি বলতে ওর কিছু নেই। এই বদবখত, আত্মমর্যাদাবোধ উসকে দিয়ে আমাদের এখানে হাজির করেছে। আমি দেখছি, আমাদের মাথার উপর মৃত্যু চক্কর দিচ্ছে। এই কুফা আমাদের সবার প্রাণসংহার করে ছাড়বে। এ সময় সামান্য বৃষ্টি আরম্ভ হলো। গুড়ি গুড়ি বৃষ্টি পড়ছে আকাশ থেকে।

হাকীম বললো ঃ দীর্ঘসময় পর খুব সুন্দর একটি পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে। আকাশের বৃষ্টির ঘনঘটা ছেয়ে আছে। হালকা বৃষ্টি আরম্ভ হয়েছে। এটি ছিলো

আনন্দের সময়। কিন্তু হলে কি হবে, চিন্তা আর উদ্বেগে আমরা জব্দ হয়ে গেছি। নৈশ আক্রমণের ভয়ে সমস্ত আনন্দ একদম উবে গেছে। এ সময় চলতো শরাবের পালা। সুন্দরী যুবতী, মায়াবিনী, ষোড়শীদের নাচগানের আসর লোকজন উপভোগ করতো। এই কুফা ইবন হানযালিয়া এখনও যদি সম্মত হয়ে মুসলমানদের সাথে সন্ধি করে ফেলতো!

হাকীম ঃ তুমি আমার মনের কথাটা ব্যক্ত করেছো। কিন্তু এই বদবখত কি এই কথা মানবে?

বৃষ্টি কিছুটা জোরেশোরে আরম্ভ হলো। বারিবর্ষণের রিমঝিম আওয়াজ আসছে। লোকজন তাঁবুর ভিতরে। যারা ভিতরে তারা তো নিরাপদ। কিন্তু যারা তাঁবুর বাইরে ওরা তো ভিজছে। বৃষ্টি ক্রমশঃ বেড়েই চললো। এবার শুরু হলো মুষলধারে বৃষ্টি। মনে হলো যেন আকাশের জানালাগুলো সব খুলে দেয়া হয়েছে। ফেরেশতারা নিজ হাতে পানি ঢালছে।

বাতাস প্রচণ্ড আকার ধারণ করলো। কাফিরদের তাঁবুগুলো উড়িয়ে নিয়ে যেতে লাগলো। তাঁবুগুলো ধড়াশ ধড়াশ করে পড়ছিলো। তাঁবুর নিচে পড়ছে লোকজন। অনেক কষ্টে তাঁবুর নিচ থেকে ওরা বেরুচ্ছে।

উপর থেকে বৃষ্টি পড়ছে আর নিচে জমেছে পানি। লোকজন ভিজে জড়সড়। এদিকে আবার মুসলমানদের নৈশ আক্রমণের ভয়। কারণ, জোর বৃষ্টির কারণে কোন আওয়াজও শোনা যাচ্ছিলো না। তাদের আশংকা হচ্ছিলো, মুসলমানরা হঠাৎ এসে আক্রমণ করে বসে কিনা। সবাই চৌকান্না। তাঁবুগুলো পড়ার বিকট আওয়াজ যখন হচ্ছিলো, লোকজন হঠাৎ হঠাৎ লাফিয়ে উঠছিলো। তারা মনে করছিলো এই বুঝি মুসলমান এসে গেলো আর মারধর শুরু হয়ে গেলো।

অবশেষে সকালবেলা বৃষ্টি বন্ধ হলো। কয়েকটি তাঁবু তখন দাঁড়িয়ে আছে। অবশিষ্ট সবগুলো পড়ে গেছে। সকালের রশ্মি যখন উজালা হয়ে ছড়িয়ে পড়লো, তখন আকাশের ঘনঘটা দূরীভূত হলো, আসমানে বিক্ষিপ্ত আবরের টুকরাগুলো ছুটোছুটি করছিলো তখন কাফিরদের দেহে কিছুটা প্রাণের সঞ্চার হলো। কাপড়–চোপড় নিংড়িয়ে উঠে চলাফিরা করতে লাগলো। রাতভর দানাপানি তাদের উদরে ঢুকেনি। রাত্রি জাগরণ করে বৃষ্টির পানিতে ভিজছিলো। তাদের অবস্থা ছিলো সকরুণ। হঠাৎ আওয়াজ এলো 'আল্লাহু আকবার।' সবাই ভয়ে ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে দেখতে লাগলো সিংহের ন্যায় মুসলমানরা এগিয়ে আসছে। ভেসে আসছে তাদের পক্ষ থেকে নারায়ে তকবীরের মুহুর্মুহু ধ্বনি।

৩৯
সর্বশেষ প্রচেষ্টা

রাত্রে সাহাবায়ে কেরাম কূপের নিকট একটি বড় হাউজ তৈরী করেছিলেন। শুকনো ঘাসের একটি চালা বা ঝুপড়িও তৈরী করেছিলেন। ঐ ঝুপড়ির কাঠ ছিলো খেজুরের। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন রাত্রে এমন বৃষ্টি দিলেন যারফলে হাউজ পানিতে পরিপূর্ণ হয়ে গেলো।[১] প্রিয়নবী (সাঃ) ঝুপড়ির ভিতর বৃষ্টিতে নিরাপদ রইলেন। সাহাবায়ে কেরামের কিছু কিছু আসবাবপত্র রেখেছিলেন ঝুপড়ির ভিতর। সেগুলো নিরাপদ থাকলো। মুসলমানরা রাত্রে (হালকা) বৃষ্টিতে ভিজলেন। ফজরের নামায পড়ার সাথে সাথেই তারা হাউজের কিনারের দিকে চললেন। এই হাউজের পাড়েই সারিবদ্ধ হলেন তাঁরা। রাত্রে বৃষ্টি হয়েছিলো রাসূলে আকরাম (সাঃ)এর দু'আর বদৌলতে।

কুরাইশরা দেখলো মুসলমানদের সংখ্যা খুবই নগন্য। ফলে তাদের মধ্যে অহংবোধ সৃষ্টি হলো। আবু জেহেল ছিলো বাহিনীর সর্বাধিনায়ক। সেও তার বাহিনীকে সারিবদ্ধভাবে সুবিন্যস্ত করলো। এদিকে রাসূলে আকরাম (সাঃ) মুসলমানদের সারি ও সুবিন্যস্ত করলেন। বাহিনী বিন্যাসের পর হযরত রাসূলে আকরাম (সাঃ) ওমর ইবনুল খাত্তাব (রাঃ)কে নির্দেশ দিলেন কুরাইশের কাছে যেয়ে ঈমানের দাওয়াত দিয়ে প্রমাণ সম্পূর্ণ করো। ওমর ফারুক (রাঃ) চললেন। কুরাইশের কাতারের সন্নিকটে যেয়ে বুলন্দ আওয়াজে বললেন ঃ

"হে কুরাইশ সম্প্রদায়! আমরা এ ব্যাপারে কোন অভিযোগ করছি না যে, তোমরা আমাদের কষ্ট-তকলীফ দিয়েছো, আমাদের উপর জুলুম-নির্যাতন করেছো, করেছো আমাদের দেশান্তর। অবশেষে মদীনায় এসে আক্রমণ করেছো আমাদের চারণভূমিতে। আমরা জিজ্ঞেস করছি, তোমরা আমাদের উপর কেন আক্রমণ করতে এসেছো। আমরা এ পর্যন্ত তোমাদের উপর হামলা করিনি। তোমরা আমাদের আপনজন। আমরা তোমাদের আত্মীয়-স্বজন। পরস্পরে যুদ্ধ-বিগ্রহ করা অনুচিত। আমরা আর তোমরা যেন একই বৃক্ষের বিভিন্ন শাখা। পরস্পরে আমরা যুদ্ধ করলে আমরাই তো দুর্বল হবো। আমরা যদি তোমাদের উপর চড়াও হতাম আর তোমরা যদি আমাদেরকে ফিরে যেতে বলতে তাহলে আমরা ফিরে যেতাম। তোমরা আমাদের উপর আক্রমণ করতে

টীকা-১. ঐতিহাসিক গ্রন্থাবলীতে পাওয়া যায় যে, সে বৃষ্টি কাফিরদের দিকে হয়েছিলো মুষলধারে আর মুসলমানদের দিকে হালকা। এটা ছিলো খোদায়ী মদদের চমৎকার দৃষ্টান্ত।—অনুবাদক।

এসেছো, আমরা তোমাদের বলছি ফিরে যাও। বস্তুতঃ আমরা তোমাদের বিরুদ্ধে লড়াই করা ভালো মনে করি না। তোমরাও লড়াইকে সুনজরে দেখবে না। নিজেদের আত্মীয়তার কথা স্মরণ করো।

হাকীম ইবন হিযাম ঃ ওমর ইবনুল খাত্তাব ইনসাফের কথা বলেছে। তার উক্তি খুবই যুক্তিসংগত। তার এই কথা মেনে নেয়া উচিত। এবার যদি ভুল করো তাহলে তোমাদের এরজন্য লজ্জিত হতে হবে।

আবু জেহেল চিৎকার করে বলে উঠলো ঃ তোমরা কি ধরনের কথা বলছো? এখনও বুঝতে পারছো না তোমরা, মুহাম্মাদ এবং তার সাঙ্গপাঙ্গদের উপর আমাদের প্রভাব বিস্তার করেছে। আমাদের সুবিশাল বাহিনী দেখে প্রভাবিত হয়েছে তারা। তারা এখন আমাদের আওতার ভিতরে এসে গেছে। আমরা ইচ্ছে করলেই তাদের পদদলিত করে—পিষে দিতে পারি। চিরদিনের জন্য ঝগড়া চুকিয়ে দিতে পারি। এ মুহূর্তে আমরা প্রত্যাবর্তন করে আমাদের ললাটে বদনামীর দাগ লাগাবো? এই রকম আত্মমর্যাদাবোধহীন কর্মের চেয়ে আমাদের মরে যাওয়াই শ্রেয়। হে উমর! আমরা ফিরে যাওয়ার মতো ব্যক্তিত্ব নই। আমরা লড়বো এবং তোমাদের প্রাণসংহার করবো।

ওমর ইবনুল খাত্তাব ঃ ইবন হানজালিয়া! সেই পবিত্র সত্তার কসম! যার কুদরতি হাতে আমার প্রাণ, আমি কক্ষণো তোমার কাছে আসতাম না, কারণ, আমি খুব ভালো করেই জানি, তুমি উচ্ছৃংখল এক বাচাল। কিন্তু আমাকে বাধ্য করেছেন সে রাসূলে খোদা (সাঃ), যিনি সারা বিশ্ববাসীর জন্য রহমতস্বরূপ পৃথিবীতে আগমন করেছেন। আমরা আমাদের পক্ষ হতে প্রমাণ সম্পূর্ণ করেছি। এবার আল্লাহর গযব তাদের উপর পতিত হবে যারা সত্যের প্রতি স্বীকৃতি দেয় না। তোমরা চিন্তা করে নাও। মাত্র চার ঘন্টা তোমাদের সুযোগ দেওয়া হলো।

এই বলে হযরত ওমর (রাঃ) ফিরে চলে আসলেন। প্রিয়নবী (সাঃ) তখন তাশরীফ রাখছিলেন স্বীয় ঝুপড়িতে। তিনি তন্দ্রাচ্ছন্ন। হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) তাঁর সান্নিধ্যে বসা। হঠাৎ নবী করীম (সাঃ) চোখ খুললেন। মুচকি হেসে বললেন, মুবারক সংবাদ। বিজয়। হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) আরয করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার মাতাপিতা আপনার প্রতি উৎসর্গ হোক। আল্লাহ তা'আলা আপনাকে সর্বদাই মুচকি হাসিতে রাখুন। এ সময় কি কোন অহী নাযিল হয়েছে? রাসূলুল্লাহ (সাঃ) উঠে বসে গেলেন। বললেন, হাঁ। নবী করীম (সাঃ) তখনই বাইরে বেরিয়ে এলেন। আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) এলেন তাঁর পিছু পিছু। প্রিয়নবী (সাঃ) বললেন ঃ মুবারক সংবাদ! আল্লাহ তা'আলা এই যুদ্ধের ফয়সালা দিয়েছেন—বিজয়। এই মাত্র

অহী অবতীর্ণ হলো। এর অর্থ হলো, শত্রু বাহিনী পরাস্ত হবে। ওরা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে পালাবে। এই শুভ সংবাদ শুনে সাহাবায়ে কেরাম যারপরনাই আনন্দিত হলেন। লক্ষণীয় বিষয় হলো, এই ভবিষ্যদ্বাণী তিনি তখন করছিলেন যখন হক ও বাতিল পরস্পরে রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ। বাতিল বিরাট শান–শওকত ও জাঁকজমকে বীরবিক্রমে যুদ্ধের প্রস্তুতি নিয়ে এসেছে। তাদের বিপরীতে মুসলমানদের তেমন কিছুই ছিলো না। মুসলমানরা ছিলেন সংখ্যালঘু। অস্ত্র ও জনবল সবদিক দিয়েই তারা দুর্বল। উল্লেখযোগ্য কোন অস্ত্র–শস্ত্রই তাদের ছিলো না। সংখ্যায় তারা কাফিরদের এক–তৃতীয়াংশ। এমত অবস্থায় বিজয়ের শুভ সংবাদ সত্যিই মহাবিস্ময়ের ব্যাপার!

ওমর ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) সামনে অগ্রসর হয়ে আরয করলেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা প্রমাণ সম্পূর্ণ করেছি। কাফিররা কল্লা কাটানোর জন্যে এবং যুদ্ধ করার জন্যে, আমাদের প্রাণসংহারের জন্যে প্রস্তুত।

প্রিয়নবী (সাঃ) ঃ আল্লাহ তা'আলা তাদের ঘাড় মটকে দিবেন। রাসূলে আকরাম (সাঃ) হাতে একটি তীর নিয়ে সাহাবায়ে কেরামের সারিগুলো সোজা[১] করছিলেন। মাঝখানে দাঁড়িয়ে তিনি ইরশাদ করলেন ঃ

হে আমার সাহাবী সম্প্রদায়! সর্বপ্রথম আমি প্রশংসা করছি সে মহান রাব্বুল আলামীনের যিনি এক, লা–শরীক, যার মুঠোয় আমাদের এবং তোমাদের সবার প্রাণ। তিনি আমাদের সৃষ্টি করেছেন, তিনিই আমাদের মৃত্যু দিবেন। অতঃপর .....। আল্লাহু রাব্বুল আলামীন আমাদেরকে জিহাদের নির্দেশ দিয়েছেন। জিহাদ সর্বশ্রেষ্ঠ ইবাদত। জিহাদকারী জান্নাতের যোগ্য। যদি সে শহীদ হয়, কোন প্রকার হিসাব নিকাশ ব্যতিরেকেই সে যাবে জান্নাতে। বেঁচে থাকলে সে গাজী হিসাবে আখ্যায়িত হবে। পরকালে পাবে জান্নাত।

টীকা–১. জিহাদকালে সারিবদ্ধ করার সময়কার এক বিস্ময়কর ঘটনা। সাওয়াদ ইবন গাযিয়্যা (রাঃ) কাতার থেকে বেরিয়ে আছেন। প্রিয়নবী (সাঃ) হাতের তীর দ্বারা আস্তে করে তার পেটে আঘাত করে বললেন, সোজা হয়ে দাঁড়াও। তিনি উহ্ করে চিৎকার করে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি কষ্ট পেয়েছি। আপনি সত্য ও ইনসাফ নিয়ে আগমন করেছেন। আমাকে এর প্রতিশোধ নেবার সুযোগ দিন। রাসূলে করীম (সাঃ) তৎক্ষণাৎ জামা উপর দিকে তুলে পেট মুবারক খুলে দিলেন। সাওয়াদ অগ্রসর হয়ে অত্যন্ত উৎসাহ–আগ্রহের সাথে নবীজীর (সাঃ) দেহে চুম্বন করে আরয করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি কি প্রতিশোধ নেবো? মৃত্যু সামনে দণ্ডায়মান। বিদায়কাল সন্নিকটে। মনের আকাংখা ছিলো জীবনের এ অন্তিম মুহূর্তে আপনার দেহ মুবারকে চুম্বন করবো। তাই এ কৌশল অবলম্বন করলাম। এতদশ্রবণে নবীজী মুচকি হেসে তার জন্য দুআ করলেন।—তারীখে ইসলাম ঃ ১৬৩।—অনুবাদক।

হে মুজাহিদগণ! আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করো। আল্লাহর গযবকে ভয় করো। যারা জিহাদ থেকে পলায়ন করবে তাদের প্রতি আল্লাহর গযব নাযিল হয়। মুসীবতের পর শান্তি, কষ্টের পর আরাম, অবমাননার পর ইযযত লাভ হয়। তলোয়ারের ছায়ায় জান্নাত। পরীক্ষার সময় এসে গেছে। এই পরীক্ষায় তোমরা সাফল্য অর্জন করো। আল্লাহ তা'আলা তোমাদের পৃষ্ঠপোষক থাকবেন, দিবেন নাজ ও নিয়ামত। সত্য ও মিথ্যার এই প্রথম রণক্ষেত্র। তাগুতি শক্তিগুলো হককে চিরতরে মিটিয়ে দিতে চায় কিন্তু আল্লাহ তা'আলা সত্যকে বুলন্দ করবেন। আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের সাহায্যের উপর ভরসা করো। অবশ্যই তিনি তোমাদের সাহায্য করবেন। সফলতা অবশ্যই তোমাদের পদচুম্বন করবে ইনশাআল্লাহ। প্রিয়নবী (সাঃ)এর জ্বালাময়ী ভাষণ শুনে সাহাবায়ে কেরামের অন্তর আলোকোজ্জ্বল হচ্ছিলো। তাদের দৃষ্টির সামনে যেন জান্নাতের ছবি চিত্রিত হচ্ছিলো। তারা কাফিরদের প্রাণসংহার ও নিজেদের জান উৎসর্গ করার জন্য পরিপূর্ণ প্রস্তুত হলেন।

রাসূলে আকরাম (সাঃ) যখন ভাষণ দিচ্ছিলেন তখন কুরাইশ বাহিনীতে বিভিন্ন প্রকার চেঁচামেচি হচ্ছিলো। লোকজন লড়াই অপেক্ষা সন্ধিকে ভালো মনে করতে লাগলো। কুরাইশের কয়েকজন সম্মানিত ব্যক্তি উমাইর ইবন ওয়াহাবকে মুসলিম বাহিনীর সংবাদ নেয়ার জন্যে পাঠিয়েছিলো। সে ফেরত চলে গিয়েছিলো। সেখানে যেয়ে সে বললো, আমি মুসলমানদের সংবাদ নিয়ে এসেছি। তিনশ'র বেশী হবে না ওরা। বাহ্যতঃ মনে হলো তারা যেন ব্যাঘ্র ও সিংহ। তাদের চেহারায় মাহাত্ম্য, আবেগ–স্পৃহা ও বীরত্ব প্রকাশমান। তারা মৃত্যুকে পরোয়া করে না। লাত ও উযযার শপথ, তাদের মধ্যে অস্থিরতা অথবা ভয় ভীতির নামগন্ধও নেই। তারা যুদ্ধের ভীষণ প্রত্যাশী। মৃত্যু তাদের সামনে। তারা যদিও আমাদের নাগালে কিন্তু তাদের সাথে যুদ্ধ মৃত্যুকে আহবান করার নামান্তর।

হাকীম ইবন হিযাম উতবা ইবন ওয়ালীদকে সম্বোধন করে বললো ঃ উমায়েরের কথাগুলো শুনলে?

উতবা ঃ শুনেছি। প্রথমেই আমি এ সব কথা বলেছিলাম। মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ মানে মউতের সাথে লড়াই করা।

হাকীম ঃ তাহলে একটি কাজ করো, যাতে তোমারও সুখ্যাতি হয় এবং পরবর্তীতে তুমি কুরাইশের স্বীকৃত নেতাও হয়ে যাও। কেউ কেউ জেদ ধরে বসে আছে যে, মুসলমানরা 'বাতনে নাখল'[1] নামক স্থানে আমাদের লোকজনের

টীকা–১. কোন কোন গ্রন্থে এ স্থানটির নাম 'বাতনে নাখলা' উল্লেখ করা হয়েছে।—অনুবাদক।

উপর আক্রমণ করেছে। হত্যা করেছে আমর ইবন আবদুল্লাহ হাযরামীকে। তোমরা সে কাফেলার মালের বিনিময় ও নিহত ব্যক্তির খুনের রক্তপণ দিয়ে দাও এবং লোকদেরকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে ফেরত নিয়ে চলো।

উতবা ঃ আমি তা মঞ্জুর করলাম। এ ব্যাপারে আমি চেষ্টা করবো। এই বলে উতবা সেনাবাহিনীর সামনে যেয়ে উচ্চকণ্ঠে বললো, হে কুরাইশ সম্প্রদায়! তোমরা উমর ইবনুল খাত্তাবের বক্তব্য শুনেছো। শুনেছো উমায়ের ইবন ওয়াহাবের মন্তব্য। আমি প্রথম থেকে বলে আসছিলাম আবারও বলছি, মুহাম্মাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা উচিত হবে না। তবে এর কারণ এটা নয় যে, আমি মুহাম্মাদকে রাসূল স্বীকার করি। যদি তাই হতো, তাহলে তো আমাদের আর তাদের সাথে কোন বিবাদই থাকতো না। বরং আমি এজন্যই বলছি যে, তারা তোমাদের নিকটাত্মীয়। যারা তার অনুসারী তারা তোমাদেরই ভাই-বন্ধু। তারা মারা গেলে তাদেরই ভাই-বেরাদরদের দুঃখ হবে। তারাও যখন তোমাদের ঘাতক মনে করবে তখন তাদের চোখে পানির স্থলে রক্ত আসবে। সম্ভাবনা আছে তারা কোন সময় নিজেদের নিয়ন্ত্রণ করতে না পেরে ভাইয়ের ঘাতককে হত্যা করবে। এভাবে কওমের মধ্যে রক্তারক্তির এক ধারাবাহিকতার সূচনা হবে। আমার কথা শুনো। তোমরা ফেরত চলে এসো। এতেই রয়েছে জাতির কল্যাণ। মুসলমানরা তোমাদের যে কাফেলার উপর 'বাতনে নাখলে' আক্রমণ করেছিলো, ছিনতাই করেছিলো মালামাল, তার বিনিময় তোমরা আমার কাছ থেকে নেবে। যারা সেখানে নিহত হয়েছে, তাদের রক্তপণ আদায় করবে আমার নিকট থেকে। ব্যর্থতা এবং কাপুরুষতার অভিযোগও আমার মাথায় অর্পণ করবে। এখানে থেকে ফিরে চলো।

অনেকেই বললো, উতবা যুক্তিপূর্ণ কথা বলেছে। নাজানি এই যুদ্ধ কত অসংখ্য যুদ্ধের সূচনা হয়ে দাঁড়ায়। লড়াই করা আমাদের উচিত হবে না।

এতদশ্রবণে আবু জেহেল জটিলতার শিকার হলো। সে বুঝতে পারলো এ মুহূর্তে যদি উতবা কুরাইশকে ফেরত নিয়ে যায় তাহলে জাতীয় স্বীকৃত নেতা হবে সেই। এবং আবু জেহেলের প্রভাব-প্রতিপত্তি ধুলায় লুণ্ঠিত হবে। তাই সে চিৎকার করে বলে উঠলো ঃ তোমরা উতবার প্রতারণায় পড়বে না। তার ছেলে আছে মুহাম্মাদের আওতায়। মুহাম্মাদ তার চাচাতো ভাই। সে কোনক্রমেই চায় না, তার সন্তান এবং ভাতিজা মারা পড়ুক। ও কাপুরুষ। উভয় দলের লোকজন যুদ্ধের জন্য তৈরী করার পর ফিরে চলে যাওয়ার কোন প্রশ্নই আসে না।

উতবা অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হয়ে বললো ঃ ও ছেড়া তেনা অসভ্য! তুই আমার উপর কাপুরুষতার অভিযোগ এনেছিস। অতি শীঘ্রই জানতে পারবি

কাপুরুষ কে। এই বলে উতবা ক্রুদ্ধ হয়ে আবু জেহেলের ঘোড়ার পায়ের রগগুলো কেটে ফেললো। বললো, যা এবার পায়ে হেঁটে যুদ্ধ কর।

আবু জেহেল লজ্জিত হলো এবং আমর ইবন হাযরামীর ভাই আমের ইবন আবদুল্লাহ হাযরামীর কাছে গেলো। তাকে বললো, উতবা লোকদেরকে বিভ্রান্ত করে ফেরত নিয়ে যেতে চাইছে। জাতির সামনে যেয়ে তুমি ফরিয়াদ করো। এতদশ্রবণে আমের সেনাবাহিনীর সামনে যেয়ে চিৎকার করে বললো, হায় আমর! হায় আমর!! আমি আমার ভাইয়ের রক্তের বিনিময় রক্ত দ্বারা নিতে চাই। তার রক্ত বিক্রি করবো না। এই খুনের প্রতিশোধ নেয়া গোটা জাতির জন্য আবশ্যক। তার বক্তব্য শুনে গোটা বাহিনীতে চরম উত্তেজনার সৃষ্টি হলো। সবাই প্রস্তুত হলো মরা ও মারার জন্য।

৪০
যুদ্ধের সূচনা

সাহাবায়ে কেরাম অপেক্ষা করছিলেন—কুরাইশ ফিরে যায়, না যুদ্ধ আরম্ভ করে। তারা দেখলেন আসওয়াদ ইবনুল আসাদ মাখযুমী চিৎকার করে বেরিয়ে এলো। সে বলছিলো, আমি পবিত্র হুবলের শপথ করে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম মুসলমানদের হাউজ থেকে পানি পান করবো, সে হাউজ ভেঙ্গে ফেলবো। এ কর্মটি অবশ্যই আমাকে সম্পাদন করতে হবে। রাসূলে আকরাম (সাঃ) হযরত হামযা (রাঃ)কে ইঙ্গিত করলেন, তিনি যেন উন্মুক্ত তলোয়ার নিয়ে সামনে অগ্রসর হন। আসওয়াদও তরবারী কোষ উন্মুক্ত করলো। হামযাকে লক্ষ্য করে বললো ঃ তুমি পিছনে সরে যাও। আমি আমার প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করবো। হযরত হামযা (রাঃ) উত্তেজিত কণ্ঠে বললেন, মৃত্যুর সাথে খেলা করতে যেয়ো না। ফিরে চলে যাও। তাতেই কল্যাণ।

আসওয়াদ তলোয়ারের আক্রমণ চালালো। হামযা (রাঃ) ঢাল দিয়ে তা প্রতিহত করলেন। পাল্টা আক্রমণ করলেন তরবারীর। আসওয়াদের একটি পাও কেটে গেলো। হাউজের কাছে যেয়ে লাফ দিয়ে সে ভিতরে পড়ে গেলো। প্রথমে সে পানি পান করলো, অতঃপর নিরাপদ পায়ে হাউজের পাড় ভাঙ্গতে লাগলো। হযরত হামযা (রাঃ) লাফিয়ে তার উপর পড়লেন এবং তাকে হত্যা করে লাশ হাউজের বাইরে ছুড়ে মারলেন। পৌত্তলিকরা তাদের সারিতে দাঁড়িয়ে এই অবস্থা পর্যবেক্ষণ করছিলো। তাদের একটি লোক নিহত হলো—এটাকে তারা অশুভ লক্ষণ মনে করলো। কিন্তু করবে কি! যুদ্ধের সূচনা হয়ে গেছে। মনে উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছে। যুদ্ধ উন্মাদনার ঢেউ খেলছে।

যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী হলে কুরাইশ বাহিনীর তিনজন আরোহী সারি থেকে বেরিয়ে মুসলমানদের দিকে অগ্রসর হলো। দু' বাহিনীর মাঝখানে দাঁড়িয়ে যোদ্ধাদের তলব করতে লাগলো। এই তিনজন হলো, উতবা, শায়বা এবং ওয়ালীদ ইবন উতবা।

তৎক্ষণাৎ মুসলিম যোদ্ধাদের মধ্য থেকে তিনজন আনসারী যুবক বেরিয়ে এলেন। এঁরা হলেন—দুই সহোদর—আউফ,[১] মুআওয়ায আবদুল্লাহ ইবন রাওয়াহা (রাঃ)।

উতবা জিজ্ঞেস করলো, তোমরা কারা?

আউফ প্রতিউত্তরে বললেন ঃ আমরা আনসার। মূলতঃ আনসারীরা মদীনার অধিবাসী। মদীনাবাসীরা মুহাজিরদের সাহায্য করেছিলেন বলেই তাদেরকে আনসার বলা হয়। মক্কাবাসী মদীনাবাসীদেরকে নিজেদের সমকক্ষ মনে করতো না বরং তাদেরকে নিজেদের তুলনায় হীন ও নিচু (চাষা) মনে করতো। এইজন্য তারা মুখ ভেংচিয়ে সদম্ভে বললো, তোমাদের সাথে আমাদের যুদ্ধের প্রয়োজন নেই। হে মুহাম্মাদ! আমাদের সাথে যুদ্ধ করার জন্য আমাদের স্বজাতির লোকদের থেকে কাউকে পাঠাও।

প্রিয়নবী (সাঃ) হযরত হামযা, আলী, উবাইদা ইবন হারিস (রাঃ)কে প্রেরণ করলেন। এঁরা তিনজন রণক্ষেত্রে পৌঁছলেন। ফিরে চলে আসলেন আউফ, মুআওয়ায এবং আবদুল্লাহ তিনজন বিষন্ন মনে।

এ মুহূর্তেই উতবার সন্তান যিনি মুসলমান হয়ে গিয়েছেন প্রিয়নবী (সাঃ)—এর খেদমতে উপস্থিত হয়ে আরয করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ ! আমি লজ্জিত। আমার পিতা ইসলাম গ্রহণ করেনি। বংশ কৌলিন্য আর আভিজাত্যের অহংকারে সে ফুলে আছে। আমাকে অনুমতি দিন তার মস্তক কেটে আপনার কাছে হাজির করি।

বিস্ময়ের ব্যাপার হলো, যারা ইসলাম গ্রহণ করে তাদের সম্পর্ক মুসলমানদের সাথে ভ্রাতৃত্বের হয়ে যেতো। আর কাফির মাতাপিতা ভাইবোন ও আত্মীয়—স্বজন থেকে তারা সম্পর্ক ছিন্ন করে ফেলতেন। তাদেরকে অন্যান্য কাফির মুশরিকদের মতো মনে করতেন। হযরত হুযাইফা (রাঃ) স্বীয় পিতার বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য অনুমতি চাইলেন। এটা এক বিস্ময়ের ব্যাপার। আসলে ইসলাম গ্রহণের পর একজন মুসলমানের চরিত্রই হয়ে যেতো ভিন্নরকম। কোন প্রকার আত্মীয়তার সম্পর্কই তখন থাকতো না ইসলামী ভ্রাতৃত্বের মুকাবিলায়।

টীকা—১. বিশুদ্ধ রেওয়ায়াতে আউফের স্থলে মু'আয (রাঃ)—এর নাম উল্লেখ করা হয়েছে।—অনুবাদক।

প্রিয়নবী (সাঃ) তাকে পিতার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য প্রেরণ করলেন না। তার ইসলামপ্রিয়তার প্রশংসা করলেন কিন্তু পিতার বিরুদ্ধে লড়াইয়ের অনুমতি দিলেন না।[১]

উতবা যদিও হযরত হামযা, আলী এবং উবাইদা (রাঃ)কে খুব ভালো করেই চিনতো তা সত্ত্বেও জিজ্ঞেস করলো ঃ তোমরা কারা?

হযরত হামযা (রাঃ) প্রতিউত্তরে বললেন ঃ আমরা সেসব লোক যাদের সম্পর্ক তোমাদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। আমরা মুসলমান। এক খোদায় বিশ্বাসী। আমরা এক খোদার ইবাদত করি। তোমরা প্রতিমার উপাসক। তোমরা আমাদের ভুলে গেছো। শোন, আমি হামযা ইবন আবদুল মুত্তালিব, এ আলী ইবন আবী তালেব, ইনি ওবায়দা ইবন হারিস।

উতবা ঃ বাস্তবেই তোমরা আমাদের বংশের লোক। আমরা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবো। কিন্তু তোমরা কি আমাদের শক্তি ও শান-শওকত প্রত্যক্ষ করছো না। আমাদের বিশাল বাহিনী ও সাজ-সরঞ্জাম দেখছো না? তোমরা কি এখনও বিজয়ের প্রত্যাশা করছো? লাত ও উযযার শপথ! তোমাদের কেউ জ্যান্ত যেতে পারবে না। তোমাদের সবাই নিহত হবে। অথবা গ্রেফতার হয়ে গোলামীর জিন্দেগী যাপন করবে। ইসলাম ছেড়ে তওবা করো। এটাই তোমাদের জন্য উত্তম।

হযরত হামযা (রাঃ) ক্রোধে ফেটে পড়লেন। তিনি বললেন, স্বীয় শক্তি-সামর্থ্য ও সৈন্যবলে তোমরা আত্মগর্বী। আমরা সে আল্লাহর উপর ভরসা করি, যিনি হযরত ইবরাহীম খলীলুল্লাহকে নমরুদের ন্যায় জালিম শক্তিধর থেকে রক্ষা করেছেন। নমরুদকে একটি মশার মতো মূল্যহীন বস্তু দিয়ে ধ্বংস করেছেন। নেহায়েত দুর্বল বনী ইসরাঈল এবং মুসা (আঃ)কে ফিরআউন এবং তার বিশাল বাহিনীর হাত থেকে মুক্তি দিয়েছেন। কিসের গর্ব তোমাদের? তোমাদের বাহিনী আর কত বড় বিশাল। অতি শীঘ্রই তোমরা স্বীয় দম্ভ ও অহংকারের পরিণতি দেখবে।

ওয়ালীদ ক্রোধান্বিত হয়ে বললো ঃ কল্পনার ফানুস উড়াচ্ছো। অদেখা খোদার উপাসনাকারীরা! তোমাদের খোদা আমাদের একটি পশমও বাঁকা করতে পারবে না। মুহাম্মাদ এবং তোমাদের, তোমাদের সাঙ্গপাঙ্গদের অতি শীঘ্রই জানা হয়ে যাবে যে, যে খোদার সাহায্যের উপর তোমরা ভরসা করছো সে খোদা তোমাদের কোনই সাহায্য করতে পারেনি। মৃত্যু তোমাদের অতি দ্রুতই জাপটে ধরবে।

টীকা-১. বিষয়টি বাস্তবনির্ভর বলে মনে হয় না।—অনুবাদক।

হযরত আলী (রাঃ) গর্জন করে বললেন ঃ ও তাগুতের উপাসক! অনর্থক গালগল্প করে সময় নষ্ট করো না। হয় ক্ষমা প্রার্থনা করো, অস্ত্র সমর্পণ করো, আমাদের যুদ্ধবন্দী হয়ে যাও অন্যথায় লড়তে আসো।

উতবা, শায়বা, ওয়ালীদ তিনজন ক্রুদ্ধ হলো। তরবারী কোষ উন্মুক্ত করলো তারা। এদিকে হযরত হামযা, হযরত আলী এবং হযরত উবাইদা (রাঃ) তরবারী কোষ উন্মুক্ত করলেন। ওয়ালীদ হযরত আলীর বিরুদ্ধে, উতবা হযরত হামযার মোকাবিলায় এবং শায়বা হযরত উবাইদার বিপরীতে যুদ্ধের জন্য অগ্রসর হলো।

যেহেতু রাত্রে বৃষ্টিপাত হয়েছিলো এজন্য সূর্যের কিরণগুলো কিছুটা সোনালী মনে হচ্ছিলো। পরিস্কার পরিচ্ছন্ন তলোয়ারগুলো সূর্যের সোনালী আলোতে দীপ্তিমান হয়ে উঠলো। ঝিকমিক ঝিকমিক করতে লাগলো। তারা পরস্পরে সংঘর্ষের জন্যে সামনে বাড়লো।

উতবা, শায়বা, ওয়ালীদ তিনজনই ছিলো মক্কার নির্বাচিত বীরবাহাদুর। গোটা হিজাযে তাদের বাহাদুরী আর বীরত্বের স্বীকৃতি ছিলো। বীরত্বের উপর তাদের নিজেদেরও ছিলো অহংবোধ। তাছাড়া তিনজনই ছিলো আরোহী। লৌহবর্ম পরিহিত। তাদের অস্ত্র–শস্ত্রগুলো ছিলো উন্নতমানের, প্রোজ্জ্বল, ধারালো, সুসজ্জিত।

হযরত হামযা, হযরত আলী, হযরত উবাইদা (রাঃ) তিনজনই ছিলেন পদাতিক। লৌহবর্ম, বর্ম ইত্যাদি কিছুই ছিলো না তাদের। সম্পূর্ণ অস্ত্র–শস্ত্র তাদের কারো কাছেই ছিলো না। তারা কোন কিছুরই পরওয়া করেননি। আল্লাহর উপর ভরসা করেই যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছেন।

সর্বপ্রথম ওয়ালীদ হযরত আলী (রাঃ)এর উপর জোরালো আক্রমণ চালালো। হযরত আলী (রাঃ) তাঁর তলোয়ারের আঘাত ঢালে প্রতিহত করলেন। অতঃপর পাল্টা আক্রমণ চালালেন। ওয়ালীদ ছিলো খ্যাতনামা, সুনিপুণ, অভিজ্ঞ যুদ্ধবাজ। তার বিপরীতে আলী (রাঃ) ছিলেন স্বল্পবয়স্ক। যুদ্ধের তেমন একটা সুযোগও তাঁর হয়নি। ওয়ালীদের প্রত্যাশা ছিলো শীঘ্রই সে তাকে কাবু করে ফেলতে পারবে। কিন্তু বীরকেশরী হযরত আলী (রাঃ)–এর স্বতঃস্ফূর্ততা এবং রণকৌশল দেখে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়লো। ওয়ালীদ পুনরায় আলী (রাঃ)–এর উপর আক্রমণ চালালো। এবারও আলী (রাঃ) প্রতিহত করলেন তার এই আক্রমণ। স্বতঃস্ফূর্তভাবে পাল্টা আক্রমণ চালালেন তিনি। হযরত আলী (রাঃ)–এর তরবারী ওয়ালীদের ঢাল ভেঙ্গে দু' টুকরো করে ফেললো।

ওয়ালীদ ভীত–সন্ত্রস্ত হয়ে পড়লো। হায়দরী আক্রমণের অভিজ্ঞতা হলো

তার। তলোয়ারের ঝলকে সে নিজের মৃত্যু প্রত্যক্ষ করতে লাগলো। ওয়ালীদ এখনও ভীত–সন্ত্রস্ত হয়ে কাঁপছিলো। এ মুহূর্তে মহাবীর হযরত আলী (রাঃ) পুনরায় আক্রমণ চালালেন। তলোয়ার গর্দানের উপর পড়লো। শশার মতো তার গর্দান কেটে দু' টুকরো করলো। খুনের ফোয়ারা বইতে শুরু করলো। লাশ পড়লো জমিনের উপর। স্বয়ং তারই অশ্ব অহংকারী মনিবকে পদদলিত করে চললো।

উতবা হযরত হামযা (রাঃ)–এর উপর আক্রমণ চালালো। এরা দুজনই ছিলেন বিখ্যাত যুদ্ধবাজ, বীরবাহাদুর। বীরবিক্রমে এরা যুদ্ধ করছিলেন। উতবা যেহেতু আরোহী ছিলো আর হামযা ছিলেন পদাতিক। এজন্য তার দৃঢ় বিশ্বাস ছিলো হামযার প্রাণসংহার সে করবেই। কিন্তু হামযা (রাঃ) তলোয়ার উত্তোলন করে তার গর্দানের উপর আক্রমণ চালালেন এবং একই আঘাতে মস্তক তার দ্বিখণ্ডিত হয়ে পড়লো। জমিনের উপর লাশ পড়ে তড়পাতে লাগলো।[১]

শায়বা হামলা চালালো হযরত উবায়দা (রাঃ)এর উপর। উবায়দা (রাঃ) ঢালের সাহায্যে তার হামলা প্রতিহত করলেন। শায়বার আক্রমণ তার ঢালকে দ্বিখণ্ডিত করলো। শায়বা স্বতঃস্ফূর্তভাবে দ্বিতীয়বার আক্রমণ চালালো। শায়বার তলোয়ার তার গর্দানের উপর পড়লো। মারাত্মক আহত হলেন তিনি। শায়বা দ্রুত অশ্ব থেকে লাফিয়ে তাকে কতল করার জন্য উদ্যত হলো। হযরত আলী (রাঃ) ধমক দিয়ে বললেন, শায়বা! কোথায় যাচ্ছো?

টীকা–১. রাসূলে আকরাম (সাঃ)এর জীবনী লেখকগণ এক্ষেত্রে কেবল সংখ্যার ও সাজ–সরঞ্জামের তারতম্য প্রদর্শন করতঃ এই পরীক্ষার গুরুত্ব প্রতিপাদন করেছেন। কিন্তু মূলতঃ এই অনল পরীক্ষার গুরুত্বের আরও একটি দিক আছে, সেটি বীরত্ব, দৈহিক বল বা সমরপটুতার সাথে সংশ্লিষ্ট নয়—সেটি হচ্ছে বিশ্বাস ও ঈমানের শক্তি পরীক্ষা। পাঠক, একবার কল্পনানেত্রে চেয়ে দেখুন, স্বীয় প্রাণপ্রতীম পুত্র আবদুর রহমানকে অগ্রসর হতে দেখে আবু বকর উলঙ্গ তরবারী হাতে তাঁর প্রাণবধ করার জন্য অগ্রসর হচ্ছেন। উতবার এক পুত্র হুজায়ফা পূর্বেই মুসলমান হয়েছিলেন। পিতাকে সমরক্ষেত্রে অগ্রসর হতে দেখে তিনি মোকাবিলার জন্য ব্যাকুলতা প্রকাশ করছেন। হযরত উমরের তরবারীর আঘাতে তার মাতুলের দেহ দ্বিখণ্ডিত হচ্ছে। আল্লাহর নামে এবং সত্যের সেবায় এমন করে সকল মায়ার বাঁধনকে কেটে ফেলা, সহস্র রুস্তমের মুণ্ডপাত করা অপেক্ষা অধিকতর দুঃসাধ্য। এ পরীক্ষায় প্রাতঃস্মরণীয় সাহাবীগণ যে সফলতা প্রদর্শন করেছেন, জগতের ইতিহাসে তার তুলনা খুঁজে পাওয়া যাবে না।—অনুবাদক।

দেখ মৃত্যু তোমার জন্য অপেক্ষমান। সে হযরত আলী (রাঃ)–এর দিকে ফিরে এলো। হযরত আলী (রাঃ) তলোয়ার উত্তোলন করে তার উপর হামলা করলেন। শায়বা অচেতন অজ্ঞান হয়ে পড়লো। তরবারী গর্দানের উপর পড়ে দেহ থেকে মস্তক বিচ্ছিন্ন করে ফেললো। এভাবেই প্রাণ দিলো পৌত্তলিকদের তিন যুদ্ধবাজ বীরবাহাদুর নিরস্ত্র প্রায়, দুর্বল মুসলমানদের হাতে।

হযরত উবায়দা (রাঃ)–এর জখম থেকে রক্ত ঝরছিলো। হযরত আলী (রাঃ) তাকে উঠিয়ে প্রিয়নবী (সাঃ)–এর দরবারে হাজির করলেন। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) দেখলেন, তিনি মৃত্যুশয্যায় শায়িত। মুমূর্ষু অবস্থা। প্রিয়নবী (সাঃ) দুঃখিত হলেন। উবায়দা (রাঃ) স্বীয় চক্ষুদ্বয় খুললেন। আরয করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি কি শহীদ?

প্রিয়নবী (সাঃ) ঃ নিশ্চয়ই তুমি শহীদ।

উবায়দা (রাঃ) ঃ আল্লাহর শুকরিয়া, আমার তামান্না পূর্ণ হয়েছে।

প্রিয়নবী (সাঃ) ঃ আরও কোন আরযু আছে?

উবায়দা (রাঃ) ঃ না। একজন মুজাহিদের আকাংখা শাহাদত ভিন্ন আর কি হতে পারে?

প্রিয়নবী (সাঃ) ঃ আল্লাহ তা'আলা তোমাকে শাহাদত দান করেছেন।

উবায়দা (রাঃ) ঃ এটা আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহ।

রাসূলে আকরাম (সাঃ) ঃ নিজের কষ্টের কথা বর্ণনা করো।

উবায়দা (রাঃ) ঃ আমার কোন কষ্ট–তকলীফ নেই। তবে দুর্বলতা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

রাসূলে আকরাম (সাঃ) ঃ তুমি চাও, তোমার এ দুর্বলতা দূর হোক?

উবায়দা (রাঃ) ঃ আল্লাহর শোকর, না। হায়! আবু তালেব যদি জীবিত থাকতেন নিম্নোক্ত কাব্যের বাস্তবরূপ আমি কিরূপে দান করেছি তা যদি দেখতে পেতেন!

কাব্যের মর্মার্থ ঃ

"আমরা মুহাম্মাদকে কেবল তখনই শত্রুর হাতে অর্পণ করবো যখন তার আশেপাশে লড়াই করে মৃত্যুবরণ করবো। মুহাম্মাদের খাতিরে আমাদের স্ত্রী–পুত্রদেরকেও আমরা ভুলে যেতে পারি।"

এটুকু বলেই হযরত উবায়দা (রাঃ)–এর আত্মা এই নশ্বর পৃথিবী থেকে ত্যাগ করলো।

৪১
বিস্ময়কর আক্রমণ

মক্কার মুশরিকদের তিনজন খ্যাতনামা যোদ্ধা বীরবাহাদুর এবং শীর্ষস্থানীয় নেতা নিহত হলো। সাংঘাতিক মানসিক যাতনা হলো তাদের। হাকীম ইবন হেযাম বললো ঃ কুফা আবু জেহেল মানলো না। লড়াইয়ের সূচনা করলো। যার ফলে তিন জন বীর ব্রাঘ্র হারালো। জানিনা আরো কাদের ভাগ্যে অপমৃত্যু রয়েছে। আবু জেহেলও প্রত্যক্ষ করলো, জাতির চেহারা ফ্যাকাশে হয়ে পড়ছে। অতএব সে লোকজনকে উদ্বুদ্ধ করার জন্য বললো, আমরা বীর বাহাদুর। আমরা স্বনামধন্য এবং এ জাতির সুসন্তান, যাদের নামডাক গোটা হেজাযে প্রসিদ্ধ। যখন আমরা রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হই তখন আমাদের মনে থাকে আমরা সিংহ ও ব্রাঘ্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছি। সংঘর্ষে লাগছি পাহাড়ের সাথে। যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা শত্রুদের মূলোৎপাটন করতে না পারি ততক্ষণ আমরা ফিরে যাই না। এরা অল্প কিছুসংখ্যক মুসলমান আমাদের হুমকি দিচ্ছে। তোমাদের তিনজন শীর্ষস্থানীয় নেতাকে হত্যা করেছে। তোমরা প্রস্তুত হও। তাদের এক-একটি সদস্যকে ধরে ধরে জবাই করো। এরা সেসব মুসলমান যারা তোমাদের উপাস্যদের নিন্দাবাদ করে। তাদের মুখের উপর আঘাত হানো। তাদের জিহ্বা টেনে কেটে ফেলো। কুরাইশ বাহিনীর মধ্যে উত্তেজনার সৃষ্টি হলো। সবাই একযোগে হামলা করার মনস্থ করলো। উবাইদা ইবন সাঈদ ইবনুল আস বললো ঃ বীর সন্তানরা! একটু অপেক্ষা করো। প্রতিশোধ নেবার জন্য আমার অন্তর কাঁপছে। এসব মুসলমানের বাহাদুরী আমি দেখবো। কুরাইশ থেমে গেলো। ইবন সাঈদ অশ্ব দৌড়িয়ে রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হলো। চিৎকার করে বললো ঃ হে মুহাম্মাদ! আমার সাথে মোকাবিলার জন্য কাউকে পাঠাও।

উবাইদা ইবন সাঈদ বড় বাহাদুর এবং অত্যন্ত সুপ্রসিদ্ধ যোদ্ধা ছিলো। আমর ইবনুল আস যিনি অনেক দিন পরে মুসলমান হয়েছেন এবং উমরে ফারুক (রাঃ)এর শাসনামলে মিশর বিজয় করেছিলেন তারই ভাতিজা এ উবাইদা। এদের গোটা খান্দানই বীর।

হযরত যুবাইর ইবনুল আওয়াম (রাঃ) প্রিয়নবী (সাঃ)এর খিদমতে হাজির হয়ে আরয করলেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! এই নরাধম কাফিরের বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার জন্য আমাকে অনুমতি দিন। রাসূলে আকরাম (সাঃ) তাঁকে অনুমতি দিলেন। যুবাইর (রাঃ)এর কাছে অশ্ব ছিলো। এর উপর আরোহণ করে রওয়ানা হলেন তিনি। প্রিয়নবী (সাঃ) দুআ করলেন,

আয় আল্লাহ! তুমি এই মর্দে মুজাহিদের হেফাজত করো। তুমি তার তত্ত্বাবধায়ক হও।

যুবাইর (রাঃ) যখন উবাইদার কাছে এলেন তখন সে তাকে চিনতে পারলো। সে বললো, যুবাইর! কত বিস্ময়কর ঘটনা! কোন এক কালে আমরা বন্ধু ছিলাম কিন্তু আজকে শত্রু!

যুবাইর ঃ এর চেয়েও বিস্ময়কর ব্যাপার হলো—তোমাদের কাছে হক এসেছে, তোমরা সে সত্যকে প্রত্যাখ্যান করেছো। আমরা সেই সত্যকে গ্রহণ করেছি। তোমরা আমাদের বিরোধী হয়ে গেছো। অথচ আমরা তোমাদের বিরোধিতা করিনি। তোমরা আমাদের কষ্ট–তাকলীফ দিয়েছো। আমাদের উপর জুলুম–নির্যাতন চালিয়েছো। আমরা ধৈর্যধারণ করেছি। অবশেষে তোমরা আমাদের দেশান্তর করেছো। আমরা দেশান্তরিত হয়ে চলে এসেছি। এরপরও তোমাদের শান্তি হয়নি। আমাদের সমূলে উৎখাত করার জন্য এখানে এসেছো। আমরা মজলুম, অসহায়, নিরীহ। আল্লাহ তা'আলা আমাদের প্রতি রহম করেছেন। তিনি আমাদের সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। আমরা আল্লাহর আশ্রয়ে আছি। তিনি গোটা বিশ্বজাহানের প্রতিপালক।

উবায়দা ঃ বেহুদা বকবক করতে আরম্ভ করেছো। তুমি জাননা, তোমরাই সমাজে ফিতনা দাঁড় করিয়েছো। তোমরা এবং তোমাদের পিতা–প্রপিতারা যাদের উপাসনা করে এসেছো তোমরা সেগুলোর নিন্দাবাদ করছো। এটুকু আমাদের ভদ্রতা ও মানবতা যে, তোমাদের শুধু কষ্টই দিয়েছি, হত্যা করিনি। আমরা চেষ্টা করেছিলাম তোমরা বেদ্বীনী পরিত্যাগ করবে। তোমরা তোমাদের হঠকারিতায় অটল ছিলে। এখনও যদি তোমরা নতুন ধর্ম পরিহার করে পুরনো ধর্মে ফিরে আস, তাহলে আমরা তোমাদের বুকে জড়িয়ে নেবো।

যুবাইর (রাঃ) ঃ ইবন সাঈদ! এটা সত্য আমরা প্রতিমা পূজা করতাম। আমরা ছিলাম অজ্ঞ। আল্লাহ তা'আলা আমাদের মধ্যে রাসূল প্রেরণ করেছেন। তিনি বলেছেন, প্রতিমা খোদা হতে পারে না। খোদা তিনি যিনি সবকিছুর স্রষ্টা। যাকে আজ পর্যন্ত কেউ প্রত্যক্ষ করেনি। গোটা সৃষ্টির প্রতি সীমাহীন দয়ালু তিনি। যার রাজত্ব ভূমণ্ডল ও নভোমণ্ডলে সুবিস্তৃত। আমাদের চোখ খুলে গেছে। চিনতে পেরেছি আমরা আমাদের সৃষ্টিকর্তাকে। তোমরাও চিনে নাও। ঝগড়া মিটে যাবে।[১]

টীকা–১. কতই না প্রাঞ্জল ও বলিষ্ঠ কণ্ঠে মহান স্রষ্টার পরিচয় তুলে ধরা হয়েছে নিম্নোক্ত আয়াতে ঃ

কুলিল্লাহুম্মা মালিকাল মুলক....। অর্থাৎ, বলুন, হে সার্বভৌম শক্তির মালিক আল্লাহ! তুমি যাকে ইচ্ছা ক্ষমতা প্রদান কর এবং যার নিকট হতে ইচ্ছা ক্ষমতা

উবায়দা ঃ কিরূপ অবাঞ্ছিত আলোচনার সূত্রপাত হয়েছে। এটাই তো ঝগড়া। আমরা অনেকগুলো খোদার পূজা করি। আজ সেসব খোদাকে আমরা বর্জন করবো? আর অদৃশ্য খোদারই আমরা উপাসনা করবো? যাকে আজ পর্যন্ত কেউ দেখেনি?

যুবাইর (রাঃ) ঃ একটু চিন্তা করে দেখো। তোমাদের খোদাগুলোকে কারা তৈরী করেছে, যারা এগুলোর নির্মাতা তাদেরও স্রষ্টা আছে। এসবকে যিনি সৃষ্টি করেছেন তিনিই প্রকৃত খোদা। তারই ইবাদত কেন করবে না?

উবায়দা ঃ হয়তো হবে। আমি আবু কুরাশ, যার বীরত্বের সুখ্যাতি গোটা আরবে রয়েছে। বড় বড় বীরবাহাদুর আমার বিরুদ্ধে মোকাবিলা করতে পারেনি। তুমি ফিরে যাও। অন্য কাউকে আমার মোকাবিলা করতে পাঠিয়ে দাও।

যুবাইর (রাঃ) ঃ দম্ভ করো না। তুমি আমাকেও চেন। আমি আওয়ামের সন্তান। আমার বাপের বীরত্ব কিংবদন্তী হয়ে আছে। আমার বাহাদুরীও সুবিখ্যাত। পুনরায় আমি তোমাকে ইসলামের দাওয়াত দিচ্ছি। শয়তানের কবল থেকে বেরিয়ে এসো। রাহমানের আঁচলে আশ্রয় নাও।

উবায়দা ঃ আচ্ছা, তুমি যদি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে চাও তাহলে প্রস্তুতি নিয়ে এসো।

উবায়দা ইবন সাঈদ তখন এরূপ একটি লৌহবর্ম পরিহিত ছিলো যারফলে তার পূর্ণ দেহ ছিলো আচ্ছাদিত। মাথার উপর ছিলো শিরস্ত্রাণ। মাথা থেকে পায়ের গিরা পর্যন্ত লৌহবর্মে সে আবৃত। চোখের পুতুলগুলো ছাড়া শরীরের কোন একটি অংশ দেখা যায় না। কোষ থেকে সে তলোয়ার উন্মুক্ত করলো। যুবাইর ইবন আওয়াম (রাঃ)এর কাছে না ছিলো লৌহবর্ম, না শিরস্ত্রাণ, না ঢাল। তার কাছে ছিলো একটি তলোয়ার ও একটি নেজা। তিনি বাম হাতে ঢাল, ডান হাতে তলোয়ার ধারণ করলেন। উবায়দা বীরবিক্রমে তার উপর হামলা চালালো। যুবাইর ঢালের মাধ্যমে তা প্রতিহত করলেন। উবায়দা তার হামলার ব্যাপারে গর্ব করতো। সে ভেবেছিলো প্রথম আক্রমণেই তাকে খতম করে ফেলবে। যুবাইর যখন হামলা প্রতিহত করলেন তখন তার বিস্ময়ের সীমা রইল না। লাগাতার সে কয়েকবার আক্রমণ

কেঁড়ে নাও ; যাকে ইচ্ছা তুমি পরাক্রমশালী কর, আর যাকে ইচ্ছা তুমি হীন কর, কল্যাণ তোমার হাতেই। তুমি সর্ব বিষয়ে সর্বশক্তিমান। তুমিই রাত্রিকে দিবসে পরিণত কর এবং দিবসকে রাত্রিতে পরিণত কর ; তুমিই মৃত হতে জীবন্তের আবির্ভাব ঘটাও, আবার জীবন্ত হতে মৃতের আবির্ভাব ঘটাও, তুমি যাকে ইচ্ছা অপরিমিত জীবনোপকরণ দান কর।—আল ইমরান ঃ ২৬–২৭

চালালো। যুবাইর (রাঃ) তার সমস্ত আক্রমণ ঢালের মাধ্যমে প্রতিহত করলেন। অতঃপর পাল্টা আক্রমণ চালালেন। ইবন সাঈদ ঢাল দিয়ে প্রতিহত করতে চাইলো কিন্তু পারলো না। যুবাইর (রাঃ)-এর তরবারী তার ঢাল দ্বিখণ্ডিত করে ফেললো। অতঃপর তার দেহে আক্রমণ চালালেন। লৌহবর্মের উপর তলোয়ার পড়লো কিন্তু তাকে হত্যা করতে পারলেন না। যুবাইর (রাঃ) তার আপাদমস্তক দেখলেন কিন্তু এমন কোন স্থান দেখলেন না যেখানে তলোয়ার আঘাত হানতে পারে। ইতোমধ্যেই সে পুনরায় আক্রমণ চালালো। তিনি ঢালের মাধ্যমে প্রতিহত করার চেষ্টা করলেন কিন্তু ঠিকমত প্রতিহত করতে পারলেন না। তলোয়ার পড়লো স্কন্ধের উপর। ইবন সাঈদ মনে করেছিলো এবার তাকে কাবু করে ফেলেছে। কিন্তু আল্লাহর রহমতে যুবাইর (রাঃ) বেঁচে গেলেন। অবশ্য আহত হলেন, জখম থেকে রক্ত বইতে আরম্ভ করলো। হযরত যুবাইর (রাঃ) তার জখমের পরোয়া করলেন না। ক্রুদ্ধ-উত্তেজিত হয়ে তিনি পিছনে সরে এসে তলোয়ার রেখে নেজা হাতে নিলেন। উবায়দা হেসে বললোঃ যে আঘাত আমি হেনেছি তাতে যথেষ্ট হয়নি?

যুবাইর (রাঃ) ঃ জানিনা, কতটুকু আহত হয়েছি। তুমি প্রস্তুত হও, এবার তোমার মৃত্যু এসেছে। এই বলে যুবাইর (রাঃ) নেজা ছুড়লেন। উবায়দা ঢালের মাধ্যমে তা প্রতিহত করলো এবং নেজা ধ্বংস করার জন্য তলোয়ার মারলো। যুবাইর (রাঃ) নেজা রক্ষা করলেন এবং অব্যাহত আক্রমণ চালালেন। এত দ্রুত এবং ক্ষিপ্রগতিতে নেজা চালালেন যার ফলে উবায়দা হয়রান হয়ে গেলো। সে কেবল প্রাণপণে আক্রমণ প্রতিহত করে চললো। একবার যুবাইর (রাঃ) নেজা তাক করে তার চোখের উপর মারলো। নেজা তার চক্ষু আঘাত করে মস্তক পর্যন্ত ভেদ করলো। উবায়দা ভয়ানক চিৎকার করে উঠলো এবং বিড়বিড় করে অশ্বের উপর থেকে ধরায় পতিত হলো।

যুবাইর ইবন আওয়াম (রাঃ) তৎক্ষণাৎ দৌড়ে যেয়ে বললেন ঃ তুমি তোমার অহংকারের পরিণতি দেখেছো। এই লৌহবর্মের দম্ভই ছিলো তোমার।

যুবাইর (রাঃ) নেজা বের করতে চাইলেন কিন্তু এটি এভাবে বিদ্ধ হলো যে, বেরুলো না আর। তিনি উবায়দার সিনার উপর পা রেখে সজোরে টান মারলেন। বহু চেষ্টা-প্রচেষ্টা চালিয়ে নেজাটিকে বের করলেন। যারফলে নেজার মাথা বক্র হয়ে গিয়েছিলো।[১] তড়পাতে তড়পাতে উবায়দা নিহত হলো। হযরত যুবাইর (রাঃ) তুলে নিলেন তার লৌহবর্মটি। তার অস্ত্রশস্ত্র করায়ত্ত করলেন। ধারণ করলেন ঘোড়ার লাগাম। এলেন স্বীয় বাহিনীর কাছে এবং নিহতের সমস্ত সাজসরঞ্জাম যুদ্ধাস্ত্র, ঘোড়া রাসূলে কারীম (সাঃ)এর নিকট

টীকা ঃ ১. তারীখে ইসলাম ঃ ১ম খণ্ড, ২৭৪ পৃঃ।

হাজির করলেন উটের উপর বোঝাই করে। রাসূলে করীম (সাঃ) বললেন ঃ এগুলো তোমার।

সেদিনই মুসলমানদের মধ্যে এই নীতি নির্ধারিত হলো, যে যে দুশমনকে হত্যা করতে পারবে তার রসদপত্র সবকিছুর মালিক হবে সেই। অন্য কেউ সেগুলোর ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করবে না। যুবাইর (রাঃ)এর স্কন্ধ থেকে এখনও রক্ত ঝরছিলো। রাসূলে আকরাম (সাঃ) ইরশাদ করলেন ঃ তুমি তোমার জখমে ব্যাণ্ডেজ বাঁধ। ফলে একজন বেদুঈন খুব দ্রুত একটি ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দিলো। সেই নেজাটিকে রাসূলে আকরাম (সাঃ) যুবাইর (রাঃ)এর কাছ থেকে চেয়ে নিলেন। প্রিয়নবী (সাঃ)এর ওফাতের পর এই নেজাটি চার খলীফা আবুবকর, উমর, উসমান, আলী (রাঃ)–এর হাতে ধারাবাহিকভাবে হস্তান্তরিত হয়েছিলো। হযরত আলী (রাঃ) হযরত যুবাইর (রাঃ)এর সন্তান হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ)কে সেটি দান করে দিয়েছিলেন। এই যুদ্ধে হযরত যুবাইর (রাঃ)–এর যে জখম হয়েছিলো সেটি ছিলো সুগভীর। সুস্থ হয়ে যাবার পরেও সেখানে একটি গর্ত রয়ে গিয়েছিলো। তার সন্তান আরূক জখমের এই গর্তে হাত প্রবিষ্ট করিয়ে খেলা করতেন। তার তলোয়ারটির দাঁতগুলো ভেঙ্গে গিয়েছিলো। অবশেষে বেকার হয়ে গিয়েছিলো এটি।

কাফিররা দেখলো উবায়দা ইবন সাঈদও নিহত হয়েছে। তখন তাদের মধ্যে আরও উত্তেজনা দেখা দিলো। প্রচণ্ড বাতাস প্রবাহিত হচ্ছিলো তখন। তারা সবাই থেমে গেলো। আকাশে দেখা গেলো একখণ্ড মেঘ। মুজাহিদ বাহিনীর দিকে সেটি এগিয়ে আসলো। কিছুদূর এসে থেমে গেলো। বাতাসের প্রবাহ বন্ধ হলো। নিরবতা এবং আরাম বিরাজমান। প্রশান্তি হলো। আকাশে সূর্য তখন অনেক উপরেই চলে গেছে। সূর্যের সোনালী আলো ব্যাপক ভাবে ছড়িয়ে পড়েছে। প্রচণ্ড উত্তাপ বৃষ্টির আদ্রতা উড়িয়ে নিচ্ছিলো, বালু পানি চুষে নিচ্ছিলো এবং জমে গিয়েছিলো বালু। শ্বেত শুভ্র অণুকণাগুলো আকাশের রশ্মির কারণে ঝিকিমিকি করতে লাগলো। কাফির বাহিনীর ওখানে বালু ছিলো না, ছিলো এঁটেল মাটি। বৃষ্টির কারণে সেগুলো কর্দমাক্ত হয়ে গেলো।

এ মুহূর্তে আবু জেহেল চিৎকার করে বলে উঠলো ঃ বীরসন্তানরা! তোমরা সামনে অগ্রসর হও। বদবখত মুসলমানদের কচুকাটা করো। মক্কার পৌত্তলিক বাহিনী আক্রমণোদ্যত হয়ে সামনে অগ্রসর হলো। তাদের সামনে পদাতিক বাহিনী, পিছনে আরোহী। অত্যন্ত জাঁকজমকে সদম্ভে তারা এগুতে লাগলো। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) তা দেখলেন। তিনি আকাশের দিকে নজর করে দু'আ করলেন, হে আল্লাহ! এ অল্পসংখ্যক মুসলমানের সাহায্য করো। দুশমনদের উপর তাদের দান করো বিজয়।

৪২
উপঢৌকন

মাসউদ এবং রাফিদা প্রবাস জীবন-যাপন করছে। কখনও কখনও দুজনকে সামনাসামনি হতে হয়েছে। একজনের সাথে হলো অপরজনের পরিচিতি। কথাবার্তা বিনিময়ও হতো। কিন্তু অনর্থক বাজে গল্পগুজব কখনও হয়নি। রাফিদা ছিলো একজন লাজুক মেয়ে। অপরদিকে মাসউদ সৎ এবং আত্মমর্যাদাবোধসম্পন্ন যুবক। যেহেতু পর্দার হুকুম নাযিল হয়নি সেহেতু পরস্পরে দেখা সাক্ষাতও ঘটতো। রূপসী, সুন্দরী রাফিদা যখন মাসউদের সামনে এসে যেতো সে তার দিকে দৃষ্টিপাত করতো। রাফিদার রূপ-লাবণ্য তার নজর আকৃষ্ট করতো।[১] কিন্তু বাজে আলাপচারিতায় কখনও লিপ্ত হতো না। তাছাড়া রাফিদার ও সব বাজে গল্পের প্রয়োজনই বা ছিলো কোথায়। প্রকৃতি উভয়কে একই সাথে সফরে বাধ্য করেছে। সফরের পথেই একজন অপরজন সম্পর্কে জানার চেষ্টা করেছে। তারা জানতে পেরেছে দুজনই মুসলমান। দুজনের মধ্যেই সুসম্পর্ক সৃষ্টি হলো। দুজনই পরিণত হলো ভাই-বোনে।

রাফিদার অন্তরে মাসউদের প্রতি স্নেহ-মমতা আপন ভাইয়ের মতোই সৃষ্টি হলো। মাসউদ যখন তার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে এলো তখন রাফিদার মন ভারাক্রান্ত হয়ে উঠলো। প্রায় সময়ই তার কথা মনের গহীনে মাথাচাড়া দিয়ে উঠতো। সালিমা ছিলো অত্যন্ত উচ্ছ্বল, প্রাণবন্ত মেয়ে। সে খুচিয়ে খুচিয়ে বারবার জিজ্ঞেস করতো, রাফিদা! তুমি এতো পেরেশান কেন? কি চিন্তা করছো? ভাইয়ার কথা মনে হচ্ছে? রাফিদা পরিস্কার ভাষায় বলতো, হাঁ।

সালিমা ঃ আমার ভাইয়া যখন কোথাও চলে যান তখন আমিও এরূপ উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ি। আমার মন পেরেশান হয়ে উঠে। আল্লাহই জানেন, ভাইদের জন্য বোনদের মনে এই স্নেহ-মমতা কোত্থেকে আসে।

রাফিদা ঃ তা আল্লাহই ভালো জানেন।

সালিমা ঃ আল্লাহ নামটি অতি প্রিয়। আমাদের প্রতিমাগুলোর মধ্য হতে কারো নাম যদি এরূপ হতো তাহলে কতই না ভালো হতো।

রাফিদা ঃ তোমাদের প্রতিমাগুলো উপাস্য নয়। এগুলো তো প্রস্তরমূর্তি। পাথর দিয়ে বিভিন্ন রকমের কাল্পনিক ছবি তৈরী করেছে নির্মাতারা। এসব নির্মাতা যেসব মূর্তি তৈরী করেছে তাদের বাহ্‌বা দিতে মনে চাইলেও উপাস্য

টীকা-১. এখানে অর্ধলাইন বাদ দেয়া হয়েছে।—অনুবাদক।

বানাতে মনে চায় না। তাছাড়া ওগুলোকে উপাস্য কিভাবে স্বীকার করি। আমাদের তো জানাই আছে এগুলোর নির্মাতা স্বয়ং মানুষ।

সালিমা ঃ এসব প্রতিমা কি মানুষে তৈরী করেছে?

রাফিদা ঃ আপু! মানুষেই এগুলো তৈরী করেছে। এগুলো স্বয়ংক্রিয়ভাবে অস্তিত্ব লাভ করেনি। দেখছেন না এগুলো নিজে নিজে নড়াচড়া করে না। ওগুলোর গায়ে কোন একটা মাছি পড়লেও তাড়াতে পারে না। এগুলো আবার কিভাবে নিজে নিজে অস্তিত্ব লাভ করবে? ওগুলো নিজেই যেহেতু অস্তিত্ববান হতে পারে না তাহলে গোটা বিশ্বকে কিভাবে অস্তিত্ব দান করবে?

সালিমা ঃ কিন্তু আমি শুনেছি এগুলো সব খোদার বিভিন্ন রূপ।

রাফিদা ঃ খোদা তো একাধিক নয়, একজন। যদি সব প্রতিমার একই রূপ হতো তাহলে মেনে নেয়া যেতো। কিন্তু প্রতিমাগুলো তো বিভিন্নরূপী। এতে প্রমাণিত হয়, এগুলো খোদার রূপ নয়। যার অন্তরে যে কোন মানুষ অথবা জীবজন্তুর প্রতি আস্থা জন্মেছে সেগুলোর রূপে প্রতিমা নির্মাণ করেছে মানুষ। নির্মাণের পর ওগুলোর উপাসনা আরম্ভ করে দিয়েছে। দেখাদেখি অন্যরাও পূজা–অর্চনা শুরু করেছে।

সালিমা ঃ তুমি সত্য বলেছো। তোমার কথা শুনে আমার বিশ্বাসই দুর্বল হয়ে পড়েছে। ঠিক এই মুহূর্তে নাইল এসে উপস্থিত। যদিও রাফিদা তাদের ঘরে কয়েক দিন হলো অবস্থান করছে কিন্তু রাফিদার সাথে কথা বলার—আলোচনা করার সাহস হয়নি তার কোনদিন। আজকে এসেই রাফিদার উপর তার দৃষ্টি পড়লো। রাফিদা যখন তার দিকে তাকাতো না তখনই নাইল তার প্রতি দৃষ্টিপাত করতো। যখন রাফিদার নজর তার উপর পড়তো তখন নাইলের দৃষ্টি আনত হয়ে যেতো কম্পমান অবস্থায়। তার মনে যেন তীরের আঘাত লাগতো।

ঘটনাক্রমে একদিন রাফিদা গোসল করে চুলে খোপা বেঁধে বসে আছে। নাইল এ অবস্থায় এসে হাজির। নাইল দেখলো, তার গোলাপী গণ্ডদেশ উজ্জ্বল–দীপ্তিমান। শ্বেত–শুভ্র চেহারার উপর গোলাপী রং প্রবল আকার ধারণ করেছে। তার আঁখিযুগল আনত। বিদ্যুৎ বিচ্ছুরণকারী চোখের পুতুলগুলোর উপর লম্বা এবং সূক্ষ্ম পলকে পুষ্প তৈরী হয়ে আছে। রাফিদা তখন কোনকিছু সেলাই করছিলো। তার মাথার খোপা বাঁধা ছিলো সাদা ফিতা দিয়ে। ফলে চুলের দুটো খোপা সাপের আকারে সিনার উপর ঝুলে পড়ে আছে। রাফিদা উড়নার উপর কালো রুমাল বেধে রেখেছিলো। সোনালী রংয়ের কতগুলো ফুল তৈরী করা ছিলো সে কালো রুমালের মধ্যে। রাফিদার গায়ে পাতলা রেশমের একটি ওয়াচকোট। ওয়াচকোট তার বিদ্রোহী যৌবনের

ফলকে জোরপূর্বক চেপে রেখেছে। এই পোশাকে রাফিদাকে সীমাহীন রূপসী সুন্দরী মনে হচ্ছে।

অনিচ্ছাসত্ত্বেও নাইল রাফিদার দিকে তাকিয়ে আছে। মায়াবিনী, পরীরূপী এই সুন্দরী তখন ঘরে একা। স্বীয় কাজে রত। নাইল ঘরে এসেছে এবং তাকে তাকিয়ে দেখছে এ সম্পর্কে তার কোন খবরও নেই। ক্ষীণ কদমে নাইল তার কাছে এসে দাঁড়ালো। তেজ দৃষ্টিতে নাইল তাকে আপন মনে দেখছে। রূপ সৌন্দর্য কোন অবস্থাতেই তেজ দৃষ্টি বরদাশত করতে পারে না। অতএব রাফিদাও সহ্য করতে পারেনি। আল্লাহ মা'লুম কিভাবে তার মনে সন্দেহ হয়েছে কেউ তাকে দেখছে। তাই চিত্তহারী দৃষ্টি উঠিয়ে সে দেখলো। চোখের পলকগুলো যেন পুষ্পিত ভূমি। বিদ্যুৎ দীপ্তি ছড়াচ্ছে। নাইল যেন বিদ্যুৎ স্পৃষ্ট হয়ে গড়িয়ে পড়লো। রাফিদা তাকে দেখে সংযত হয়ে বসলো। আঁখিযুগল নিচের দিকে নিয়ে এলো। নাইল আর একটু সামনের দিকে অগ্রসর হলো। সে মনস্থ করলো রাফিদার সাথে আজ কথা বলবে। কিন্তু জিহ্বা জড়সড় হয়ে পড়েছে। গলা শুকিয়ে গেছে। ঠোঁটগুলোতেও আদ্রতা নেই। মনে সৃষ্টি হলো কম্পন।

দুর্ভাগ্যক্রমে রাফিদা পুনরায় চিত্তহারী দৃষ্টি দিয়ে আবার তার দিকে তাকালো। রাফিদার কাছে তাকে ভালোই মনে হচ্ছিলো। রাফিদা জিজ্ঞেস করলো, আপনি কি সালিমাকে কিছু বলতে চাইছেন? সুবর্ণ সুযোগ ছিলো তার সাথে নাইলের কথাবার্তা বলার। কারণ, আলোচনার সূত্রপাত ঘটেছে রাফিদার কাছ থেকে। কিন্তু বেচারা করবে কি? হুঁশ–জ্ঞান তার স্থির ছিলো না। ফলে, প্রথমে হাঁ বললেও তৎক্ষণাৎ আবার বলে দিলো, না। এবার রাফিদার অন্য কোন কথা বলার প্রয়োজনই থাকলো না। সে দৃষ্টি আনত করে স্বীয় কাজে মশগুল হয়ে গেলো। নাইল আর সেখানে দাঁড়িয়ে থাকতে পারলো না। সেখান থেকে ফিরে গিয়ে তাঁবুর একস্থলে পড়ে রইলো। ক্ষীণস্বরে সে বললো, হে উদ! (উদ একটি প্রতিমার নাম, সেটি তার উপাসক ছিলো) তুমি আমাকে কি বিপদে জড়িয়ে ফেললে? যেসব পরীর কিচ্ছা কাহিনী আর উপাখ্যান শুনতাম, এতো তারই মতো মনে হচ্ছে। এতো নিঃসন্দেহে এক পরী। এরূপ সুন্দরী রূপসী যুবতী নারী আজ পর্যন্ত আমার নজরে পড়েনি।

এমন সময় ঘটলো সালিমার আগমন। সে ভাইয়াকে বিমর্ষ দেখে জিজ্ঞেস করলো, কি ব্যাপার ভাইয়া! তুমি পেরেশান কেন? নাইল তাকে কি জবাব দিবে ভেবে পাচ্ছে না। বলে দিলো, না, তেমন কিছু না। এমনিতেই আজকে মনটা খারাপ।

সালিমা ঃ ভাইয়া! তুমি জানো রাফিদা তোমার জন্য একটি রুমালে ফুল

তুলছে। নাইল এতক্ষণ শুয়ে ছিলো। উঠে বসে পড়লো। দ্রুত উচ্চারণ করলো, আমার জন্য?

সালিমা ঃ হাঁ।

নাইল ঃ হয়তো তুমি তাকে বলেছো?

সালিমা ঃ জ্বি।

নাইল ঃ তুমি তাকে দিয়ে কেন কষ্ট করাচ্ছো?

সালিমা ঃ সে তার নিজের একটি কালো রুমাল বের করেছিলো। আমি বললাম, আমার ভাইয়ার জন্য এরূপ একটি রূমালে কারুকার্য করে দাও না!

নাইল ঃ সেটা কি সে আমাকে উপঢৌকন হিসাবে দিবে?

সালিমা ঃ হাঁ।

নাইল ঃ আমি তাকে কি উপহার দিবো?

সালিমা ঃ তা তুমি জানো ভাইয়া!

নাইল ঃ তুমি তো আমাকে আরেক উদ্বেগে ফেললে। তুমি বলো, কি উপহার দেবো।

সালিমা ঃ তোমার কাছে যা ভালো মনে হয়।

নাইল কতক্ষণ ভাবলো। বললো, আচ্ছা ঠিক আছে। আমি ভেবে নিয়েছি।

সালিমা ঃ কি ভেবেছো ভাইয়া?

নাইল ঃ বলবো না। যখন দেবো তখন দেখবে।

মুখে বহু কথা এসে গেলো। অনেক কিছুই বলা হলো। কিছুদিনের মধ্যেই সে রুমালে রাফিদা কারুকার্য তৈরী করে ফেলেছে। ফুল তুলে রেডি করে ফেলেছে। সালিমা রাফিদাকে উদ্বুদ্ধ করেছিলো যেন রুমালটি নিজ হাতেই নাইলকে উপহার দেয়। নাইলকে দেখেই সালিমা বললো, চলো ভাইজান এসে গেছে। রুমাল তো তোমার হাতেই। এখনই তাকে উপহার দাও। রাফিদা মৃতসঞ্জীবনী দৃষ্টিতে সালিমার দিকে তাকিয়ে বললো, আমার লজ্জা অনুভূত হচ্ছে।

সালিমা ঃ আরে তুমি এখনও ভাইয়াকে দেখে লজ্জা পাও। দেখো ভাইয়া সন্নিকটেই এসে গেছে। হাত বাড়িয়ে তাকে দিয়ে দাও।

রাফিদা ঃ আমার সাহস হয় না।

সালিমা ঃ আশ্চর্য তামাশা! ভাইজানকে বলি রাফিদার সাথে কথা বলতে। সে বলে, আমার সাহস হয় না। তোমাকে বলি রুমাল দিতে তুমি বলো আমার সাহস হয় না। তাহলে তোমাদের দুজনের হিম্মত কোথায় গেলো?

রাফিদা মুচকি হাসতে লাগলো। নাইল দুজনের কাছে এসে দাঁড়ালো। সালিমা ছিলো উচ্ছল কৌতুকী মেয়ে। সে নাইলকে সম্বোধন করে বললো, চলো ভাইয়া আজকে তুমি হিম্মত করে ফেলো। এই দেখো, লজ্জার পুতুল তোমার সামনে দাঁড়ান। তার সাথে কথোপকথন করো।

নাইল ঃ হ্যাঁ, হ্যাঁ....অ্যাঁ.....অ্যাঁ।

সালিমা ঃ কোন্ দেশী ভাষা এটা ভাইয়া!

রাফিদা হাসতে লাগলো। অতঃপর সংযত হয়ে গেলো। কিন্তু তার চিত্তাকর্ষক ওষ্ঠদ্বয়ের মুচকি হাসি ছড়িয়ে পড়লো। চেহারা তার আলোকজ্জ্বল হয়ে উঠলো।

সালিমা ঃ বোন রাফিদা! জানিনা ভাইয়া কোন্ দেশী ভাষা বলতে শুরু করেছে। আজ তুমি হিম্মত করো। রুমালটা তুমি তোমার হাতে তাকে দাও।

রাফিদার হাতে রুমাল পূর্ব থেকেই ছিলো। সে হাত বাড়িয়ে দিলো। নাইল তার সামনে এগিয়ে আসলো। রুমাল হাতে নিয়ে সে মাথায় তুলে দিলো। সালিমা হাসতে হাসতে লুটোপুটি খাচ্ছিলো। সে বলছে, রাজকীয় উপঢৌকন পেয়ে গেলে ভাইয়া!

নাইল লম্বা জুব্বার পকেটে হাত ঢুকিয়ে একটি রুমাল বের করলো। রুমালের ভিতরে কিছু একটা প্যাঁচানো ছিলো। নাইল সেটি খুলে খুব দ্রুত হাতে নিয়ে হুররূপী রাফিদার প্রলম্বিত গলায় পরিয়ে দিলো। এটা ছিলো সোনার হার। নেহায়েত সুন্দর। বড়ই চিত্তাকর্ষক। স্বর্ণের এই হার রাফিদার রূপ-লাবণ্য আরো বৃদ্ধি করলো। সালিমা দেখে বাগবাগ হয়ে গেলো। সে বললো, বাহ্! বাহ্! কি অদ্বিতীয় হার। বড় উঁচুমানের উপঢৌকন।

রাফিদা লজ্জা পেলো। নাইলের উপর এর এমন প্রভাব সৃষ্টি হলো যে, তৎক্ষণাৎ সে এখান থেকে চলে গেলো। অনিচ্ছাকৃতভাবে পুনরায় সালিমার হাসি পেলো। সে বললো, দেখ তো ভাইয়া কিভাবে চলে যাচ্ছে? মাথায় তার রুমাল, কোন খবর নেই, কোথায় যেয়ে এটা পড়ে যায়। এই বলে সালিমা তাকে বিষয়টি অবহিত করার জন্য দৌড়ে গেলো।

৪৩

উত্তেজনাকর আক্রমণ

মক্কার কাফিররা আবেগ-উত্তেজনায় তাড়িত হয়ে নেজা ইত্যাদি নিয়ে সম্মুখে অগ্রসর হচ্ছিলো। তাদের চালচলন ও ভাবভঙ্গিতে দাম্ভিকতা ও অহংকার প্রকাশমান। তাদের দৃঢ় বিশ্বাস ছিলো মুসলমানদেরকে প্রথম চোটেই

পদদলিত করে ফেলবে। জনবল ও অস্ত্রবলের আধিক্যে তারা ছিলো গর্বিত। তাদের তিনটি ঝাণ্ডা ছিলো। তিনটিই উড্ডীয়মান। বাতাসে পত পত করে উড়ছে। সাহাবায়ে কেরাম অত্যন্ত শান্তিপূর্ণভাবে দাঁড়িয়ে প্রত্যক্ষ করছে শত্রুদের জনসমুদ্রের স্রোত সম্মুখে অগ্রসরমান। যাদের কাছে নেজা ছিলো তারা নেজা উত্তোলন করলো। যাদের কাছে তলোয়ার ছিলো তারা তলোয়ার ধারণ করলো। মুসলমানদের হাতেও তিনটি ঝাণ্ডা ছিলো। তিনটি পতাকাই আকাশে উড্ডীয়মান। বাতাস এগুলোর সাথে খেলা করছে।

প্রিয়নবী (সাঃ) চাদর জড়িয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। তিনিও কাফিরদের জবরদস্ত আক্রমণ প্রত্যক্ষ করছেন। ঝুপড়ির মধ্যে যেয়ে আল্লাহর কাছে দু'আ করছেন। এবার পুনরায় দুআ করলেন ঃ হে বিশ্ব প্রতিপালক ! তুমি বিজয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়েছো। এই নিরীহ, নিরস্ত্র, দুর্বল মুসলমানদের বিজয় দান করো। তোমার নামকে বুলন্দ করার জন্য, তোমার ইসলামকে বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে দেয়ার জন্য নিরস্ত্র অবস্থায় শুধু তোমার সাহায্যের উপর ভরসা করে এরা রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়েছে। আয় আল্লাহ ! আজকে যদি মুসলমানদের এই ছোট্ট দলটিকে ধ্বংস করে দাও, তাহলে গোটা বিশ্বে তোমার ইবাদতকারী আর কেউ অবশিষ্ট থাকবে না। এই বলে রাসূলে আকরাম (সাঃ) আওয়াজ দিলেন ঃ হে মনসূর উম্মত ![১] সমস্ত সাহাবায়ে কেরাম একযোগে আল্লাহু আকবার ধ্বনি উচ্চারণ করলেন।

এই তাকবির ধ্বনি শুনে কাফিররা হীনবল হয়ে পড়লো। কিছুটা নিস্তেজ হয়ে পড়লো তারা।

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) উচ্চস্বরে বললেন ঃ হে সাহাবীরা ! পরীক্ষার সময় এসে গেছে। আল্লাহ তোমাদের পরীক্ষা করছেন। মরে গেলেও যেন ধৈর্য্য, অটলতা ও স্থিরতায় কোন পার্থক্য না আসে। এ কথা কল্পনাও করবে না যে, দুশমনের সংখ্যা বেশি, তারা বিভিন্ন রকমের লৌহবর্মে আবৃত, বিভিন্ন রকমের অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত আর তোমরা সংখ্যালঘু দুর্বল, তোমাদের কাছে নেই কোন লৌহবর্ম, নেই সম্পূর্ণ অস্ত্রশস্ত্র। কাফিরদের কোন সাহায্যকারী নেই। তাদের বাতিল উপাস্যগুলো মূক এবং বধির। এরা তাদের সাহায্য করতে পারবে না। অপরদিকে তোমাদের সাহায্যকারী আল্লাহ। তিনি সবকিছুর দ্রষ্টা এবং শ্রোতা। তিনি তোমাদের সাহায্য করবেন। জান উৎসর্গের সময় এসেছে। আল্লাহর নাম নিয়ে সৈন্যদের ভিতর ঢুকে পড়ো।

টীকা ঃ ১. বদরের যুদ্ধে এটা ছিলো রাসূলে আকরাম (সাঃ)এর সুনির্দিষ্ট সংকেত, যেমন যুদ্ধের ময়দানে অন্যদেরও নির্ধারিত সংকেত থাকে। মনসূর শব্দের অর্থ সাহায্য প্রাপ্ত। —মাগাযিস সাদিকা ঃ পৃঃ ২৯।

কাফিররা তখন আক্রমণ চালিয়েছিলো। যারা পদাতিক তারা হামলা চালিয়েছে। মুসলমানরা তাদের হামলা প্রতিহত করছে। আবার পাল্টা আক্রমণ করেছে। এমন প্রচণ্ড আক্রমণ সাহাবীগণ করেছেন যার ফলে শত্রুদের পায়ের নিচ থেকে মাটি সরে গেছে। থমকে দাঁড়াতে হয়েছিলো তাদের।

যুদ্ধ শুরু হলো। নেজা তলোয়ার চলতে লাগলো। সূর্যের শুভ্র আলোতে নেজার সম্মুখভাগ আরো স্বচ্ছ হলো, ঝিকমিক করতে লাগলো। কাফিররা বিভিন্ন প্রকার শ্লোগান উচ্চারণ করছিলো। মুসলমানরা ছিলেন নিরব।

আবু জেহেল, আস, হানযালা, জামআ, আকীল, আবুল বাখতারী, নওফাল, হারিস প্রমুখ সম্মানিত কোরাইশ নেতা অশ্ব নিয়ে ছোটাছুটি করছে। উদ্বুদ্ধ করছে যোদ্ধাদের। তাদের সাহস বাড়াচ্ছে। যুদ্ধ প্রচণ্ড আকার ধারণ করলো। নেজাওয়ালারা নেজা দিয়ে, তলোয়ারওয়ালারা তলোয়ার দিয়ে, নেজা আর তলোয়ারগুলোকে প্রতিহত করছিলো। স্বতঃস্ফূর্ত যুদ্ধ। কাফিররা আক্রমণ চালাচ্ছে অত্যন্ত উত্তেজিত অবস্থায়। মুসলমানদের সম্পর্কে তাদের আশা ছিলো যেহেতু তাদের লৌহবর্ম ইত্যাদি নেই, তাই তাদের কচুকাটা করবে। তা সত্ত্বেও যখন তারা আক্রমণ চালাতো তখন তারা প্রতিহত করতো ঢালের মাধ্যমে। পরস্পরের অস্ত্রশস্ত্র প্রতিপক্ষের উপর পতিত হচ্ছিলো। যদি কাফিরদের পরনে লৌহবর্ম না থাকতো তাহলে সেদিন তাদের লাশ পড়লো প্রচুর পরিমাণে।

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) মুসলমানদের স্বতঃস্ফূর্ততা প্রত্যক্ষ করছিলেন। তাদের আক্রমণের ধরন দেখছিলেন। তাঁর চেহারা আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠছিলো। রাসূলুল্লাহ (সাঃ)এর দৃঢ় বিশ্বাস ছিলো যে, বিজয় মুসলমানদের হবেই। এজন্য তিনি ইরশাদ করেছিলেন, হে আল্লাহর বান্দারা! আল্লাহর রাসূল বলছেন, তোমরা বনী হাশেমের কাউকে হত্যা করবে না। তারা মূলতঃ স্বতঃস্ফূর্তভাবে সম্মত হয়ে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেনি। তাদের বাধ্য করে আনা হয়েছে। মুসলমানদের প্রতি তাদের সহানুভূতি রয়েছে। মুসলমানদেরও তাদের প্রতি সহানুভূতি হওয়া উচিত। আবুল বাখতারীকে হত্যা করবে না। কারণ সে নবী বিরোধী চুক্তিনামা রহিত করার জন্য চেষ্টা করেছিলো। একদিন আমাদের সহযোগিতা করার জন্য সশস্ত্র হয়ে বেরিয়েছিলো। সে বলছিলো, যে মুহাম্মাদকে কষ্ট দিবে আমি তাকে হত্যা করবো। হারিস ইবন আমেরকেও হত্যা করবে না। তাকেও কাফিররা জোরপূর্বক এনেছে। হত্যা করবে না যামআ ইবনুল আসওয়াদকেও। কারণ, সেও প্রকৃত অর্থে মুসলমানদের মিত্র।

যারা রাসূলে কারীম (সাঃ)এর কাছে ছিলেন তারা তো এই নির্দেশ শুনলেন এবং অন্যদেরকে এই খবর পৌছালেন। মুসলমানরা সতর্কতা

অবলম্বন করলেন কিন্তু তাদের মধ্যে অনেক লোকই ছিলেন যারা এসব কাফির সম্পর্কে ওয়াকিফহাল ছিলেন না। ঘটনাক্রমে মুহাযযির ইবন যিয়াদ এর মোকাবিলায় আবুল বাখতারী এসে গেলো। মুহায্যার বললেন ঃ আবুল বাখতারী ! তুমি আমার সামনে থেকে সরে যাও। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) তোমাকে হত্যা করতে নিষেধ করেছেন।

আবুল বাখতারী ঃ ভালো কথা। মুহায্যির ! আমার ভয়ে এসব কথা বলছো।

মুহায্যার ঃ আল্লাহর শপথ ! তোমার ভয়ে আমি এসব বলছি না। বাস্তবেই তুমি (কাফিরদের) চুক্তিনামা রহিত করার চেষ্টা করেছিলে। একদিন রাসূলে আকরাম (সাঃ)এর সাহায্যের উদ্দেশ্যে সশস্ত্র অবস্থায় এগিয়ে এসেছিলে। তুমি অনেক এহসান করেছো। আজকে সে অনুগ্রহের প্রতিদান দেওয়া হলো।তুমি আমার হাতে হাত রাখো। আমি তোমাকে নিরাপত্তা দেবো।

আবুল বাখতারী ঃ মুহাম্মাদ আমার অনুগ্রহগুলোকে স্মরণ রেখেছে এজন্য আমি কৃতজ্ঞ। তবে আমি তোমার হাতে হাত রাখবো—এটা সম্ভব নয়। কারণ, এর অর্থ হলো আমি তোমার হাতে বন্দী। আবুল বাখতারী কখনও কয়েদী হতে পারবে না।

মুহায্যার ঃ আচ্ছা, ঠিক আছে তুমি আমার সামনে থেকে সরে যাও। আমি আশংকা করছি, আমার তলোয়ার তোমার মাথায় আঘাত হানে কিনা। অবাধ্যদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাই কিনা আমি।

আবুল বাখতারী ঃ মুহায্যার ! তোমার উপর আমার প্রভাব বিস্তার করেছে। তুমি আমার সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারবে না। তুমি বাকপটুতা দেখাচ্ছো। কিন্তু আমি কখনও তোমাকে ছাড়বো না।

এতদশ্রবণে মুহায্যার ভীষণ ক্রুদ্ধ হলেন। কিন্তু নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করলেন এইজন্য যে, তাকে কতল করলে রাসূলে কারীম (সাঃ)এর অবাধ্যতা হবে। তিনি আবুল বাখতারীর বকওয়াসের কোন পরোয়া করলেন না। অন্য একজন কাফিরের উপর আক্রমণ করলেন। সে কাফির তার ঢালের উপর আক্রমণ করলো। মুহায্যারের তলোয়ার তার ঢাল কেটে ফেললো। চেহারার উপর পড়লো আঘাত।

আবুল বাখতারীও দেখলো সে ক্রুদ্ধ হয়ে গেছে। মুহায্যার ! তুমি আমাকে ভয় পাও। তৈরী হও।

মুহায্যার ঃ আবুল বখতারী ! মুসলমান এক আল্লাহ ছাড়া আর কাউকে ভয় পায় না। তোমাকে হত্যা করা যদি নিষিদ্ধ না হতো তাহলে আল্লাহর কসম ! আমার তরবারী তোমার মাথায় আঘাত হানতো। তুমি আমার সামনে

থেকে সরে যাও। মৃত্যুর সাথে খেলতে যেয়ো না। মুহায্যার সে কাফিরের উপর দ্বিতীয়বার আক্রমণ চালালো, যার ললাট আহত হয়েছিলো আবুল বখতারী তার উপর তলোয়ার উত্তোলন করলো। আহত কাফির এবং মুহায্যারের মাঝখানে এসে দাঁড়ালো। মুহায্যার আগে থেকেই তলোয়ার উত্তোলন করেছিলো। বিদ্যুৎগতির সেই তরবারী আবুল বাখতারীর মাথায় আঘাত হানলো। এর আক্রমণ তার মাথা দ্বিখণ্ডিত করে তলোয়ার গর্দান পর্যন্ত পৌছলো। আবুল বাখতারী ভয়ংকর চিৎকার মারলো। অবশেষে ভূলুণ্ঠিত হলো তার লাশ। তার নিহত হবার ফলে মুহায্যারের দুঃখ হলো। কারণ, তিনি আসলে তাকে হত্যা করতে চাইছিলেন না, অন্য কাফিরের উপর আক্রমণ করেছিলেন মাঝখানে সে এসে পতিত হবার কারণে তার মাথায় আঘাত হলো এবং সে নিহত হলো।

লড়াই তখন প্রচণ্ডরূপে চলছিলো। উমায়ের নামক এক সাহাবী খেজুর খেতে খেতে রাসূলুল্লাহ (সাঃ)এর খেদমতে হাজির হলেন। তিনি আরয করলেন, হে সর্বশেষ নবী! আমি যদি কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে করতে শাহাদত লাভ করি তাহলে সাথে সাথেই কি বেহেশতে প্রবেশ করবো?

প্রিয়নবী (সাঃ) ঃ শুধু তুমিই নও, যেকোন মুসলমান লড়াই করে শহীদ হলে সেই জান্নাতে প্রবেশ করবে।

উমায়ের তখনই অবশিষ্ট খেজুরগুলো ছুড়ে দিয়ে তলোয়ার বের করে আবেগের সাথে কাফিরদের উপর আক্রমণ চালানোর জন্যে ব্যূহের ভিতরে ঢুকে পড়লেন। শাহাদাতের আকাংখা তাকে নির্ভীক বীরে পরিণত করেছিলো। তার আক্রমণ দেখে কাফিররা ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছিলো। ঘটনাক্রমে হারিস এবং জামআ ইবন আসওয়াদ তার সামনে পড়লো। এরা দুজন ছিলো বাহাদুর এবং মশহুর যুদ্ধবাজ। উমায়ের নবী করীম (সাঃ)এর এই কথা শুনেননি যে, হারিস এবং যামআকে যেন কতল করা না হয়। আল্লাহই জানেন, তিনি কোথায় ছিলেন। কোথা থেকে খেজুর খেতে খেতে আসছিলেন। হারিস এবং যামআ একযোগে তার উপর আক্রমণ চালালো। উমায়ের ছিলেন অত্যন্ত স্বতঃস্ফূর্ত এবং বড় যোদ্ধা। তিনি মোড় ঘুরিয়ে প্রথম হারিসের উপর আক্রমণ করলেন। স্বতঃস্ফূর্ততার সাথে এমন জোরে তলোয়ার মারলেন যে, যার গর্দান কেটে মস্তক দূরে ছিটকে পড়লো। আহ্ করারও সুযোগ পেলো না। সে নিহত হলো, তার লাশ শাখাবিশিষ্ট গাছের মতো ধড়াশ করে জমিনে পড়লো। যামআ হামলা করলো উমায়েরের উপর। উমায়ের আড়চোখে তার দিকে তাকাচ্ছিলেন। হামলার সাথে সাথেই লাফ দিয়ে তিনি অন্যত্র সরে দাঁড়ালেন। যামআর হামলা ফাঁকা গেলো। তার তলোয়ার পড়লো জমিনে।

যামআ নিজে মস্তক অবনত করলো। এ সুযোগে উমায়ের অত্যন্ত জোরেশোরে তার উপর আক্রমণ চালালেন। তলোয়ার পড়লো লৌহবর্মের উপর। ফলে ব্যর্থ হলেন। কিন্তু যামআ উমায়েরের শক্তি দেখে ভয় পেয়ে গেলো। তা সত্ত্বেও পুনরায় তার উপর আক্রমণ চালালো। এবারও তিনি নিজেকে রক্ষা করলেন। উমায়ের ছিলেন পদাতিক। যামআ অশ্বারোহী। প্রতিদ্বন্দ্বিতা সমানে সমান ছিলো না কিন্তু উমায়ের তরবারী তার পেটের দিকে মারলেন। যামআ পেটের সামনে ঢাল ধারণ করলেন। উমায়ের দ্রুত তার গর্দানের উপর আক্রমণ করলেন। মাথা দূরে ছিটকে পড়লো। তার লাশ ঘুরতে ঘুরতে জমিতে পড়লো। এভাবে উমায়ের দুই বীর বাহাদুরকে ধরাশায়ী করলেন।

৪৪
বিলাল হাবশীর বীরত্ব

জোরেশোরে লড়াই চলছে। উভয় দলের সারিগুলো ওলট–পালট হয়ে গেছে। মুসলমানরা কাফিরদের ভিতর, কাফিররা মুসলমানদের ভিতর অনুপ্রবেশ করেছে। লড়াই চরম আকার ধারণ করেছে। কাফিররা মনে করেছে মুসলমানরা তো তাদের এক–তৃতীয়াংশও নয়, নেই তাদের দেহে লৌহবর্ম, কাজেই চোখের পলকে তাদের হত্যা করে রণক্ষেত্র পরিস্কার করে দিবে।

কিন্তু যখন মুসলমানরা অত্যন্ত বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করতে আরম্ভ করলো, কাফিররা দেখলো তাদের সাহসিকতা, অটলতা এবং চূড়ান্ত হামলা তখন আর তাদের তাজ্জবের সীমা রইলো না। সতর্কভাবে তারা যুদ্ধ করতে লাগলো। কিন্তু মুসলমানরা তাদের বাঁচতে দেননি। চতুর্দিক থেকে আক্রমণ চালিয়ে যাচ্ছেন। এমনিতে সাধারণ মুসলমানরাও বীরত্বের সাথেই যুদ্ধ করছেন। বিশেষভাবে আবু বকর, ওমর, উসমান, শেরে খোদা আলী, হামযা (রাঃ) অত্যন্ত বীরবিক্রমে যুদ্ধ করছেন। জান বাজী রেখে লড়ছেন। তাদের হামলা ছিলো এত জবরদস্ত যে, কাফিরদের বড় বড় পালোয়ান পর্যন্ত তাদের সামনে টিকে থাকতে পারেনি। তাদের তরবারীগুলো কাফিরদের ঢাল দ্বিখণ্ডিত করছে। ভেঙ্গে খান খান করছে তাদের লৌহবর্মগুলো। মস্তক বিচ্ছিন্ন করছে দেহ থেকে। করছে মাথাগুলো দ্বিখণ্ডিত।

হযরত উমায়ের (রাঃ) অত্যন্ত জোশ ও উত্তেজনা নিয়ে যুদ্ধ করছিলেন। তিনি কামনা করছিলেন শাহাদত। কাফিররা তার মোকাবিলায় আসতে ভয় পাচ্ছিলো। মূলতঃ যারা মৃত্যুকে ভয় পায় না তাদেরকে সবাই ভয় করে। আর যারা মৃত্যুকে ভয় করে তাদের সামনে সবাই সিংহে পরিণত হয়। উমায়েরেব

সামনে থেকে লোকজন পাশ কেটে যেতো। উমায়ের যুদ্ধের ব্যাপারে পরোয়াহীন। তিনি একজন কাফিরের উপরে হামলা চালালেন। তখনই মুশরিকরা তাঁর উপর আক্রমণ করলো। তাঁর কাছে ছিলো না লৌহবর্ম, শিরস্ত্রাণ। তিনটি তলোয়ার একই সাথে তাঁর মাথায় আঘাত হানলো। তাঁর পাগড়ী কেটে মাথা চিরে রক্তের ফোয়ারা বইতে লাগলো। তিনি মাথা ঘুরিয়ে পড়লেন। ভীষণ ক্লান্ত–অবসন্ন হয়ে গেলেন। এমতাবস্থায়ও মোড় ঘুরিয়ে তিনি আক্রমণকারীদের উপর পাল্টা আক্রমণ চালালেন। একজন কাফির জাহান্নামে পৌঁছলো। কিন্তু সাথে সাথে তিনিও মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন। পড়ার সময় অন্য আরেক কাফিরকে জড়িয়ে পড়লেন। তার সিনার উপর উঠে সজোরে গলায় আঘাত হানলেন। ফলে দ্বিতীয় কাফিরটিরও প্রাণবায়ু উড়ে গেলো।

এদিকে উমায়েরের শক্তিও খতম হয়ে গেলো। তৃতীয় কাফির তাঁর উপর আঘাত হানলো। গভীর জখম হলেন তিনি। ইয়া আল্লাহ! বলে তিনি চিৎকার দিলেন। মুচকি হাসলেন আসমানের দিকে তাকিয়ে। অতঃপর শহীদ হয়ে গেলেন। আল্লাহ তা'আলা তাঁর প্রতি রহম করুন।

সূর্য যতই উপরের দিকে উঠছিলো লড়াই ততই জোরদার হচ্ছিলো। তলোয়ারের উপর তলোয়ার, নেজার উপর নেজার আক্রমণ চলছে। মুসলমানরা কাফিরদের কাতারে, কাফিররা মুসলমানদের সারিতে ঢুকছিলো। যে যেখানে পৌঁছেছে সেখানেই অত্যন্ত জোশ ও উত্তেজনা সহকারে যুদ্ধ করছিলো। যুদ্ধের দৃশ্য ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে। রক্তপিপাষু তলোয়ার খুন বহাচ্ছিলো। উমাইয়া এবং তার ছেলে যুদ্ধের এ ভয়াবহ পরিস্থিতি দেখে ভয় পেয়ে গেলো। নিজেদের জান বাঁচানোর জন্য হতবুদ্ধি অবস্থায় ঘুরাঘুরি করছিলো। তাদের ইচ্ছে ছিলো পলায়ন করবে। কিন্তু পলায়ন করতে না পারার কারণ কওম তার প্রতি কাপুরুষতার অভিযোগ চাপিয়ে দিবে। তার ইযযত–সম্মান ভূলুণ্ঠিত হবে। সে প্রতিষ্ঠিত করতে চায় ভুয়া সম্মান। এজন্য লোকজনকে সে লড়াইয়ের জন্য উৎসাহিত করছিলো। কিন্তু নিজে যুদ্ধ থেকে দূরে সরে থাকছিলো। ঘটনাক্রমে হযরত বিলাল উভয়কে দেখে ফেললেন। বিলাল ছিলেন হাবশার অধিবাসী, কৃষ্ণাঙ্গ। উমাইয়া ইবন খালফের গোলাম। মক্কাতে তিনি মুসলমান হয়েছিলেন। উমাইয়া যখন তার ইসলাম গ্রহণের কথা জানতে পারলো। তখন এই বদবখত তার উপর ভয়ানক মুসিবত ও নির্যাতন চাপিয়ে দিলো। ঠিক দ্বিপ্রহরের সময় যখন মরুভূমির বালু শষ্যদানা ভাজার মতো প্রচণ্ড উত্তপ্ত হতো তখন হযরত বিলাল হাবশী (রাঃ)কে সে উত্তপ্ত বালুর উপর শুইয়ে দিতো। পিঠ জ্বলে যেতো। ফোসকা পড়ে যেতো। এ নিষ্ঠুর, নির্দয়, হিংস্রগুলোর মনে এতটুকুও দয়া আসতো না। তাঁর সিনার

উপর বিশাল আকারের পাথরখণ্ড চাপিয়ে দিতো। যারফলে তিনি এপাশ ওপাশও করতে পারতেন না। শ্বাস বন্ধ হয়ে আসতো। নির্যাতন চালাতো মারাত্মক ধরনের। তাঁর উপর বেত্রাঘাত করতো আর বলতো ইসলাম ত্যাগ করো। হযরত বিলালে হাবশী (রাঃ) আহাদ! আহাদ!! করতেন। উমাইয়া আরও ক্রুদ্ধ হতো, আরও মারতে আরম্ভ করতো। একাধারে কয়েক দিন পর্যন্ত খানা বন্ধ করে দিতো। বলতো ইসলাম বর্জন করো। কিন্তু বিলালে হাবশী সেই আহাদ! আহাদ!!ই উচ্চারণ করতেন। উমাইয়া রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে মাতাল হয়ে পড়তো। এমন মার তাকে মারতো যারফলে রক্তে রঞ্জিত হয়ে যেতো বিলালে হাবশীর দেহ।

হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) বিলালে হাবশীকে উমাইয়া থেকে ক্রয় করে আজাদ করে দিয়েছিলেন। মদীনায় হিজরতের পর তিনি হলেন মসজিদে নববীর মুয়াযযিন। আকর্ষণীয় অত্যন্ত উঁচু ও সুরেলা কণ্ঠে বিলালে হাবশী (রাঃ) আযান দিতেন। উমাইয়া ইবন খালফ এবং তার ছেলে আলীকে যখন বিলাল (রাঃ) প্রত্যক্ষ করলেন তখন তলোয়ার উত্তোলন করে তার দিকে দৌড়তে লাগলেন এবং চিৎকার করে বললেন, হে তাগুতের উপাসকরা! আজকে তোমরা আমার হাত থেকে বাঁচতে পারবে না। এটা সত্য ও মিথ্যার রণক্ষেত্র। সত্য সমাগত, মিথ্যা অপসৃত। আজকে তোমরা অন্ধ, বধির ও মূক উপাস্যদের ডাকো যাদের তোমরা পূজা করতে। দেখবে তারা তোমাদের কোন আহবান শুনবে না। এগুলো তোমাদের কোন সাহায্যে আসবে না। এই বলে তিনি তলোয়ার উঁচু করলেন। উমাইয়া এবং আলী হযরত বিলালে হাবশী (রাঃ)কে দেখে থরথর করে কাঁপতে লাগলো। ভয়ে দুজনের চেহারা হলুদ বর্ণ ধারণ করলো। উমাইয়া বললো, বিলাল! তুমি আমাদের ক্রীতদাস ছিলে।

বিলাল ঃ কোন সন্দেহ নেই আমি তোমাদের গোলাম ছিলাম ; কিন্তু তোমরা আমার সাথে কিরূপ দুর্ব্যবহার করেছিলে?

উমাইয়া ঃ ওসব ভুলে যাও। একজন গোলাম তার মনিবের মাথার উপর তলোয়ার উত্তোলন করবে—এটা অত্যন্ত অসদাচরণের ব্যাপার।

বিলাল ঃ এখন আমি তোমাদের ক্রীতদাস নই। আল্লাহ তা'আলা আবুবকর সিদ্দীক (রাঃ)কে প্রচুর ধনসম্পদ এবং মানসম্মান দান করেছেন। তিনি আমাকে তোমার মতো খবীস লোকের হাত থেকে ক্রয় করে আজাদ করে দিয়েছেন। তা সত্ত্বেও আজকে তোমাদেরকে মাফ করতে পারি যদি তোমরা ইসলাম গ্রহণ করো।

উমাইয়া ঃ এটাই তো বিবাদ, বিলাল !

বিলাল ঃ এখনও তোমাদের চক্ষু উন্মেলিত হয়নি? এখনও তোমরা

প্রস্তর মূর্তিগুলোর উপাসনা করছো? আল্লাহর শপথ! তোমরা তোমাদের গোটা জীবন অনর্থক নষ্ট করলে। দয়াময় প্রভু তোমাদের সব নাজ-নেয়ামত দান করেছেন। আর তোমরা কিনা তার কাছ থেকে দূরে সরছো। তিনিই এখন তোমাদেরকে এই বধ্যভূমির দিকে তাড়িয়ে নিয়ে এসেছেন।

আলীর মধ্যে ছিলো যৌবনের জোশ। সে বললো ঃ একজন হাবশী গোলাম তুমি আমাদের সামনে এতবড় স্পর্ধা দেখাচ্ছো? এতবড় কথা বলছো?

বিলাল ঃ এখন আমি আল্লাহর দাস। দুনিয়ার যে কোন রাজা-বাদশাহকেও আমি তুচ্ছ মনে করি। তোমাদের মর্যাদা আর কতটুকু।

উমাইয়া ক্রুদ্ধ হলো। বললো, অনেক কথা বলেছো বিলাল! তুমি যদি মরতেই চাও তাহলে এসো। এই বলে সে বিলালের উপর চড়াও হলো। বিলাল তার আক্রমণ প্রতিহত করলেন নিজের ঢাল দিয়ে। উমাইয়া ছিলো আরোহী আর বিলাল পদাতিক। বিলাল (রাঃ) ছিলেন পশমী পোশাক পরিহিত আর উমাইয়া লৌহবর্ম পরিহিত। উমাইয়া প্রথম মনে করেছিলো সে বিলালকে কতল করে ফেলবে। কিন্তু বিলাল তার হামলা প্রতিহত করতে পেরেছেন দেখে তার আরও ক্ষোভ জন্মালো। লাগাতার কয়েকবার তার উপর হামলা করলো। প্রতিটি আক্রমণকে বিলাল (রাঃ) সুকৌশলে প্রতিহত করলেন। অতঃপর পাল্টা আক্রমণ চালালেন তিনি নিজে। উমাইয়া তার হামলা প্রতিহত করলো।

আলীর ফন্দি-ফিকির ছিলো সে সুযোগ পেলে বিলালের প্রাণ সংহার করবে। একজন আনসারী অপর দিক থেকে তার চেহারার এই ভাব পর্যবেক্ষণ করছিলেন। ফলে তিনি তার উপর হামলা করে তার নজর নিজের দিকে আকৃষ্ট করে ফেললেন। এবার বিলালে হাবশী (রাঃ)এর দিকে একা উমাইয়া। এখনও পর্যন্ত উমাইয়া অব্যাহত গতিতে আক্রমণ চালাচ্ছিলো। বিলাল স্বতঃস্ফূর্তভাবে বিচক্ষণতার সাথে আক্রমণ প্রতিহত করে যাচ্ছিলেন। অবশেষে উমাইয়া ক্লান্ত হয়ে পড়লো।

বিলাল (রাঃ) বললেন ঃ উমাইয়া মৃত্যুর সাথে খেলতে যেয়ো না। এখনও যদি মুসলমান হও বেঁচে যাবে। উমাইয়া আরও ক্রুদ্ধ হলো। সে গর্জন করে বললো ঃ বেদ্বীন! তুই আমাকেও বেদ্বীন বানাতে চাইছিস। তোর এতবড় সাহস! কুরাইশের একজন সম্মানিত নেতাকে বেদ্বীন হওয়ার জন্য আহবান করছিস। এই বলে সে জোরেশোরে হামলা করলো। বিলাল (রাঃ) এটাও প্রতিহত করলেন। উমাইয়া ছিলো স্বীকৃত পালোয়ান, শক্তিশালী ব্যক্তি। তার ধারণা ছিলো কুরাইশ ছাড়া অন্য কোন ব্যক্তি তার মোকাবিলায় টিকে থাকতে পারবে না। কিন্তু বিলাল যখন একে একে তার সবগুলো হামলাই প্রতিহত

করলেন তখন সে ভয় পেয়ে গেলো।

এবার বিলাল আল্লাহু আকবার ধ্বনি উচ্চারণ করে উমাইয়া ইবন খালফের উপর তরবারীর প্রচণ্ড আক্রমণ করলেন। এক কোপে তার মাথা চিরে গলা পর্যন্ত দ্বিখণ্ডিত হয়ে গেলো। উমাইয়া ভয়ংকর চিৎকার মারলো। তার লাশ একটি কর্তিত গাছের ন্যায় ভূলুণ্ঠিত হয়ে পড়লো। বিলাল এই বিস্ময়কর দৃশ্য প্রত্যক্ষ করলেন। বিলাল ছিলেন দীর্ঘদেহী। তার তলোয়ারের আক্রমণের উপর তিনি নিজেই তাজ্জব হলেন। তিনি বললেন ঃ বদবখত! অবশেষে তুই জাহান্নামের ইন্ধন হওয়ার জন্যে দোযখে পৌঁছলি।

সূর্য চমকাচ্ছিলো। প্রবাহিত হচ্ছিলো মৃদু মিষ্টি হাওয়া। এই বাতাসে ঝাণ্ডাগুলো পত পত করে উড়ছিলো। মুসলমানদের আলখাল্লার আঁচলগুলো উড়ছিলো বাতাসে। সূর্যের তেজ রশ্মিগুলো যুদ্ধবাজ বীরবাহাদুর এবং তাদের অস্ত্রশস্ত্র, লৌহবর্ম এবং শিরস্ত্রাণগুলোর উপর পড়ে ঝিকিমিকি করছিলো। তখন যুদ্ধের গতি আরও বৃদ্ধি পেলো। আবেগ তাড়িত হয়ে কাফিররা যুদ্ধ করছিলো। মুসলমানরাও শাহাদাতের আকাংখায় সমরাঙ্গনে তাদের বীরত্ব প্রকাশ করছিলো। তলোয়ার একের উপর আরেকটি পড়ছিলো। তলোয়ারের ঝনঝনানি আওয়াজ গুঞ্জরিত হচ্ছিলো। যুদ্ধাস্ত্রগুলোর ঝংকার, আহতদের চিৎকার এবং কাফিরদের হৈচৈ গোটা ময়দান তোলপাড় করছিলো। ময়দান যেন কাঁপছিলো থর থর করে।

স্বতস্ফূর্তভাবে পরস্পরের তলোয়ারের আঘাত হচ্ছিলো। কাটছিলো কারো হাত, কারো পা। লাশ পড়ছে, খুনের ছিটা বাতাসে উড়ছে। বালুর উপর রক্ত পড়ছে, বালু চোষণ করছে রক্তের ফোয়ারা। আলী ইবন উমাইয়া আনসারীর সাথে এখনও তলোয়ারের খেলায় নিয়োজিত। আনসারী ছিলেন পদাতিক। সে ছিলো ঘোড়ার উপর সওয়ার। আলী তার পিতাকে নিহত হতে দেখে ভয় পেলো। সে ভাবলো, বিলাল তাকে আবার হত্যা করে ফেলে কিনা। এজন্য সে তার প্রতিপক্ষ আনসারীকে দ্রুত হত্যা করে সেখান থেকে সটকে পড়তে চাইলো। প্রচণ্ড আক্রমণ করলো সে। কিন্তু আনসারী তার হামলা প্রতিহত করলেন।

বিলাল গর্জন করে বললেন ঃ কি ব্যাপার আনসারী ভাই! দেরী করছো কেন? তাড়াতাড়ি ওকে জাহান্নামে পৌঁছে দাও। আলী ভীত–সন্ত্রস্ত অবস্থায় তার দিকে তাকালো। আনসারী স্বতঃস্ফূর্তভাবে তার দিকে হামলা চালালেন। তলোয়ারের আঘাত তার মস্তক উড়িয়ে ফেললো। পড়লো জমিনের উপর তার লাশ। কয়েকটি ঘোড়া তার লাশের উপর দলিত মথিত করে অতিক্রম করলো। এ লাশ ছিলো আলী এবং উমাইয়ার।

৪৫
মু'আয (রাঃ)-এর বীরত্ব

এই পর্যন্ত কয়েকজন শীর্ষস্থানীয় বীর–বাহাদুর কাফির নিহত হলো। তাদের লাশ দেখে মক্কার মুশরিকদের ক্রোধ ও জোশ বৃদ্ধি পেলো। বীরবিক্রমে তারা যুদ্ধ করছিলো। মুসলমানদের উপর ক্রুদ্ধ অবস্থায় তারা আক্রমণ চালাচ্ছিলো। মুসলমানরাও অত্যন্ত দৃঢ়পদে বীরত্বের সাথে তাদের হামলা প্রতিহত করছিলেন আবার সুবর্ণ সুযোগ মতো করছিলেন পাল্টা আক্রমণ।

যুদ্ধের ভয়াবহতা আরও বৃদ্ধি পেলো। প্রতিটি ব্যক্তি লড়ছিলো জান বাজি রেখে। রক্তের ফোয়ারা বইছিলো। আহত হয়ে যারা পড়ছিলো তাদের আর উঠার ভাগ্য হয়নি। অশ্ব তাদের দলিত মথিত করেই চলছিলো। মুশরিকরা এই মুহূর্তে বিক্ষুদ্ধ অবস্থায় তাদের ঘোড়াগুলো চড়াও করলো। মুসলমানরা প্রথমতঃ তাদের এই চালে উদ্বিগ্ন হলেন। কিন্তু পিছু হটলেন না। পাহাড় সমান অটলতা নিয়ে তারা যুদ্ধের ময়দানে লড়াই করছেন। তারা অশ্বগুলোর উপর আক্রমণ করছিলেন। ঘোড়াগুলো আহত হয়ে পিছনের দু'পায়ের উপর দাঁড়িয়ে সামনের পা দুটো উঁচিয়ে দৌড়তে আরম্ভ করলো। কাফিররা অশ্বের উপর থেকে নিচে পড়তে লাগলো। ভীত–সন্ত্রস্ত হয়ে তারা পিছনের দিকে পলায়ন করতে লাগলো। তাদের এই কৌশলও ব্যর্থ হলো। মুসলমানদের কোন ক্ষতি হলো না। বরং খুদিত কূয়ায় তারাই পড়লো। তাদের কয়েকজন আরোহী মাটিতে পড়ে গেলো। অশ্বগুলো পদদলিত করলো তাদের। অনেকগুলো উট, ঘোড়া লাগামহীনের মতো স্বীয় সেনাবাহিনীর মধ্যে দৌড়ে পালাতে লাগলো। ফলে, রণাঙ্গনে আরো অবনতি দেখা দিলো।

অনেক কাফির উন্মাদ অশ্বগুলোকে নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করলো। কিন্তু এই কর্মটি সহজ ছিলো না। যে কেউ আহত ঘোড়ার কাছে যেতো, তাকেই অশ্ব কামড় দিতো অথবা আহত করতো।

যাহোক, কোনরকমে কিছুসংখ্যক ঘোড়া বাগে এনে রণাঙ্গন থেকে তারা বাইরে নিয়ে গেলো। ডবল রশি দিয়ে বাঁধলো সেগুলোকে। যেহেতু অশ্বগুলো আহত এবং জখমগুলোর মধ্যে যেন মরিচ ছিটিয়ে দেয়া হয়েছে সেহেতু স্থির হয়ে এগুলো দাঁড়াতে পারছিলো না। ওগুলো কেবল লাফালাফি করছিলো। যুদ্ধ ভয়াবহ প্রচণ্ড আকার ধারণ করছিলো। তখন কারো এতটুকু ফুরসত ছিলো না যে, আহতদের পট্টি বাঁধবে। ঘোড়াগুলোর কথাতো দূরে থাক।

সূর্যের উত্তাপ আরও তীব্র আকার ধারণ করলো। তেজ হাওয়া প্রবাহিত হচ্ছিলো। উত্তাপের কারণে বাতাস লু হাওয়ার মতো প্রবাহিত। একেতো উষ্ণ

এলাকা, দ্বিতীয়তঃ গ্রীষ্মকাল, তৃতীয়তঃ যুদ্ধের কষ্ট, ফলে, ভীষণ পিপাসায় লোকজন অস্থির। সাহাবায়ে কেরাম পানির ইন্তেজাম করেছিলেন প্রথমেই। মূলতঃ আল্লাহ তা'আলাই সে ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। তারা একটি হাউজ তৈরী করেছিলেন কূপের সন্নিকটে। কূয়ার পানি এবং বৃষ্টির পানিতে হাউজ ভর্তি হয়ে গেলো। মুসলমানরা তাতে পানপাত্র রেখে দিয়েছিলো। তাদের যখন পিপাসা লাগতো, দু'চারজন করে সেখানে যেয়ে তৃষ্ণা মিটিয়ে পানি পান করে আসতেন। যুদ্ধ করতেন তাজাদম হয়ে। কাফিররা দেখলো তারা সেখান থেকে পানি পান করছে। এজন্য তারাও আসলো পানি পান করতে। তাদের জানা ছিলো না, কিছুসংখ্যক মুসলমান এখানেও প্রহরায় রত। হাউজের নিকটে যখন তারা আসছিলো তখনই প্রহরীরা তাদের উপর আক্রমণ চালালো। দুইজনকে হত্যা করে অবশিষ্টদেরকে ফিরে যেতে বাধ্য করলো।

এমনি তো সব কাফিরই জানবাজি রেখে লড়ছিলো। তারা বুঝতো মুসলমানরা জিন্দা থাকলে তাদের ধর্মের নামনিশানা টিকে থাকবে না। ইসলাম বিজয়ী হবে এবং কুফর হবে অবদমিত। কুফরের জিল্লতি বাড়বে। এজন্য রণাঙ্গনে তারা বীরত্ব প্রদর্শন করছিলো। তাদের শীর্ষস্থানীয় নেতারা জোরেশোরে লড়ছিলো। একেতো তাদের মনে বাতিল উপাস্যদের অবমাননার ক্রোধ দ্বিতীয়তঃ স্বধর্মের খেয়াল, তৃতীয়তঃ প্রচুরসংখ্যক সহকর্মীকে তারা হারিয়েছে ফলে পূর্ণ শক্তিতে তারা যুদ্ধে লিপ্ত।

বিশেষতঃ আবু জেহেল স্বতঃস্ফূর্ততার সাথে তখনও লড়ে যাচ্ছিলো। তার আকাংখা ছিলো একাই সব মুসলমানের প্রাণ সংহার করবে। কিন্তু অবশেষে তার সে ধারণা বাস্তবরূপ ধারণ করেনি। মুসলমানরা তাদের আক্রমণ প্রতিহত করছিলেন। তারা বাধ্য হয়েই পিছু হটছিলো। তা সত্ত্বেও তাদের জয়জয়কারের প্রাণান্তকর প্রচেষ্টা চালাচ্ছিলো।

আনসারীদের মধ্যে হযরত আফরার সন্তান মু'আয এবং মুআওয়ায ছিলেন অত্যন্ত কমবয়স্ক কিন্তু উচ্ছাসী–আবেগময়ী। তারা শুনেছিলেন আবু জেহেল মুসলমানদের উপর অনেক জুলুম নির্যাতন চালিয়েছিলো। সে ইসলাম ও মুসলমানদের নিকৃষ্টতম দুশমন। তারা দু' ভাই প্রতিজ্ঞা করেছিলেন রণাঙ্গনে আবু জেহেলকে তালাশ করবে। তাকে পেলে তার বিরুদ্ধে লড়বেন। যুদ্ধ করে হয় মরবেন, না হয় মারবেন।

কিন্তু তারা কমবখত আবু জেহেলকে চিনতেন না। যুদ্ধের ময়দানে তাকে তালাশ করে ফিরছিলেন। লৌহবর্ম পরিহিত উত্তম পোশাকের কোন লোককে দেখলেই আবু জেহেল মনে করে লোকদেরকে তার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতেন। আবু জেহেলকে না পেলে তারা সম্মুখে অগ্রসর হতেন। আবু জেহেলের

তালাশে তারা অস্থির। আবু জেহেলকে তাদের খুঁজে পেতেই হবে এই ধান্ধায় তারা সমরাঙ্গনে ঘুরছেন। অবশেষে আবদুর রহমান ইবন আউফ (রাঃ)–এর কাছে পৌছলেন। তিনি তখন কোন কাফিরের উপর আক্রমণের প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। মু'আয (রাঃ) তাকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ আমি আপনাকে একটি কথা জিজ্ঞেস করতে চাই।

আবদুর রহমান ঃ জিজ্ঞেস করো।

মু'আয ঃ আবু জেহেল কোন্‌টি?

এই প্রশ্ন শুনে আবদুর রহমান অবাক হয়ে পড়লেন। কারণ, আবু জেহেল প্রধান বীরবাহাদুর ও বিখ্যাত যুদ্ধবাজ। মু'আয ও মুআওয়ায দু'জনই ছিলেন কমবয়স্ক ও অনভিজ্ঞ। তাই আবদুর রহমান জিজ্ঞেস করলেন ঃ ভাতিজা! আবু জেহেল সম্পর্কে কেন জানতে চাইছো?

মু'আয ঃ আমি এবং আমার ভাই মুআওয়াজ দৃঢ়প্রতিজ্ঞা করেছি, হয়তো আমরা আবু জেহেলকে মারবো অন্যথায় শহীদ হয়ে যাবো।

আবদুর রহমান ঃ তোমাদের সাহস প্রশংসার যোগ্য। কিন্তু ভাতিজারা! তোমরা আবু জেহেলকে মারতে তার সামনে যেয়ো না। এই বদকার বড় বীর ও অভিজ্ঞ পুরুষ।

মু'আয ঃ কিন্তু আমরা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।

আবদুর রহমান ঃ আল্লাহ তা'আলা তোমাদের হাতেই এই জালেমকে অপদস্থ ও হত্যা করুন। দেখো, ওই যে সশস্ত্র আবু জেহেল। তার শিরস্ত্রাণের উপর একটি রেশমী রুমাল। তার সিনার উপর একগুচ্ছ রেশম ঝুলে আছে। এই বলে আবদুর রহমান ইশারা দিয়ে আবু জেহেলকে দেখিয়ে দিলেন। ওরা দুভাই খুশিতে আটখানা হয়ে তার দিকে দৌড়লো। তারা দুজন আবু জেহেলের কাছে যেতেই সে একজন সাহাবীর উপর আক্রমণ করলো। মুসলমান স্বতঃস্ফূর্তভাবে হামলা থেকে নিজেকে রক্ষা করলেন। চালালেন পাল্টা আক্রমণ।

হযরত মু'আয (রাঃ) চিৎকার করে বললেন, এটা আমার শিকার। তাকে আমার জন্য ছেড়ে দিন। সে মর্দে মুজাহিদ হামলা করলেন না। হযরত মু'আয (রাঃ) তার সামনে যেয়ে বললেন ঃ কুরাইশের অপদস্থ সন্তান! তুমি আক্রমণ করো। তোমার দিলের এই তামান্না যেন না থাকে যে, তুমি কিছুই করতে পারলে না। আবু জেহেল তাকে দেখলো। একটি কমবয়স্ক বালক বীর বাহাদুর হয়ে গেছে। সে ক্রোধে গর্জন করে বললো, এই বেয়াদব! এক্ষুণি তোর জিহবা কেটে ফেলবো। সে অত্যন্ত প্রচণ্ডতার সাথে আঘাত হানলো। আবু জেহেল ছিলো আরোহী এবং লৌহবর্ম পরিহিত। হযরত মু'আয (রাঃ)

ছিলেন সাদাসিধে সুতি পোশাক পরিহিত। আবু জেহেল ছিলো বর্ষীয়ান, অভিজ্ঞ আর এরা ছিলেন কমবয়স্ক, অনভিজ্ঞ। কোন দিক দিয়েই তারা আবু জেহেলের সমকক্ষ ছিলেন না। সাহাবীকে সে আক্রমণ করলো। সাহাবী লাফিয়ে অন্যদিকে যেয়ে দাঁড়ালেন। আবু জেহেলের হামলা ব্যর্থ হলো। অতএব, দ্বিতীয়বার ক্রুদ্ধ আক্রমণ চালালো। মু'আয (রাঃ) ঢাল পেতে দিলেন। তলোয়ারের আঘাত ঢালের উপর পড়ে ব্যর্থ হলো। মু'আয (রাঃ) অত্যন্ত স্বতঃস্ফূর্ততার সাথে তলোয়ার চালালেন। ধারালো উজ্জ্বল তলোয়ার বিদ্যুতের ন্যায় চমক দেখিয়ে সামনে অগ্রসর হলো। অগ্নিশর্মা হয়ে গেলো আবু জেহেলের চোখ দুটো। বিদ্যুৎ বেগে তার তলোয়ার পায়ের গোছার উপর আঘাত হানলো। পায়ের গোছা কেটে পড়লো। ঘোড়াও হলো আহত। আবু জেহেল গড়িয়ে পড়লো।

পায়ের গোছা কাটার ফলে দূরাত্মা আবু জেহেলের সারা শরীরে যেন দাউ দাউ করে আগুন জ্বললো। ভয়ংকর চিৎকার মারলো সে। তার চেহারা ব্যথা ও বিপদের কারণে ভয়ানক আকার ধারণ করলো। আপাদমস্তক তার কাঁপছিলো। আজকে সে এমন আঘাতপ্রাপ্তই হলো যারফলে হাড়ে হাড়ে টের পেলো আঘাতের কষ্ট কি। এতদিন সে হিংস্র হায়েনার ন্যায় জুলুম-অত্যাচার করতো। মুসলমানদের বেত্রাঘাত করতো। নেজার আঘাত হানতো। মানুষ যখন বেদনায় কোঁকাতো তখন সে তাদের নিয়ে ঠাট্টা বিদ্রুপ করতো। কিন্তু আজকে তারই এই দুর্দশা। যেহেতু তার ঘোড়াও ভীষণভাবে আহত হয়েছিলো সেহেতু সে পিছনের দুপায়ের উপরে দাঁড়িয়ে ছিলো। জখমের তীব্রতার কারণে আবু জেহেল অস্থির। ঘোড়ার উপর সে টিকতে পারেনি। মাটিতে পড়ে গেলো।

মু'আয (রাঃ) আবেগময় কণ্ঠে আল্লাহু আকবার ধ্বনি দিলেন। এখনও তিনি পুরোপুরি হত্যার আনন্দ উপভোগ করতে পারছেন না। এমতাবস্থায় তার স্কন্ধের উপর তলোয়ার আঘাত হানলো। হাত কেটে ঝুলন্ত অবস্থায় সামান্য একটু অংশ সিনার সাথে লেগে ছিলো। তার মনে হচ্ছিলো যেন সারা শরীর আগুনে ঝলসে দেয়া হয়েছে। শরীরে যেন আগুন লেগেছে। কিন্তু সাবাশ তার জন্য যে, তার মুখ থেকে একবার উহ্ শব্দ বের হয়নি। বরং তৎক্ষণাৎ ফিরে তলোয়ারের আঘাতকারী ব্যক্তির দিকে তাকালেন। দেখলেন সে আবু জেহেলের সন্তান ইকরিমা। রক্তাক্ত তরবারী নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ইকরিমা বললো, নিজ হাতে আমি আমার বাপের প্রতিশোধ নিয়েছি। হযরত মু'আয (রাঃ) আবেগাপ্লুত কণ্ঠে বললেন ঃ কাপুরুষ কোথাকার! বাহাদুর সামনে এসেই প্রতিশোধ নেয়। আমার হাত কেটে গেছে তাকে কি? মনে হিম্মত

রয়েছে। তুমি সামনে এসো। কিন্তু ইকরিমা হযরত মু'আয (রাঃ)এর সামনে আসতে সাহস করলো না। মু'আয (রাঃ) ঝটপটে তার উপর আক্রমণ চালালেন। এটা ছিলো অত্যন্ত সাহসিকতার কাজ। তার এক হাত ঝুলন্ত! জখমের কারণে মারাত্মক কষ্ট হচ্ছিলো। তা সত্ত্বেও এত জোরে তিনি তলোয়ার মারলেন যে, ইকরিমার ঢাল ভেঙ্গে তার গর্দানের উপর এসে পড়লো। ইকরিমা আহত হয়ে পলায়ন করলো। মু'আয (রাঃ) বললেন ঃ কাপুরুষ পালিয়েছে। মু'আয (রাঃ) এ অবস্থায় কাফিরদের উপর আক্রমণ চালালেন। কর্তিত হাত নিয়ে তিনি লড়াই করছেন। যেহেতু এ অবস্থায় লড়াই করাও বিপদজনক তাই তিনি ঝুলন্ত হাতটি পায়ের নিচে রেখে টান দিয়ে ছিড়ে ফেললেন। হাতটি পৃথক হয়ে গেলো। অনেক কষ্ট হয়েছিলো এতে তার। তা সত্ত্বেও তিনি পরোয়া করেননি। এক হাতেই তিনি যুদ্ধ করতে থাকলেন।

৪৬
খোদায়ী মদদ

উত্তপ্ত রণাঙ্গন। দু'পক্ষ বীরদর্পে নেহায়েত জোরেশোরে হামলা করছে। পৌত্তলিকরা লড়াইয়ে এরূপ মশগুল যে, তারা আবু জেহেলেরও খবর রাখেনি। অথচ আবু জেহেল মারাত্মক আহত অবস্থায় পড়ে আছে। এই পরিস্থিতি দেখলে অবশ্যই তারা পালিয়ে যেতো। কারণ, আবু জেহেলের পূর্বেও কয়েকজন নামিদামী অধিনায়ক নিহত হয়েছে। যাদের বীরত্বের সুখ্যাতি ছিলো প্রচুর। যাদের বাহাদুরীর গর্বে তারা লড়তে এসেছিলো। আর দুর্ধর্ষ আবু জেহেল ছিলো তাদের সিপাহসালার। তাকে লড়াইয়ের ময়দানে এরূপ অসহায় অবস্থায় ধুলায় লুণ্ঠিত হতে দেখলে তাদের পায়ের তলা থেকে মাটি সরে যেতো কিন্তু তারা দেখেইনি তাকে। এজন্য এতক্ষণ পর্যন্ত যুদ্ধ অব্যাহত রেখেছে। এতক্ষণ পর্যন্ত খুন পিপাসু তলোয়ারগুলো স্বতঃস্ফূর্তভাবে কাজ করছিলো। জানবাজ সৈনিকদের মাথার উপর আক্রমণ চালাচ্ছিলো। মক্কার কাফিররা চাইছিলো মুসলমানদেরকে পিষে ফেলতে। উত্তেজনায় তারা প্রচণ্ড আকারে হামলা চালাচ্ছিলো। মুসলমানদেরকে হটিয়ে দেয়া অথবা কতল করার অভিলাষ ছিলো তাদের। কিন্তু মুসলমানরা লোহার মতো অটল। যুদ্ধ থেকে পিছু হটার কল্পনাও তারা করেনি। তাদের তলোয়ারগুলো শিরস্ত্রাণের উপর আক্রমণ করে সেগুলোকে দ্বিখণ্ডিত করতো। ঢালগুলোকে করতো টুকরো টুকরো। মুশরিকরা রাগ ও ক্ষোভে মুহ্যমান। তাদের তলোয়ার সতেজ স্বতঃস্ফূর্তভাবে এখনও চলছে। মুসলমানরা তাদের হামলা অনায়াসেই

প্রতিহত করছে। যুদ্ধ যখন প্রচণ্ড আকারে চলছে জানবাজরা জানবাজি রেখেই যুদ্ধ করছে। তরবারীগুলো একেকজনের দেহ টুকরো টুকরো করছে। বালুর উপর খুনের ছাপ লাগছে। প্রিয়নবী (সাঃ) তখন সমরাঙ্গনের একপাশে দাঁড়িয়ে রণক্ষেত্রের দিকে তাকাচ্ছিলেন। প্রিয়নবী (সাঃ)–এর আলোকোজ্জ্বল চেহারা তখন ফ্যাকাশে। বেচয়েনীর আলামত সুস্পষ্ট।

সূর্য তখন আকাশের মধ্যবর্তী স্থানে। সূর্যের উত্তাপ এবং চমক বৃদ্ধি পেয়েছে। বালুকণাগুলো ঝিকমিক করছে। উত্তপ্ত গরম বালুরাশি। যোদ্ধাদের শরীর ঘর্মাক্ত। দু'পক্ষের ব্যূহই লণ্ডভণ্ড। মুসলমানরা কাফিরদের এবং কাফিররা মুসলমানদের সারির ভিতর গুলিয়ে গেছে। যে যেখানে আছে সেখান থেকেই যুদ্ধ করে যাচ্ছে। যদিও কাফির বেশীসংখ্যক মারা যাচ্ছে কিন্তু তাদের সংখ্যা বেশী হবার কারণে নিহত এখনও তাদের সংখ্যাধিক্যই দেখা যাচ্ছিলো। মুসলমানদের মনে হচ্ছিলো পরাস্ত। কাফিরদের পাল্লাই ভারী। রাসুলুল্লাহ (সাঃ) এই মুহূর্তে আকাশের দিকে তাকিয়ে দু'আ করলেন। তাঁর স্বরে ছিলো মাহাত্ম্যের আভা। তিনি আরয করলেন, হে আল্লাহ! হে অসহায়দের সহায়ক! হে ফরিয়াদীর ফরিয়াদ শ্রোতা! তোমার সেই সাহায্য দেখাও যে সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়েছো। হে বিশ্ব মাবুদ! মুসলমানরা ক্লান্ত, অবসন্ন, তোমার সাহায্য যদি না হয় তাহলে মুসলমানরা পরাস্ত হয়ে যেতে পারে। হে আমার মাবুদ! তোমার মুখলিস বান্দাদের তুমিই সাহায্য করো। এরা একত্ববাদের অনুসারী। তারা তোমার নাম উজ্জ্বল করতে এবং ইসলামের বুলন্দী দান করতে চাইছে। তারা অপারগ। তারা মজলুম, অসহায় দুর্বল। তুমি তাদের খবর নাও। এখনি তুমি তাদের সাহায্য করো।

দু'আ চেয়েই রাসুলুল্লাহ (সাঃ) এখনও আকাশের দিকে তাকিয়ে আছেন। দেখলেন একখণ্ড মেঘ মুসলিম মুজাহিদদের অনতিদূরেই এসে থেমে গেছে। আবার সামনের দিকে অগ্রসর হতে আরম্ভ করেছে। এই মেঘখণ্ডটুকু কিছুক্ষণের মধ্যেই একেবারে রণক্ষেত্রের উপরে এসে পৌঁছেছে। এই আবরখণ্ড দেখে প্রিয়নবী (সাঃ) মুচকি হাসলেন।

একজন সাহাবী একজন কাফিরকে হত্যার উদ্দেশ্যে তার পশ্চাতধাওয়া করছিলো। তিনি দেখলেন একটি মেঘখণ্ড পাহাড়ের পিছন থেকে উঠে আসছে আর সাহাবী তো কাফিরের পিছনে দৌড়াচ্ছেন। হঠাৎ তিনি একটি আওয়াজ শুনলেন—'উকদুম হাইযূম' অর্থাৎ, হে হাইযূম[১] সামনে অগ্রসর হও।[২] তার

টীকা ঃ ১. জিবরাঈল (আঃ)এর অশ্বের নাম।

২. তারীখে ইসলাম ঃ ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৪৮৬।

সাথে সাথে শুনলেন একটি বেত্রাঘাতের আওয়াজ। সাহাবী যে কাফিরের পশ্চাতধাওয়া করছিলেন দেখলেন তার দেহ একটু সামনেই লাশ হয়ে পড়ে আছে। লাশটির কাছে যেয়ে তিনি দেখলেন, তার নাক ফেটে গেছে। চেহারায় বেত্রাঘাতের চিহ্ন। এই পরিস্থিতি দেখে তিনি বিস্ময়াভিভূত হলেন। তখনই এসে প্রিয়নবী (সাঃ)এর খেদমতে প্রদর্শিত সেই ঘটনার বিবরণ শুনালেন।

প্রিয়নবী (সাঃ) ইরশাদ করলেন ঃ আল্লাহ তা'আলা ফেরেশতাদের সাহায্যে পাঠিয়েছেন। হাইযূম হলো ঘোড়ার নাম।

মক্কার কাফিরদের সাথে কিছুলোক এইরূপও এসেছিলো যারা যুদ্ধ করতে চায়নি। তারা ফন্দি আঁটছিলো মুসলমানদের পরাজয় ঘটলে মাল–সামান লুটপাট করে নিয়ে যাবে। তাদের খেয়ালই ছিলো না যে, মুসলমানদের মাল–দৌলত, আসবাবপত্র কিছুই নেই। তারা এই অবস্থা দেখে নিরাশ হলো এবং এই দীর্ঘ সফরের কষ্টের ফলে আক্ষেপ করলো। এরূপ দু'জন ব্যক্তি নিকটবর্তী একটি পাহাড়ের উপর আরোহণ করলো। তারা দেখছিলো যুদ্ধের তামাশা। তারাও একটি মেঘখণ্ড পাহাড়ের নিচ থেকে উপরের দিকে উঠতে দেখলো।

তাদের একজন বললো ঃ আজকে কি বৃষ্টি হবে।

দ্বিতীয় জন বললো ঃ বৃষ্টির কোন লক্ষণ নেই।

প্রথম ব্যক্তি ঃ এই মেঘখণ্ডের দিকে লক্ষ্য করোনি।

দ্বিতীয় ব্যক্তি ঃ আমি এই মেঘখণ্ড পাহাড়ের পিছনে দেখেছি। এবার দেখছি এটা সামনের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। কিন্তু এতো সামান্য আবরখণ্ড। এ থেকে কি বৃষ্টি হবে। এতো নিজেই বাতাসের ঝাপটায় উড়ে যাবে। তখন সে আবর খণ্ড তাদের মাথার উপর এসে থামলো। ভিতর থেকে এলো ঘোড়ার হ্রেষাধ্বনি। দু'জন বিস্ময়ের দৃষ্টিতে উপরের দিকে তাকালো। কারণ, নিরব জড় পদার্থ আবর থেকে আওয়াজ আসছে, 'সামনের দিকে অগ্রসর হও।' এই আওয়াজ শুনে একজন ঘাবড়ে গেলো। সে পাথরের উপর শুয়ে পড়লো। অপরজন তাকে ঝাঁঝালো কণ্ঠে ডাকলো ঃ হে চাচাতো ভাই! কিন্তু সে কোন জবাবই দিলো না। দ্বিতীয় জন গভীরভাবে লক্ষ্য করলো। দেখলো সে মরে লাশ হয়ে আছে।[১]

পাহাড়ের পিছন দিক থেকে এই মেঘখণ্ড উঠে আসছিলো তা মুসলমান কাফির সবাই দেখেছিলো। মুসলমানরা এদিকে তেমন দৃষ্টিপাত করেনি। কিন্তু অনেক কাফির সেটার দিকে গভীরভাবেই তাকিয়েছিলো। বোধহয় এই আশায়

টীকা ঃ ১. তারীখে ইসলাম ঃ ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৫৬।

যে, তারা পিপাসার্ত। বৃষ্টি হবে। তারা পানি পান করতে পারবে। কিংবা মেঘের ঘনঘটা ছেয়ে যাবে। সূর্য মেঘের পিছনে ঢাকা পড়বে। ফলে উত্তাপ কিছুটা কমবে। পিপাসাও হ্রাস পাবে কিছুটা কিন্তু সে আবর বেশিদূর বাড়েনি। সমরাঙ্গনের উপরে এসেই থেমে যায়। কাফিররা তার ভিতর থেকে অশ্বের হন হন আওয়াজ শুনলো। বিস্ময়ভরে তারা দেখতে লাগলো সেটির দিকে। ওর ভেতর থেকেই আওয়াজ শুনছে। কেউ বলছে ঃ অগ্রসর হও, দ্রুত অগ্রসর হও। বহু কাফির এই আওয়াজ শুনে ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পড়লো। ভয়ে তারা কাঁপছিলো। কিন্তু এখনও তারা উপরের দিকে অপলক নেত্রে দেখছিলো। তারা বেতের ঝলক এরূপ দেখছিলো যে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। ফলে তাদের মধ্যে ভয়-ভীতি আরও বিস্তার লাভ করলো। আনত হলো তাদের চোখগুলো।

কিছুসংখ্যক লোক চোখ নিচের দিকে ঝুকিয়ে তৎক্ষণাৎ মেঘের দিকে তাকাতে লাগলো। তাদের মধ্য থেকে একজনের বিবরণ ঃ সে দেখেছে এক জায়গা থেকে আবর বিদীর্ণ হয়েছে। তা থেকে সুন্দর সবুজ পোশাক পরিহিত একজন অশ্বারোহী বেরিয়ে আসছেন। তার চেহারা থেকে প্রভাব ও মাহাত্ম্য প্রকাশমান, যার ফলে তার মন কেঁপে উঠলো। তার নিকটেই ছিলো আরেকজন কাফির দাঁড়ানো। সেও এমনিরূপে তাকাচ্ছিলো। থরথর করে কাঁপছিলো তার দেহ। চেহারা প্রথম হলুদ অতঃপর কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করলো। ভয়ার্ত অবস্থায় বিস্ফরিত হয়ে উঠলো আঁখিযুগল। সে অশ্বারোহী তাদের উপর জোরেশোরে আঘাত হানলো। লোকটি জমিনে ধরাশায়ী হয়ে পড়লো। যে কাফিরটি তার দিকে তাকিয়েছিলো সে ভালো করে লক্ষ্য করলো, তার প্রাণবায়ু উড়ে গেছে। আরও যারা চিৎকার শুনেছে তারাও এসে দেখলো, লোকটি মৃত অবস্থায় পড়ে আছে। তারা তাকে নাড়াচাড়া দেওয়ার চেষ্টা করলো। কিন্তু নড়ছে না, একেবারে নিস্প্রাণ।

বহু কাফির এখনও আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখছে। অনেকে সবুজ পোশাক পরিহিত আরোহীদেরকে প্রত্যক্ষ করেছে স্বচক্ষে। দেখে কেউ কেউ মৃত্যুবরণ করেছে। কিন্তু আবর বরাবর থাকার কারণে সবুজ পোশাক পরিহিত আরোহীদের সাধারণতঃ পরিলক্ষিত হতো না। মুসলমানরা আবরখণ্ড দেখতেন। আবরখণ্ডের দিকে তাকিয়ে যুদ্ধকে আবশ্যকীয় মনে করতেন। তারা আরও বীরবিক্রমে যুদ্ধ করতেন। ভয়ানক যুদ্ধ চলছে। রণক্ষেত্রের পরিস্থিতি নাজুক। মুসলমানরা অটল। তারা কাফিরদের তাড়িয়ে দিতে চাইছে। কাফিররাও প্রাণপণে যুদ্ধ অব্যাহত রেখেছে। তারা চাইছে তাদের নেতাদের প্রতিশোধ নিতে। তলোয়ারের পর তলোয়ার চলছে। তাদের ফিকির ছিলো মুসলমানদের নামীদামী দু'চারজনকে অন্ততঃ কতল করে

ছাড়বে। অতএব, অনেকগুলো কাফির একজোট হয়ে আবু বকর সিদ্দীক, উমর ফারুক, উসমান গনী, শেরে খোদা আলী, আমীর হামযা, আবু আইউব আনসারী (রাঃ) প্রমুখের দিকে অগ্রসর হলো। প্রিয়নবী (সাঃ) এই দৃশ্য দেখে আল্লাহর দরবারে দুআ করলেন ঃ আয় আল্লাহ! তোমার জন্য জান উৎসর্গকারী এই মুজাহিদদের তুমিই দেখাশুনা করো। রেসালতের মশাল তারাই প্রজ্জ্বলিত করে রাখবে। ইসলামের জন্য এরা পাগল। তাদের একটি পশমও যেন কেউ হেলাতে না পারে। দু'আ করে তিনি রণক্ষেত্রের দিকে তাকাচ্ছিলেন।

৪৭
মহাবিজয়

কাফিরদল খ্যাতনামা সাহাবায়ে কেরামের উপর আক্রমণ করলো। তাদের উপর আক্রমণ করতে দেখে নবী করীম (সাঃ) দু'আ করেছিলেন। সেসব সাহাবায়ে কেরাম বিক্ষিপ্ত অবস্থায় ছিলেন। লড়ছিলেন স্বতন্ত্রভাবে। তাদের কারো গায়েও লৌহবর্ম ছিলো না। কিন্তু তারা এসবের কোনই পরোয়া করেননি। কাফিররা উন্মত্ত অবস্থায় তাদের উপর আঘাত হানছিলো।

কাফিরদের এই দলটিকে হামলা করতে দেখে মুসলমানরা তা প্রতিহত করতে চাইলেন। যুদ্ধের ময়দানে তাদের সামনে তারা অটল। হযরত মুআয (রাঃ) যার একটি হস্ত কেটে গিয়েছিলো, শুধু একহাতেই লড়ছিলেন। তিনি এমন স্বতঃস্ফূর্ততার সাথে যুদ্ধ করছিলেন যার ফলে কাফিররা তার উপর হামলা করার সুযোগই পাচ্ছিলো না। এক-দুজনকে তারা কতল করছিলো, আহত করছিলো। কাফিরদের ক্রোধ শুধুই বাড়ছিলো। কারণ, একহাতবিশিষ্ট একজন মুসলমানকেও কাবু করতে পারছে না। তারা যতই ক্ষোভ ও ক্রোধ নিয়ে হামলা করছিলো কিন্তু মুসলমানদের তলোয়ার চালনা দেখে কাছে যাবার সাহস পাচ্ছিলো না।

বিস্ময় সে যুগের সেসব মুসলমানদের ব্যাপারে! আল্লাহ মা'লুম, তারা কিসের তৈরী ছিলেন। তাদের মন ছিলো কিরূপ। কিছুক্ষণ আগেই একটি হাত কেটেছেন, গোশতের কিছু অংশ ওই হাতটির সাথে ঝুলন্ত। সেই হাতটিকে পায়ের নিচে নিজেই চেপে ধরে বিচ্ছিন্ন করে ফেললেন। এর কষ্টের অনুমান ভুক্তভোগীই করতে পারে। কিন্তু এই সাহাবী জখম ও তাকলীফের কোন পরোয়াই করেননি। জিহাদের স্পৃহা, শাহাদাতের আকাংখা এসব কষ্ট-তকলীফের অনুভবই আসতে দেয়নি। একহাতে যুদ্ধ করছেন এবং

একহাতেই প্রতিহত করছেন শত্রুর হামলা। আগ্রাসী আক্রমণ চালিয়ে কাফিরদের কতল ও জখম করছেন। বীরবিক্রমে লড়ছেন যারফলে মুশরিকরা তার ধারে কাছে আসতেও সাহস পাচ্ছে না।

আজকালকের মুসলমানরা তো নামেই শুধু মুসলিম। ভোটার লিষ্টে নামধারী মুসলমান। আমাদের না আছে ইসলামী জযবা, না সাহসিকতা, না ধর্মের সাথে কোন সম্পর্ক, না আল্লাহর ভয়। নামায নেই, রোযা নেই। আল্লাহকে ভুলে বসে আছি। আল্লাহ তা'আলা আমাদের উপর অনুগ্রহ করছেন। তিনি যদি বিশ্বসৃষ্টির রিযিকদাতা এবং অসীম দয়ালু না হতেন তাহলে আমাদের মতো মুসলমানদের বদআমলীর কারণে আমাদের রিযিকও দিতেন না। এটা তার অপার অনুগ্রহ যে, আমাদের মতো নাফরমানদের রিযিক দিচ্ছেন। সসম্মানে দুনিয়াতে বাঁচতে পারছি আমরা। তিনি আমাদের চোখ খোলার জন্য, উপদেশ গ্রহণ করার উদ্দেশ্যে তার দিকে আকৃষ্ট হবার জন্য আমাদের হাত থেকে হুকুমত ছিনিয়ে নিয়েছেন। এসব সত্ত্বেও আমাদের কোন উপদেশ হাসিল হচ্ছে না। আমরা অন্ধই রয়ে গেছি। গোনাহর সমুদ্রে এখনও ডুবে আছি। আল্লাহর নির্দেশ হচ্ছে, মুসলমান পরস্পরে একজনকে অপরজনকে ভাই মনে করবে। কিন্তু আমরা আপন ভাইকেও দুশমন মনে করছি। পরস্পরে লড়ছি কুকুরের মতো। বদনাম করছি ইসলাম ও মুসলমানদের। দ্বীনের খাতিরে সামান্যতম তকলীফ বরদাশত করতে আমরা প্রস্তুত নই। জান দেয়া তো পরের কথা। আমরা খুব বাকপটু। কাজের বেলায় ঠনঠন। যাদের নামায রোযা দ্বীনদারীর কোন খবর নেই তারা করবেই বা কি? একদল অপরদলকে কাফির বলবে, মুনাফিক বলবে, দলাদলি আর লাফালাফি করবে। আর কি?

আমাদের অনেকেরই চিন্তা নেই যে, একজন অপরজনকে মতবিরোধের কারণে কাফির বলতে পারে না। কাফির তো ঐ ব্যক্তি যে দ্বীনের কোন বিষয়কে অস্বীকার করবে। হালাল মনে করে যে নামায বর্জন করবে সে কাফির। এমনিভাবে অন্যান্য ইবাদতের অবস্থাও অনুরূপ। আমরা যদি নামায পড়তে আরম্ভ করি, আমাদের পারস্পরিক মতানৈক্য দূর হবে। আমরা ভাই ভাই হিসাবে বাঁচতে পারবো। আমরা খেয়ালও করি না, আমাদের পরস্পরে লড়াচ্ছে আমাদের নেতারা। যারা ক্ষমতা ও মানসম্মানের ভুখা ও লোভী। সাধারণ মুসলমান পরস্পরে ঝগড়া–বিবাদ করলেই তাদের ইযযত প্রতিষ্ঠিত থাকে, থাকে ক্ষমতা বহাল। তাদের নেতৃত্ব ততক্ষণ পর্যন্ত থাকে, যতক্ষণ পর্যন্ত জনসাধারণের উপর তাদের নিয়ন্ত্রণ থাকে। তারা কখনও নিজেদের ধনদৌলত ইসলাম এবং মুসলমানদের কল্যাণে সৎকাজে এবং আখেরাতের

নাজাত ও সফলতার উদ্দেশ্যে—পরকালকে সুসজ্জিত করার জন্যে আল্লাহর সন্তুষ্টির লক্ষ্যে ব্যয় করে না। তারা ভুয়া ইযযত-সম্মানের জন্য মেম্বার-চেয়ারম্যান-এমপি হওয়ার জন্য শাসকবর্গের সন্তুষ্টি লাভের জন্য বেদেরেগ অর্থ ব্যয় করে।

মুসলমানদের লক্ষ্য করা উচিত, যেসব শাসক গরীব দুস্থদের সাহায্য করে, আল্লাহকে ভয় করে, সহায়তা করে বিধবা-ইয়াতীম, লাওয়ারিশ, পঙ্গু, দরিদ্র এবং ছাত্রদের এবং নামায-রোযা আদায় করে নিয়মিত, তারা সত্যিকার অর্থে মুসলমান। তাদের কথা মেনে চলা—আনুগত্য করা আবশ্যক। যারা এরূপ করে না তাদের থেকে দূরে থাকা উচিত।

যাই হোক, মু'আয লড়ছিলেন বীরবিক্রমে। অটলতার সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছিলেন। তার তরবারী যার উপর আঘাত হেনেছে তাকে মৃত্যুর কাছে পৌঁছে দিয়েছে। কাফিররা তার উপর আক্রমণ করলে তিনি তা প্রতিহত করছেন।

ঘটনাক্রমে একবার উমর ফারুক, আবু বকর সিদ্দীক, আলী (রাঃ) তিনজন একত্রিত হলেন। তিনজনই বীরবিক্রমে আক্রমণ করে সামনের কাফিরদেরকে পিছনে হটিয়ে দিলেন। এরা তিনজন ইসলামের ব্যাঘ্র। বীরত্বের সাথে তারা যুদ্ধ করছেন। কাফিররা তাদের হত্যা করার জন্য অগ্রসর হচ্ছিলো। কিংবা তাদের হামলা দেখে সটকে পড়তে চাইছিলো। কিন্তু ফিকির ছিলো যে কোনক্রমেই হোক এদের হত্যা করবে। সাহস হচ্ছিলো না। এরা তিনজন যতই সামনে অগ্রসর হচ্ছিলেন, কাফিররা ততই পিছনে হটছিলো।

অপরদিকে হযরত হামযা ও বিলাল (রাঃ) একত্রিত হয়েছিলেন। তারা দুজনও বীরত্বের সাথে আক্রমণ করে দুশমনদের পিছু হটাতে ব্যস্ত। কাফিররা এসব বিস্ময়ের দৃষ্টিতে দেখছিলো। তারা আশ্চর্যবোধ করছিলো যে, একজন গোলাম আরেকজন হাশেমী নেতা একই সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে যুদ্ধ করছে। হযরত সা'দ, যায়েদ সৈন্যদের মধ্যখানে বীরবিক্রমে ঝাঁপিয়ে পড়ছেন। কাফিররা পিছনে হটছে, মুসলমানরা সামনে অগ্রসর হচ্ছেন। পরস্পরের সাথে মুসলমানদের মিলন ঘটছে।

হারিস ইবন সুরাকা ছিলো মুশরিকদের মধ্যে খ্যাতিমান বাহাদুর নেতা। সে আলী (রাঃ)এর দিকে তাকাচ্ছিলো। আলী (রাঃ) ছিলেন কিছুটা বেটে আকৃতির ও কমবয়স্ক। তার লালসা হলো আলীকে হত্যা করবে। ফলে তার উপর প্রচণ্ড আক্রমণ করে বললো ঃ আমি ইবন সুরাকা—সুরাকার সন্তান। আমার বীরত্বের উপাখ্যান স্বজাতির মধ্যে সুপ্রসিদ্ধ। হযরত আলী (রাঃ) তার তরবারীর আক্রমণ ঢাল দিয়ে প্রতিহত করলেন। তার ঢালে কাফিরের

তলোয়ার ফেঁসে গেলো। হযরত আলী (রাঃ) তার উপর আক্রমণ করলেন। কাফিরের লৌহবর্মের উপর তলোয়ার আঘাত হেনে ওটাকে দু'টুকরো করে তার দেহে আঘাত হানলো। হযরত আলী (রাঃ) পিছন দিকে লক্ষ্য করলেন একটি তরবারী চমকে উঠেছে। দেখেই তিনি মাথা নিচু করলেন। হযরত আলীর তলোয়ার হারিসের মস্তক কেটে টুকরো করলো। তৎক্ষণাৎ রজয (বীরত্বগাঁথা কাব্য)–এর আওয়াজ এলো ঃ আমি আবদুল মুত্তালিবের সন্তান! রক্তপিপাসু ব্যাঘ্রের মতো আক্রমণ করি। তরবারী আমার বেপানাহ–আশ্রয়হীন। হযরত আলী (রাঃ) মোড় ঘুরিয়ে দেখলেন, আক্রমণকারী তার চাচা হযরত হামযা (রাঃ) রজয গাইছেন।

আরবের নিয়ম ছিলো, যুদ্ধের সময় তারা এমন কিছু শ্লোক–কাব্য গাইতো যাতে খান্দানী ফখর কিংবা ব্যক্তিগত বীরত্ব প্রকাশ পায়। সেগুলোকে বলা হয় রজয।

হারিস নিহত হলো। তার মৃত্যুতে কাফিরদের মনে জোশ এলো। প্রচণ্ড আক্রমণ চালালো তারা। জোরদারভাবে তলোয়ার উঠছে আর নামছে। বীরবাহাদুররা মল্লযুদ্ধে লিপ্ত। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এমতাবস্থায় দু'আ করলেন— আয় আল্লাহ! মুসলমানদের সাহায্য করো। এ মুহূর্তে তিনি এক মুষ্টি বালু ও কংকর উঠিয়ে দু'আ পড়ে নিক্ষেপ করলেন। দুআটি ছিলো শাহাতিল উজূহ। অর্থাৎ, তাদের চেহারা বিগড়ে যাক। বাতাস এই বালি ও কংকর গোটা যুদ্ধের ময়দানে ছড়িয়ে দিলো। যেসব কাফির বীরবিক্রমে লড়ছিলো তাদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়লো বিক্ষিপ্ততা। কুরাইশের পায়ের নিচ থেকে মাটি সরে গেলো। পরাস্ত হয়ে তারা হলো পলায়নপর। এই মাটি ও কংকর ছোড়ার বিষয়টি কুরআনে কারীমের মধ্যে আল্লাহর অনুগ্রহ হিসেবে উল্লেখিত হয়েছে। ইরশাদ করা হয়েছে ঃ ওয়ামা রামাইতা ইয রামাইতা ওয়ালাকিন্নাল্লাহা রামা। অর্থাৎ, বালি ও কংকর আপনি ছুড়েননি যখন তা নিক্ষেপ করেছিলেন বরং আল্লাহই তা ছুড়েছিলেন।

হক ও বাতিলের এই প্রথম রণক্ষেত্রে মক্কার কাফিরদের বিরাট পরাজয় ঘটলো। আল্লাহ তা'আলা মুসলমানদেরকে দান করলেন মহাবিজয়। ইউরোপ আজকেও মুসলমানদের এই সাফল্য লাভের ব্যাপারে বিস্ময় প্রকাশ করছে। তাদের বোধগম্য হচ্ছে না—প্রায় সহস্র সুসজ্জিত সশস্ত্র সৈন্যের মুকাবিলায় এক–তৃতীয়াংশ মুসলমান কিভাবে নিরীহ অসহায় অবস্থায় বিজয় লাভ করলো। জড়বাদী ইউরোপের মাথায় ঢুকছে না যে, আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এই যুদ্ধে সরাসরি সাহায্য করেছেন। তিনিই তাদের দান করেছেন মহাসাফল্য। সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী তিনি।

কাফিরদের পরাজয় ঘটলো। অবশিষ্ট কাফিরদের মুসলমানরা গ্রেফতার করলেন। প্রিয়নবী (সাঃ) সেজদায় পতিত হলেন। দরবারে ইলাহীতে তিনি আরয করলেন, আয় রাব্বুল ইযযত! তোমার শুকরিয়া আদায় করা সম্ভব নয়। আজকে তুমি ইসলামের আওয়াজ বুলন্দ করেছো, রক্ষা করেছো মুসলমানদের মান-ইযযত। গোটা মুসলিম জাতি তোমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছে।

প্রিয়নবী (সাঃ) যখন সেজদা থেকে মাথা উত্তোলন করলেন, তখন তার আলোকজ্জ্বল চেহারা ছিলো ধুলা মলিন। লড়াইয়ের ময়দানের দিকে তিনি তাকালেন। দেখলেন, সাহাবায়ে কেরাম কয়েদীদের নিয়ে আসছেন। প্রিয়নবী (সাঃ)এর পাশে দাঁড়ানো ছিলেন তখন আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ (রাঃ)। তিনি তাকে বললেন ঃ তুমি একটু রণাঙ্গনে ঘুরে এসো। দেখ আবু জেহেলের কি পরিণতি হলো।

আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ (রাঃ) রণাঙ্গনের দিকে চললেন। কাফিরদের শবদেহগুলো প্রত্যক্ষ করলেন। অনেক চেষ্টা-প্রচেষ্টার পর দেখলেন আবু জেহেলের লাশ অর্ধমৃত অবস্থায় খাক ও খুনে পতিত। আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ (রাঃ) বললেন ঃ ওরে আল্লাহর দুশমন! তুমি প্রত্যক্ষ করেছো আল্লাহ তা'আলা ইসলামকে বিজয়ী করেছেন এবং কুফরকে করেছেন পরাস্ত। আবু জেহেলের ঠোঁট শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে। ভয়ংকর তার চেহারা। চোখ খুলে সে বললো, কুরাইশ কি পরাজিত হয়েছে?

আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ (রাঃ) ঃ হাঁ। আমি এসেছি তোমাকে জাহান্নামে পাঠাবার জন্য।

আবু জেহেল ঃ দেখ, আমার মাথাটি স্কন্ধের কিছু অংশসহ কেটে নিবে। যাতে বুঝা যায় এটি সর্বাধিনায়কের মস্তক।

আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ (রাঃ) আবু জেহেলের মস্তক কেটে রাসূলে আকরাম (সাঃ)-এর দরবারে হাযির করলেন। সমস্ত সাহাবায়ে কেরাম এই মুণ্ডু দেখে চরম আনন্দিত হলেন।

প্রিয়নবী (সাঃ) আবু জেহেলের মস্তক লক্ষ্য করে বললেন ঃ ওরে হতভাগা বাতিলপুরস্ত! আফসোস! না তুই শান্তিতে থেকেছিস, না মুসলমানদেরকে শান্তি মতো থাকতে দিয়েছিস। দম্ভ অহংকারের আস্ত একটি কাঠপুতুল তুই। আজ আল্লাহ তা'আলা তোর দম্ভ ও অহংকারের চির অবসান ঘটিয়েছেন।

৪৮
রাহমাতুল্লিল আলামীন

সত্য ও মিথ্যা, হক ও বাতিলের এই প্রথম রণাঙ্গনে ৭০ জন পৌত্তলিক নিহত হলো। তারা ছিলো মক্কার বড় বড় সর্দার, সম্মানিত নেতা। যেমন ঃ উতবা, জামআ, আস, উমাইয়া, আবুল বাখতারী, শায়বা, ওয়ালীদ, মুনাব্বিহ ইবনুল হাজ, হারিস, আবু জেহেল, নওফাল প্রমুখ প্রখ্যাত মুশরিক। এরা সবাই নিহত হলো। মুসলমানদের মধ্যে শাহাদাত লাভ করলেন ১৪ জন। ৬জন মুহাজির, ৮ জন আনসার। এসব মুসলমানকে হারিয়ে সাহাবায়ে কেরাম দুঃখিত হলেন। প্রিয়নবী (সাঃ) সাহাবায়ে কেরামের লাশ একত্রিত করে তাদের জানাযার নামায পড়লেন এবং কবর খোদাই করে পূর্ব পরিহিত লেবাসেই শহীদদের দাফন করলেন।

কাফিরদের লাশগুলো স্তূপিকৃত করলেন। প্রচুর মরদেহ। ওগুলোকে নিক্ষেপ করলেন একটি পতিত কূপে। অতঃপর উপরে মাটি ফেলে দিলেন। আরবের কূয়া অনেক গভীর হয়ে থাকে। একটি কূপেই সবগুলো লাশের সংকুলান হলো। উমাইয়ার লাশ বিকৃত হয়ে গিয়েছিলো। তার মরদেহ একটি গর্তের মধ্যে মাটিচাপা দেয়া হয়েছিলো। প্রায় ৭০ জন কাফির গ্রেফতার হলো। তাদের হাযির করা হলো হাত বেঁধে। তন্মধ্যে ছিলেন প্রিয়নবী (সাঃ)–এর চাচা আব্বাস, আব্বাসের ভাই আকীল, প্রিয়নবী (সাঃ)–এর জামাতা আস। আসের সঙ্গে নবী দুলালী যয়নাব (রাঃ)–এর বিবাহ সম্পন্ন হয়েছিলো অমুসলিম অবস্থায়।

ইতোমধ্যেই মুসলমানরা মালে গনিমত জমা করেছিলেন। মক্কার মুশরিকরা অনেক আসবাবপত্র ও রসদ নিয়ে এসেছিলো। পরাজয় বরণ করে যখন তারা পলায়ন করছিলো তখন সাথে করে কিছু নিয়ে যেতে পারেনি। মক্কা থেকে যা কিছু নিয়ে এসেছিলো ওগুলো সবই হস্তগত হলো মুসলমানদের। প্রিয়নবী (সাঃ) এই কূপের নিকটে দাঁড়িয়ে কাফিরদের লাশগুলোকে সম্বোধন করে বললেন, হে আবু জেহেল! উমাইয়া! ওয়ালীদ! হে অমুক! হে অমুক! অনেকগুলো কাফিরের নাম উল্লেখ করে বললেন, আল্লাহ তা'আলা আমাকে বিজয়ের যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তা পরিপূর্ণ করেছেন। আর তোমাদের পরাজিত করার যে ওয়াদা দিয়েছেন তাও তিনি পূর্ণ করেছেন। কোথায় গেলো তোমাদের শান–শওকত, মানমর্যাদা। কোথায় গেলো তোমাদের বিশাল বাহিনী, তোমাদের বীর বাহাদুর যুদ্ধবাজ লোকজন? তোমাদের বাতিল উপাস্যগুলো তোমাদের কোনই সহযোগিতায় আসেনি।

হযরত উমর (রাঃ) ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! মৃতরাও কি শুনতে পায়?

প্রিয়নবী (সাঃ) ঃ হাঁ। আমি তাদের কি সম্বোধন করেছি সে সম্পর্কে তাদের অবহিত করা হয়েছে।

প্রিয়নবী (সাঃ) সেখানেই অবস্থান করলেন। রাত যাপন করলেন বদরেই। প্রত্যুষে সেখান থেকে রওয়ানা করলেন মদীনা মুনাওয়ারা অভিমুখে। মদীনায় পৌঁছার পূর্বেই সাহাবায়ে কেরামের বিজয়ের সংবাদ পৌঁছে গেলো। বিরাট মনোযন্ত্রণা হলো পৌত্তলিক এবং ইয়াহুদীদের। তারা মুসলমানদের পরাজয়ের খবর শোনার অপেক্ষা করছিলো। আরবদের সামরিক নীতি ছিলো যেসব যুদ্ধবন্দী গ্রেফতার হয়ে আসতো তাদের সবাইকে হত্যা করে দেয়া হতো। সেই হিসেবে মুসলমান এবং যুদ্ধবন্দী মুশরিকদেরও ধারণা ছিলো তাদের হত্যা করে দেয়া হবে। কিন্তু রাসূলে আকরাম (সাঃ) তা করেননি। এতে তারা বিস্মিত হলো। মুসলিম মুজাহিদরা 'সাফরা' নামক স্থানে পৌঁছে অবস্থান করলেন। নযর ইবন হারিস বনী আবদুল্লাহ কবীলার একটি ধূর্ত প্রকৃতির লোক ছিলো। লোকটি ছিলো ইসলাম ও মুসলমানদের নিকৃষ্টতম দুশমন। সে প্রিয়নবী (সাঃ)কে গালাগালি করতো। যুদ্ধবন্দী হওয়ার কারণে তার মাতলামী আরও বৃদ্ধি পেলো। প্রকাশ্যে সে রাসূলে আকরাম (সাঃ)এর শানে গোস্তাখীমূলক বকাবকি শুরু করলো। রাসূলে আকরাম (সাঃ) তাকে হত্যা করালেন। তখন থেকেই মুসলমানদের আইন হয়ে গেলো যারা নবী করীম (সাঃ)–কে গালাগালি করবে তাদের শাস্তি কতল।[১]

আবুল ইউসরা নামক একজন সাহাবী মদীনায় অবস্থান করতেন। তিনি ছিলেন আনসারী। ১০ জন লোকের অধিনায়ক ছিলেন তিনি। আবু আযীয নামক একজন কয়েদী তার হাতে অর্পণ করা হয়েছিলো। আবূ আযীযের ভাই মুসআব সেদিনই মুসলমান হয়েছিলেন এবং বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। মুসআব (রাঃ) আবুল ইউসরার নিকট এসে আবু আযীযের দিকে ইঙ্গিত করে বললেন ঃ লক্ষ্য রাখবেন, এই লোক মক্কার বিশিষ্ট সম্মানিত ব্যক্তি এবং অত্যন্ত ধূর্ত। তার প্রতি ভালো করে লক্ষ্য রাখবেন যেন পালাতে না পারে।

আবু আযীয বললো ঃ ভাই! আমার তো ধারণা ছিলো, তুমি আমার সহোদর, তুমি আমার জন্য সুপারিশ করবে। অথচ তুমি পাল্টা অভিযোগ করলে।

টীকা–১. কুরআন, হাদীসে ও ইসলামী আইনের আলোকে মুরতাদদের শাস্তিও হত্যা। বিরোধীরা হয়ত অজ্ঞ না হয় ইসলাম বিদ্বেষী প্রভুদের আজ্ঞাবহ।—অনুবাদক।

মুস'আব ঃ তুমি আমার ভাই থেকেছো কোথায়? আমি ইসলাম গ্রহণ করেছি। আমার সাথে তোমার সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। তুমি আমার ভাই হলে ইসলাম গ্রহণ করতে। আমার ভাই এখন থেকে তারা যারা ইসলাম গ্রহণ করেছেন। আবু আযীয বিষন্নমনে মাথা নিচু করলো।

বাহিনী যখন 'ইরাকুয জাবইয়া' নামক স্থানে পৌঁছলো তখন ওকবা ইবন আবী মুআইত নামক একজন মুশরিক প্রিয়নবী (সাঃ)এর শানে বেয়াদবী করলো। এইজন্য তাকে সেখানে কতল করা হয়।

বিভিন্ন মনযিল অতিক্রম করে মুসলিম বাহিনী মদীনা মুনাওয়ারায় প্রবেশ করলো। মুসলমানরা মুজাহিদদের উষ্ণ সম্বর্ধনা জানালেন।[১] আল্লাহু আকবার ধ্বনি তুলে আকাশ বাতাস মুখরিত করলেন। তাদের নারায়ে তাকবীরে গোটা মদীনা প্রকম্পিত হয়ে উঠলো। মদীনার দর ও দিওয়ার আনন্দে নাচতে লাগলো। মুসলমানরা শান-শওকতে বিজয়ীর বেশে মদীনায় প্রবেশ করলেন। কেউ অগ্রে কেউ পশ্চাতে। মধ্যখানে ছিলো কয়েদীরা এবং মালে গনিমত।

মদীনার মুশরিক এবং ইয়াহুদীরা যুদ্ধবন্দীদের দেখে ভীষণ উদ্বিগ্ন ও উৎকণ্ঠিত হলো। তারা দেখতে পেলো কয়েদীদের মধ্যে এমন অনেক লোক রয়েছে যাদের ইযযত-সম্মানের খ্যাতি রয়েছে গোটা আরবে। যারা মদীনার

টীকা-১. এদিকে মুসলমানরা বন্দী ও বিজয়লব্ধ সাজ-সরঞ্জাম সঙ্গে নিয়ে মদীনা যাত্রা করলেন। ইতিহাস পাঠে মনে হয় যে, প্রিয়নবী (সাঃ) কয়েক মনযিল পর্যন্ত তাঁদের সঙ্গে ছিলেন। তাঁরা পথে একটু বিশ্রাম করে দুই-এক দিন পরে মদীনায় উপনীত হন। প্রিয়নবী (সাঃ)-এর শুভাগমন সংবাদে মদীনায় নতুন করে উৎসবের সাড়া পড়ে গেলো। বৃদ্ধ ও প্রাচীনেরা তাঁর সংবর্ধনার জন্য মদীনা থেকে বহির্গত হয়ে বদর অভিমুখে অগ্রসর হলেন। যুবকেরা আনন্দ-উৎসবে মত্ত হয়ে মুহুর্মুহু তকবীর ধ্বনি দ্বারা মদীনার গগন-পবন কাঁপিয়ে তুলতে লাগলেন। মদীনার বালিকারা 'দফ' বাজিয়ে সমবেত কণ্ঠে সংবর্ধনাসূচক কাসীদা গাইতে লাগলো। প্রিয়নবী (সাঃ) যথাসময় মদীনায় উপনীত হলে, সে রাজীবচরণ দর্শন করে সাহাবায়ে কেরাম আশ্বস্ত, তৃপ্ত ও কৃতার্থ হলেন। মদীনায় পৌঁছিয়েই প্রিয়নবী (সাঃ) বন্দীদেরকে আহার ও বাসস্থানের সুব্যবস্থা করে দিলেন। আহূত কুটুম্বদের ন্যায় তাদের আদর-যত্ন হতে লাগলো। এ যুদ্ধে যে সকল মালে গণিমত মুসলমানদের হস্তগত হয়েছিলো, পথিমধ্যেই প্রিয়নবী (সাঃ) তা মুসলমানদের সমানভাবে ভাগ করে দিয়েছিলেন। ইসলামের ইতিহাসে সুপরিচিত 'জুলফিকার' নামক তরবারীখানিও এ যুদ্ধে মুসলমানদের হস্তগত হয় এবং প্রিয়নবী (সাঃ) তা নিজের জন্য রেখে দেন।—অনুবাদক।

সম্মানিত লোক ছিলো আল্লাহ তা'আলা তাদের দম্ভ ও অহংকার চুরমার করে দিলেন। কয়েদীদের সবার হাত ছিলো খেজুরের রশি দ্বারা বাঁধা। সমস্ত মুশরিকদের উপর মুসলমানদের প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হলো। আবদুল্লাহ ইবন উবাই নিশ্চিত হলো এবার আর তার রাজত্বের কোন আশা–ভরসা নেই। তার এই আকাংখা ধুলায় লুণ্ঠিত হলো। সে ছিলো ধূর্ত প্রকৃতির লোক। তাই ইসলামের ক্ষতি করার জন্য সে একটি ফন্দি আঁটলো। নিজে বাহ্যতঃ মুসলমান হয়ে গেলো। যাতে মুসলমানদের মধ্যে অনুপ্রবেশ করে তাদের ধ্বংস করার চেষ্টা করতে পারে।

প্রিয়নবী (সাঃ) কয়েদীদেরকে মুসলমানদের মধ্যে ভাগ বাটোয়ারা করে দিয়ে নির্দেশ দিলেন—ওদের কোনপ্রকার কষ্ট দিবে না। এরা যুদ্ধবন্দী। অথচ এরাই মুসলমানদের উপরে জুলুমের হিংস্র থাবা বিস্তার করেছিলো। এত জুলুম–নির্যাতন করেছিলো তাদের উপর যারফলে সাহাবায়ে কেরাম হিজরত করতে বাধ্য হলেন। মদীনায় এসে আক্রমণ চালিয়েছিলো মুসলমানদের সমূলে উৎখাত করার জন্য। উচিত ছিলো মুসলমানদের তাদের কাছ থেকে প্রতিশোধ নেয়া। তাদের উপর কঠোরতা আরোপ করা, তাদের হত্যা করা কিন্তু ইসলাম আরবদের স্বভাবের পরিবর্তন সাধন করলো। জেহেলী যুগের সমস্ত কুপ্রথাই দূরীভূত করে দিলো তাদের অন্তর থেকে। ব্যক্তিগত ফাসাদ দূরীভূত হলো। এবার শত্রুতা আর মিত্রতা রইলো একমাত্র আল্লাহর উদ্দেশ্যে। মুসলমানরা কয়েদীদেরকে অত্যন্ত আরামে রাখলেন। তাদের সেবা করলেন নিজেরা খেজুর খেলেন অথচ তাদের খাওয়ালেন উন্নতমানের খানা।

আবু আযীযের বিবরণ ঃ তার রক্ষক খেজুর খেয়ে দিন গুজরান করতেন অথচ তাকে খাওয়াতেন রুটি। কয়েদী কাফিরদের প্রতি মুসলমানদের এই প্রাধান্যমূলক আচরণ দেখে তারা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়লো।[১]

টীকা–১. এই যুদ্ধে কুরাইশ পক্ষের ৭০ জন সৈন্য মুসলমানদের হাতে বন্দী হয়। ইতিহাসে আহত ও নিহত কুরাইশদের নাম ও বংশ পরিচয় বিস্তারিতরূপে বর্ণিত হয়েছে। তখনকার প্রচলিত সামরিক রীতিনীতি ও দেশাচার অনুসারে মুসলমানগণ এই বন্দীদেরকে হত্যা করে ফেলতে অথবা বংশ–পরম্পরাক্রমে দাসত্ব–শৃংখলে আবদ্ধ করে রাখতে পারতেন। এদের পূর্বাপর অনুষ্ঠিত নৃশংস অত্যাচার এবং ভবিষ্যতের আশংকা স্মরণ করলে সতত মনে হয় যে, এ মহাপাতকের কেন্দ্রগুলোকে ধ্বংস করে ফেলাই উচিত ছিলো। কিন্তু দয়ার সাগর মুহাম্মাদ মুস্তফা (সাঃ) আদেশ করলেন—

"বন্দীদের সাথে যথাসাধ্য সদ্ব্যবহার করবে।"

আবু আযীয নামক জনৈক বন্দী নিজ মুখে বলেছে ঃ "মুহাম্মাদের আদেশক্রমে

এর কিছুদিন পর রাসূলে আকরাম (সাঃ) সমস্ত সাহাবায়ে কেরামকে একত্রিত করে বললেন ঃ হে আমার সাহাবী সম্প্রদায়! যুদ্ধবন্দীদের সম্পর্কে তোমরা আমাকে পরামর্শ দাও।

আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) ঃ আরবদের যুদ্ধ আইন হচ্ছে কয়েদীদের হত্যা করা। কিন্তু ইসলাম দয়া ও অনুগ্রহ শিক্ষা দেয়। আমাদের উচিত কয়েদীদের প্রতি অনুগ্রহ করে রহম এবং মানবিক সহানুভূতির নজির সৃষ্টি করা। তাদের মুক্তপণ আদায় করে ছেড়ে দেয়া হোক।

উমর ফারুক ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! এরা বদবখত। তাদের অন্তরে হিংস্রতা ছাড়া দয়ামায়া ও অনুগ্রহের নামনিশানাও নেই। এরা মুসলমানদের অনেক কষ্ট দিয়েছে। অব্যাহত তকলীফ দিয়েছে। তাদের প্রতি রহম করা হিংস্র বাঘের উপর অনুগ্রহের নামান্তর। আমার পরামর্শ তাদের তৎক্ষণাৎ হত্যা করে দেয়া হোক। আমরা আমাদের হাতেই তাদের কতল করবো।

মুসলমানগণ দু'বেলা আমাদের জন্য রুটি তৈরী করে দিতো, আর নিজেরা খেজুর খেয়ে ক্ষুধা নিবৃত্ত করতো। আহারের কোন উত্তম জিনিস হস্তগত হলে নিজেরা না খেয়ে তা আমাদেরকে খাইয়ে যেতো।"

তাবারীর রেওয়ায়াতে বলা হয়েছে ঃ হযরত মুসআব বিন উমায়র (রাঃ)–এর ভাই আবূ আযীযও ঐ বন্দীদের মধ্যে ছিলো। তার বর্ণনা এই যে, আমাকে এক আনসারীর নিকট সোপর্দ করা হয়। যখন আহারে বসতেন, তখন তিনি আমার সামনে রুটি রেখে দিতেন এবং নিজে শুধুমাত্র খেজুরের উপর নির্ভর করতেন।

স্যার উইলিয়াম মূরের ন্যায় খ্রীষ্টান লেখকও স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন যে—

In persuance of Mohammad's command .... the citizens, and such of the Refugees as had houses of their own, received the prisoners with kindness and consideration. 'Blessings of the men of Medina' said on the these in later days : 'they made us ride, while they themselves walked afoot ; they gave us wheaten bread to eat when there was little of it, contenting themselves with dates.' (১৯২৩ সালের সংস্করণ, ২৩৩ পৃষ্ঠা)

অর্থাৎ, মুহাম্মাদের আদেশক্রমে মদীনাবাসীগণ এবং সমর্থ মুহাজিরগণ বন্দীদের সাথে বিশেষ সদ্ব্যবহার করেছিলেন। একজন বন্দী পরে নিজেই বলেছে—'খোদা মদীনাবাসীদের মঙ্গল করুন, তারা আমাদেরকে উটে ও ঘোড়ায় সওয়ার করে দিতেন, আর নিজেরা হেঁটে যেতেন। তারা আমাদেরকে ময়দার রুটি তৈরী করে খাওয়াতেন, আর নিজেরা খেজুর খেয়ে কাটিয়ে দিতেন।'—ইবনে নূর।

যুদ্ধবন্দীরাও একদিকে উপস্থিত। তারা সব কথা শুনছে। ভয়ে তারা কম্পমান। তারা বুঝতে পারছে এখনই তাদের হত্যার দণ্ড দেয়া হবে।

আবু বকর (রাঃ) ঃ তাদের শাস্তিতো কতলই। কিন্তু যদি আমরা তাদের হত্যা করে ফেলি তাহলে জগদ্বাসী বলবে, আমাদের মধ্যে এবং কাফিরদের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। তার চেয়ে মুক্তিপণ নিয়ে এদের ছেড়ে দিলে উভয়ের জন্যই ভালো হবে।

উমর ফারুক ঃ এই হিংস্রগুলোকে ছেড়ে দিলে তাদের শত্রুতা আরও বেগবান হবে। তাদের হত্যা করলে আমাদের প্রভাব দুশমনদের উপর বিস্তার লাভ করবে।

আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) ঃ আমাদের উচিত দয়া ও মেহেরবানীর উদাহরণ প্রতিষ্ঠা করা। তাদের মুক্ত করে দিলে সব শয়তানী খতম হয়ে যাবে। বদরের যুদ্ধে তাদের যে উচিত শিক্ষা হয়েছে তাতে শত্রুতার ধৃষ্টতা আর হবে না। আর কতল করে দিলে শত্রুতার আগুন আরো তেজদীপ্ত হবে। তাদের আপনজনরা প্রতিশোধ নেয়ার চেষ্টা করবে।

উমর ফারুক ঃ আমাদের এসব কথা চিন্তা করার দরকার নেই যে, তাদের আপনজনেরা আমাদের বিরুদ্ধে শত্রুতা করবে, বদলা নেবে। আমার রায় হচ্ছে ওগুলোকে হত্যা করে দেয়া হোক।

প্রিয়নবী (সাঃ) নিরবে বসে দুজনের আলোচনা শুনছিলেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ আরো কোন মশওয়ারা আছে?

কেউ কেউ তাদের হত্যা করার, কেউ কেউ মুক্তপণ নিয়ে ছেড়ে দেয়ার পরামর্শ দিলেন।

রাসূলে আকরাম (সাঃ) ইরশাদ করলেন ঃ আমার সিদ্ধান্ত হলো তাদের কাছ থেকে মুক্তিপণ নিয়ে আযাদ করে দেয়া।

এতদশ্রবণে যুদ্ধবন্দীরা আনন্দে আটখানা হয়ে উঠলো। তারা একজন দূত মক্কা থেকে মুক্তিপণ আনার জন্য প্রেরণ করলো।

৪৯

হায় মাতম ও রোনাজারি

আবু সুফিয়ানের কাফেলা সহি-সালামতে মক্কা ফিরে এসেছে। এই কাফেলায় যাদের বাণিজ্যিক সম্পদ ছিলো নিরাপদে ফিরে আসার কারণে তারা ভীষণ আনন্দিত হলো। এখন তাদের সবার দৃষ্টি কুরাইশ বাহিনীর উপর যারা মুসলমানদের উপর আক্রমণ করতে গিয়েছিলো। তাদের দৃঢ় বিশ্বাস

ছিলো এই বাহিনী বিজয় লাভ করে প্রত্যাবর্তন করবে। অবশ্য কখনও কখনও কেউ কেউ আতিকার স্বপ্নের কথাও আলোচনা করতো। কেউ কেউ এই বলে হাসাহাসি করতো যে, আতিকাও গায়েব জানে বলে দাবী করছে। বিস্ময়ের কিছু নেই, কিছুদিন পর হয়তো সেও নবুওয়তের দাবী করে বসবে।

মক্কার একটি প্রসিদ্ধ স্থানের নাম হলো 'যীতুয়া।' পুথি ও উপন্যাস পাঠে বিখ্যাত কিছুসংখ্যক যুবক সেখানে রাতভরে কিসসা–কাহিনী, উপাখ্যান–উপকথা ইত্যাদি শোনাতো। গাইতো বিভিন্ন প্রকার কবিতা ও শ্লোক। অনেক শ্রোতার সমাগম হতো সেখানে। বিশেষতঃ জ্যোৎসনা রাতে সেখানে বিরাট সমাবেশ জমতো।

একদিন রাতের ঘটনা। চাঁদ উদিত হয়েছে। জ্যোৎসনার আলো ছড়িয়ে পড়েছে চারদিকে। 'যীতুয়ায়' কিছুসংখ্যক লোক বসে আছে। একজন শোনাচ্ছে কিসসা–কাহিনী উপাখ্যান। বাকীরা সবাই বসে বসে শুনছে। হঠাৎ করে একটি আওয়াজ এলো যেন কোন ফরিয়াদী ফরিয়াদ করছে। সবাই চৌকান্না হলো। মাথা তুলে সবাই এদিক–ওদিক দেখতে লাগলো। কিন্তু কোন লোক নজরে পড়লো না। তারা মনে করেছে প্রেমে দেওয়ানা অথবা এশক–মহব্বতে পড়ে ভবঘুরে কেউ এরূপ করছে। তাদেরই কোন আওয়াজ আসছে। তৎকালীন যুগে আরব অঞ্চলে বাজে প্রেম–প্রীতির প্রথা ছিলো ব্যাপক। যারফলে কোন যুবক কারো প্রতি আসক্ত না হলে কারো প্রেমিক না হলে তার প্রতি সুনজরে দেখা হতো না। মূলতঃ বর্বর যুগে আরবদের কাজই ছিলো শরাবখোরী, শিকার ও বাজে প্রেম–প্রীতি।

অল্প কিছুক্ষণ পর পুনরায় আওয়াজ এলো। সবাই পিনপতন নিরবতা অবলম্বন করলো। শুনতে লাগলো আওয়াজ তো পরিস্কার শোনা যাচ্ছে। কেউ ব্যথিত কণ্ঠে কবিতা পাঠ করছে। সেই কবিতাগুলোর মর্মার্থ নিম্নরূপ ঃ

"হানীফ তথা মুসলমানরা বদর প্রান্তরে এমন মুসীবত আপতিত করেছে এবং এমন নির্যাতন করেছে, যা শুনে বোধহয় কায়সার ও কিসরায় কম্পন শুরু হবে। মক্কাবাসী শুনে চিৎকার ও ফরিয়াদ করতে আরম্ভ করবে। জমীন দুলতে আরম্ভ করবে। কাঁদবে পাহাড়গুলো। হে শ্রোতামণ্ডলী শোন, বুতাইরা এবং সবীর পাহাড়ের মধ্যবর্তী কবীলাগুলো বিলাপ করছে। মক্কার উপরোক্ত দুটি পাহাড়ও চিৎকার করে কাঁদছে। কুরাইশের মেয়েরাও খালি মাথায় বুক চাপড়াবে। আহ! কুরাইশ! তোমাদের উপর কত বড় বিপদ আপতিত হয়েছে!"

লোকজন বিস্ময়ভরে সেসব কবিতা শুনলো। উদ্বেগের ঘনঘটা তাদের উপর ছেয়ে গেছে। এদিক–সেদিক তালাশ করছে কে কবিতাগুলো পাঠ করছে।

কিন্তু কই কোথাও কারো সন্ধান পাওয়া গেলো না। আওয়াজ বন্ধ হয়ে গেলো। লোকজন ভীত–সন্ত্রস্ত হয়ে সেখান থেকে চলে এলো। সবাই এসে পৌঁছলো 'হিজরে' (একটি স্থানের নাম)। সেখানে বর্ষীয়ানরা বসে মাদকদ্রব্য পান করতো, গল্প–গুজব করতো। যুবকরা সেখানে যেয়ে শ্রুত কবিতাগুলো শুনালো। তারা চিন্তিত হলো, উৎকণ্ঠিত হলো। যুবকরা জিজ্ঞেস করলো ঃ 'হানীফ' কারা?

এক বৃদ্ধ জবাব দিলো ঃ মুহাম্মাদ এবং তার সাথীসঙ্গীদের 'হানীফ' বলা হয়।

অতঃপর লোকজন বিক্ষিপ্ত হয়ে চলে গেলো। ভীষণ উদ্বেগ–উৎকণ্ঠায় রাত্রিযাপন করলো মক্কাবাসীরা। প্রত্যুষে তারা যখন উঠলো, তখন সবারই মুখে রাত্রের সেই ঘটনা। এই দিনটি মক্কাবাসী অস্থিরতার ভিতরে কাটালো। রাতটিও উদ্বেগমুক্ত কাটলো না। তৃতীয় দিবস। সূর্য কেবলমাত্র উদিত হয়েছে। ঠিক এমন সময় একটি বিকট আওয়াজ এলো। হে কুরাইশ সম্প্রদায়! হায় মাতম ও রোনাজারি করো বদর প্রান্তরে নিহতদের উপর। এই আওয়াজ শুনে নারী, পুরুষ, আবাল বৃদ্ধ বনিতা সবাই ঘর থেকে বেরিয়ে এলো। জমা হলো সবাই চিৎকারদাতার আশেপাশে। এই ব্যক্তির নাম হলো হাইসামান ইবন হাবিস আল–খুযাঈ। হাইসামান দেখলো তার আশে পাশে প্রচুর লোকজন জমা হয়েছে। তখন সে চিৎকার দিয়ে বললো ঃ

হে মক্কাবাসী! একটি ভীষণ দুঃসংবাদ! বদর প্রান্তরে আমাদের সম্মানিত নেতৃবৃন্দ নিহত হয়েছেন। রবী'আর দুই পুত্র উতবা এবং শায়বা নিহত হয়েছেন। হাজ্জাজের দুই সন্তান উমাইয়া এবং রবীয়াকে হত্যা করা হয়েছে। মাসউদের তিন সন্তান জামআ, আকীল এবং হারীস নিহত হয়েছেন। কতল করা হয়েছে আবুল বাখতারীকে। উমাইয়া, নাওফাল ইবন খুওয়াইলিদের লাশ পড়ে আছে। নিহত হয়েছেন আমাদের সর্বাধিনায়ক আবু জেহেল।

এমনিভাবে হাইসামান আরো কিছুসংখ্যক নেতৃবৃন্দের নাম উল্লেখ করে বললো, ৭০ জন গ্রেফতার হয়েছেন। তন্মধ্যে রয়েছেন আমর, নযর ইবন হারিস, আব্বাস, তার দুই ভ্রাতা আকীল প্রমুখ। এমনিভাবে আরও কিছুসংখ্যক লোকের নামও সে উল্লেখ করলো। এমন সময় সেখানে এসে উপস্থিত হলো আবু সুফিয়ান, সাফওয়ান ইবন উমাইয়া। আবু সুফিয়ান হাইসামানকে জিজ্ঞেস করলো ঃ এসব ঘটনা তুমি কিরূপে জানতে পারলে?

হাইসামান ঃ আমার চোখের সামনে এসব ঘটনা ঘটেছে।

এতদশ্রবণে পুরুষদের চেহারা ফ্যাকাশে হয়ে গেলো। আর হায় মাতম ও রোনাজারি করতে লাগলো মহিলারা। আবু সুফিয়ান বুলন্দ আওয়াজে বললো

ঃ হে কুরাইশ সম্প্রদায়! আবু জেহেলের কাছে আমি পয়গাম পাঠিয়েছিলাম। আমরা ভালোয় ভালোয় পৌঁছে গেছি, তোমরা বাহিনী নিয়ে ফিরে চলে এসো। তারা আমার কথা শোনেনি। মুসলমানদের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়েছে। আবু জেহেল এক বদবখত, কুফা। সে নিজেও বিপদে পড়েছে, গোটা জাতিকে করেছে মহাবিপদগ্রস্ত। বড় বড় বীর বাহাদুর এবং সাহসী নেতাদের সেই হত্যা করালো। অবশেষে নিজেও মারা পড়লো। কুরাইশের এমন কোন পরিবার আছে কি, যাদের উপর এই বিপদের প্রভাব পড়েনি? আতিকার স্বপ্ন সত্যে পরিণত হলো। উদ্বেগ–উৎকণ্ঠা আর বিপদের পাহাড় আমাদের উপর পতিত হলো। গোটা মক্কায় সে পাহাড়ের টুকরো ছড়িয়ে পড়লো। শিক বোধহয় সত্য বলেছেন ঃ "মুসলমানরা তোমাদের শত্রু নয়, তাদের উপর আক্রমণ করতে যেয়ো না। অন্যথায় মহাখুনাখুনির সূচনা হবে। নিহত হবে কুরাইশের সম্মানিত নেতৃবৃন্দ।" তার ভবিষ্যদ্বাণীগুলো কিরূপ যথার্থ প্রমাণিত হলো।

শুনে রেখো! তোমরা বদরের প্রান্তরে নিহত নেতৃবৃন্দের জন্য হায় মাতম ও ক্রন্দন করবে না। কোন মহিলা যেন বিলাপ না করে। মাথা বিবস্ত্র না করে। বুক না চাপড়ায়। কোন কবি যেন শোকগাঁথা না পড়ে। যারা হায় মাতম করে তাদের মধ্যে প্রাণস্পন্দন অবশিষ্ট থাকে না। তাছাড়া তোমরা রোনাজারি করলে মুসলমানরা শুনে খুশী হবে। প্রতিজ্ঞা করে নাও যতক্ষণ পর্যন্ত এর প্রতিশোধ না নিতে পারবে ততক্ষণ পর্যন্ত রোনাজারি করবে না। করবে না হায় মাতম। লিপ্ত হবে না কোন খেলাধুলা তথা চিত্তবিনোদনে। পেটভরে খানা খাবে না। মাথায় তৈল ব্যবহার করবে না। কেউ নারী সম্ভোগ করবে না।[১]

টীকা–১. আবূ সুফিয়ানের ন্যায় বিদ্বেষ ও মনস্তাপ অন্যদেরও হয়েছিলো। আসলে ইহুদী, পৌত্তলিক ও কপটগণ মনে করেছিলো, কুরাইশদের এ আক্রমণ সহ্য করা মুহাম্মাদের পক্ষে কোন মতেই সম্ভবপর হবে না। তার পর তারা যখন দেখলো যে, জায়েদ প্রিয়নবী (সাঃ)এর বিশিষ্ট উটটি নিয়ে একাকী মদীনায় ফিরে আসছেন, তখন তাদের মধ্যে কেউ কেউ প্রকাশ্যভাবে বলে ফেললো—এবার মুহাম্মাদের দফারফা হয়েছে, ঐ দেখ, তার উট ফিরে আসছে। কিন্তু জায়েদ নগরদ্বারে উপস্থিত হয়ে উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করলেন—"মুসলিম সমাজ! আনন্দিত হও। সত্যের শত্রুগণকে আল্লাহ সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত করেছেন। কুরাইশ দলপতিদের মধ্যে অধিকাংশই নিহত হয়েছে। তাদের বহু সৈন্য হতাহত হয়েছে। তাদের বহু রণসম্ভার ও সাজসরঞ্জাম আমাদের হস্তগত হয়েছে। বহুসংখ্যক কুরাইশ বন্দী হয়ে মদীনায় প্রেরিত হচ্ছে।" এই কল্পনাতীত, স্বপ্নাতীত সংবাদ শ্রবণে তারা ক্ষোভে ও ক্রোধে একেবারে

যেহেতু আবু সুফিয়ান একজন নামকরা শীর্ষস্থানীয় নেতা, বড় মাপের নেতা সে একজনই বেঁচে আছে, যার জনপ্রিয়তাও সবার মধ্যে রয়েছে, সেহেতু সবাই তার কথামতো কাজ করার জন্য স্বীকারোক্তি করলো। অতঃপর সবাই চলে গেলো বিক্ষিপ্ত হয়ে। আবু সুফিয়ানের নির্দেশের কারণে হায় মাতম ও ক্রন্দন নিষিদ্ধ হলো। যেসব মহিলার বাপ–ভাই–স্বামী, আত্মীয়–স্বজন মারা গেলো তারা শোক পালন করা এবং রোনাজারি করতে চাইলেও কান্নাকাটি ও বিলাপ করতে পারলো না। এরা সবাই মুখ বন্ধ করে উদ্বিগ্ন অবস্থায় বসে থাকলো।

আসওয়াদের তিন সন্তান জামআ, আকীল এবং হারিস নিহত হলো। এরজন্য সে কাঁদতে পারলো না। পারলো না মন খুলে আহাজারি করতে। কিন্তু ঘরে বসে বসে চুপিসারে এমন কান্না কাঁদলো সে, যারফলে তার দুটি চোখই নষ্ট হয়ে গেলো। একদিন সে এক মহিলার কান্নার আওয়াজ শুনলো। দ্রুত সে একটি গোলামকে ডেকে বললো, একটু দেখে আস। এই মহিলা কেন রোনাজারি করছে। কুরাইশ কি আহাজারির অনুমতি দিয়েছে? গোলাম হাজির হলো এবং ফিরে এসে বললো ঃ সে মহিলার উট হারিয়ে গেছে এইজন্য সে পেরেশানিতে কাঁদছে।

এতদশ্রবণে অনিচ্ছাকৃতভাবে আসওয়াদের মুখ থেকে কতগুলো কবিতা বের হলো। মূলতঃ তৎকালীন যুগে প্রায় প্রতিটি বেদুঈন ছিলো কবি। তার সেসব কাব্যের মর্মার্থ নিম্নরূপ ঃ

"আহ! সে মহিলা তার একটি উট হারিয়ে কাঁদছে এবং এতটাই বেচঈন ও অস্থির হয়ে পড়েছে যে তার ঘুম হারাম হয়ে গেছে। তাকে বলো হে উদাসীন মহিলা! উট হারাবার জন্যে ক্রন্দন করো না। এর চেয়ে উত্তম উষ্ট্রী তুমি পেতে পারো। বদর প্রান্তরের নিহতদের জন্য তুমি চোখের অশ্রু বহাও। যেখানে আমাদের ভাগ্য ত্রুটি করেছে। যে স্থলে আমাদের জাতি তার কলিজার টুকরোগুলোকে উৎসর্গ করেছে। যারা আর কখনও আমাদের কাছে ফিরে আসবে না। যদি তোমাকে আহাজারি করতেই হয় তাহলে আকীল, হারিস এবং জামআর জন্য কাঁদো। এরা তিনজন ছিলো কুরাইশের সিংহ। তাদের

কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে গেলো। কা'ব ইবন আশরাফ ইহুদীদের প্রধান জননায়ক, সে আত্মসংবরণ করতে না পেরে প্রকাশ্যভাবে বলে ফেললো ঃ

"তোদের সর্বনাশ হোক, এ সংবাদ কি সত্য? হায় হায়, এরা আরবের নায়ক ও রাজা। মুহাম্মাদ যদি এদেরকে বিধ্বস্ত করে থাকে, তাহলে এখন তো মরণই শ্রেয়স্কর!" সাহাবায়ে কেরাম এই প্রকার প্রলাপোক্তি ও অন্যায় ব্যবহারের প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করে পরস্পরকে এই আনন্দ সংবাদ দিতে লাগলেন। —অনুবাদক।

প্রাণে জাতির মধ্যে প্রাণচাঞ্চল্য ফিরে আসতো, তাদের শির উঁচু হতো। তাদের জন্যে কাঁদো, খুব আহাজারি করো।"

যদিও মক্কাবাসীর মনে আগুন লেগেছে। রাগ, ক্ষোভ, ক্রোধ ও উদ্বেগে তাদের তনুমনে অগ্নিশিখা জ্বলে উঠেছে কিন্তু কওম এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে, কেউ আহাজারি রোনাজারি করতে পারবে না। সেহেতু নিজের উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা আর পেরেশানিকে অন্তরে লুকিয়ে ঘরে বসে বসে তারা কান্নাকাটি করছে। আর মুসলমানদের গালাগালি করে প্রশমিত করছে মনের জ্বালা।

উমাইর ইবন ওয়াহাব ছিলো কুরাইশের একজন নির্ভীক দুর্ধর্ষ বীর বাহাদুর। সে ছিলো মুসলমানদের চরম শত্রু। রাসূলুল্লাহ (সাঃ)এর সাথে ছিলো তার মারাত্মক শত্রুতা। বদর প্রান্তরে যখন তাদের খ্যাতনামা নেতৃবৃন্দ মারা গেলো তখন তার শত্রুতা আরো বৃদ্ধি পেলো। একদিন সে সফওয়ান ইবন উমাইয়া সহ গৃহের একটি রুমে বসে বদর প্রান্তরে নিহতদের স্মরণে মাতম করছিলো। কান্নাকাটির পর সফওয়ান তাকে বললো, হুবলের শপথ! এবার আর জীবনের কোন মজা নেই।

উমায়ের ঃ তুমি সত্য বলেছো। জিন্দেগী বিষাদ হয়ে পড়েছে।

সফওয়ান ঃ মুহাম্মাদ এবং তার সাঙ্গপাঙ্গরা তাদের প্রতি জুলুম নির্যাতন এবং অত্যাচারের প্রতিশোধ নিয়েছে। আফসোস! এমন কেউ কি নেই যে মুহাম্মাদকে খতম করে আসবে। যাতে এই ফিতনাই চিরতরে অপসারিত হয়?

উমায়ের ঃ এ কর্মটি আমি করতে পারি। তবে একেতো আমি অনেক ঋণী, দ্বিতীয়তঃ আমার পরিবারে লোকজন প্রচুর। আমি দরিদ্র। কেউ যদি আমার ঋণ পরিশোধ করে দেয়, আমার পরিবার পরিজন, সন্তান-সন্ততির ব্যয়ভার বহন করার দায়িত্ব নেয় তাহলে মদীনায় যেয়ে যে কোন প্রকারেই হোক মুহাম্মাদকে আমি হত্যা করবো।

সফওয়ান ঃ এর দায়িত্ব আমি নিলাম। আমি তোমার ঋণও পরিশোধ করবো, তোমার পরিবার পরিজনের ব্যয়ভারও বহন করবো।

উমায়ের ঃ ঠিক আছে। তুমি ঋণ পরিশোধ করে দাও। আমার পরিবারের খরচপত্র বহন করো। এক্ষুণি আমি রওয়ানা দিচ্ছি।

সফওয়ান ঃ চলো। আমি তোমার করজ পরিশোধ করবো। তোমার খরচের টাকা পয়সাও আমি দেবো।

উমায়ের ঃ ঠিক আছে। তবে আর একটি প্রতিশ্রুতি দাও।

সফওয়ান ঃ কি?

উমায়ের ঃ আমি কোথায় যাচ্ছি, কি জন্য যাচ্ছি, এসব বিষয় কারো

সাথে আলোচনা করতে পারবে না, খবরদার।

সফওয়ান ঃ ভুলেও আমি আলোচনা করবো না। তুমি জান, আর আমি জানি।

এই বলে দু'জন রওয়ানা করলো। সফওয়ান তার করজ আদায় করে দিলো। আর উমায়েরের ব্যয়ভারের জন্য কিছু নগদ টাকা পয়সা দিলো। অতঃপর উমায়ের তার তরবারী আমুল তীব্র হলাহলে সিক্ত করলো। পূর্ণ প্রস্তুতি নিয়ে রওয়ানা করলো সে মদীনা মুনাওয়ারা অভিমুখে।

৫০

উচ্ছল সুন্দরী তরুণী

রাফিদা বদরে আসার সময়ই কুরাইশ বাহিনীর খবর শুনেছিলো। তার কানে এ কথাও পৌঁছেছিলো যে, মুজাহিদ বাহিনী বদর প্রান্তরে উপস্থিত হয়েছে। রাফিদা যে জনপদে অবস্থান করছিলো সেটি ছিলো জনপদ থেকে একটু দূরে, বালুর সুউচ্চ টিলার মাঝখানে। এজন্য লোকজন মুসলিম মুজাহিদ বাহিনীকে বদরে যাবার সময় দেখতে পায়নি।

একদিন রাফিদা আসরের নামায থেকে অবসর হলো। এমন সময় নাইল এসে উপস্থিত। সোজা এসে রাফিদার কাছে গেলো। বললো, মুসলমানদের বিজয় সূচিত হয়েছে। সফলতা তাদের পদচুম্বন করেছে। পরাজিত হয়েছে মক্কার কুরাইশ।

এই সংবাদ শুনে মনের আনন্দে রাফিদার চেহারা গোলাপী আকার ধারণ করলো। আঁখিযুগল প্রোজ্জ্বল হয়ে উঠলো। যেন বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। অত্যন্ত সুমিষ্ট ভাষায় সে বললো ঃ আল–হামদুলিল্লাহ। হাজার শুকরিয়া আল্লাহ তা'আলার। মায়াবিনী চেহারা রাফিদার। নাইল তার আনন্দ দেখে কিংকর্তব্যবিমূঢ়। তার গোলাপী রং আরও আকর্ষণীয় হয়ে গেছে। নাইল তাকে বললো ঃ কিরূপ আনন্দিত হলে তুমি?

রাফিদা ঃ সত্য ও মিথ্যার এই প্রথম রণক্ষেত্র। আল্লাহ তা'আলা সত্যকে বিজয় দান করেছেন। সত্যিই এটা বিরল আনন্দঘন মুহূর্ত। আপনিও খুশী হতেন যদি হতেন মুমিন।

নাইল ঃ রাফিদা! ক্ষমা করবে। বেতাকাল্লুফ তোমার নাম উচ্চারণ করে ফেললাম।

রাফিদা চিত্তাকর্ষক দৃষ্টিতে নাইলের দিকে তাকাচ্ছিলো। তার আকর্ষণীয়

ওষ্ঠযুগলে মুচকি হাসির ছোয়া লেগে আছে। সে বললো ঃ অসুবিধা নেই বলুন।

নাইল ঃ যখন থেকে তুমি এখানে এসেছো এবং ইসলামের কথাবার্তা শুনাতে আরম্ভ করেছো আল্লাহর একত্মবাদের কথা শুনিয়েছো, আলোচনা করেছো আল্লাহর কালামের কথা, তখন থেকে দেখি আব্বু-আম্মুর পূর্ব বিশ্বাসই পাল্টে গেছে। তাদের মধ্যে দোদুল্যমানতা সুস্পষ্ট। তারা চিন্তা করছেন বাস্তবিকই কি আমরা ভুলের উপর প্রতিষ্ঠিত?

রাফিদা ঃ আমি তো শুধু একটি কথা বলতে চাই, প্রতিমাগুলো যদি উপাস্য হতো তাহলে নির্মাতারা এগুলো তৈরী করতে পারতো না। মানুষ আস্থাপ্রবণ। যার অন্তরে যার প্রতি আস্থা হয় তার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করতে আরম্ভ করে। ক্রমশঃ তার সম্মান ও মাহাত্ম্যের প্রতি এতটাই ভক্ত হয়ে পড়ে যে সে তার উপাসনা করতে আরম্ভ করে। হঠাৎ আওয়াজ এলো—বেটি! তুমি সত্য বলেছো।

রাফিদা এবং নাইল সতর্ক হয়ে দেখলো, যুহরী আসছেন। রাফিদা তাকে দেখে লজ্জা পেলো। নাইল তখন রাফিদার কাছেই। এজন্য সেও ভয় পেয়ে গেলো। কারণ সে রাফিদার কাছে এসে ধর্মীয় কথাবার্তা শুনছিলো। যুহরী এসে রাফিদার কাছে বসলেন। বলতে লাগলেন, বেটি! আমি তোমার কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ। সময় সময় ইসলাম সম্পর্কে তুমি যেসব কথাবার্তা আলোচনা করতে তার ফলে আমার চোখ খুলে গেছে। আমি হয়ে গেছি ইসলামের প্রবক্তা। এদিকে মুসলমানরা কুরাইশের বিরুদ্ধে অভূতপূর্ব বিজয় লাভ করেছে। এতে আমার দৃঢ়বিশ্বাস জন্মেছে যে, ইসলাম সত্য ধর্ম। আল্লাহ তা'আলা এর সাহায্য করছেন। আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি মাসউদ এলে তার সাথে আমি মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর খেদমতে হাজির হয়ে ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করবো। নাইল, সালিমা এবং তার আম্মু যদি মুসলমান হতে চায় তাহলে ইসলাম গ্রহণ করবে। আর এটা পছন্দ না করলে তাদের ধর্মের উপরে তারা থাকবে। এটা ধর্মীয় ব্যাপার, এ ব্যাপারে আমি জোর-জবরদস্তি করবো না।

নাইল ঃ আমি তো আপনার অপেক্ষা করছিলাম। আপনার ইসলাম গ্রহণের সাথে সাথেই আমি মুসলমান হয়ে যাবো।

রাফিদা এই কথা শুনে ভীষণ উৎফুল্ল হলো। খুশীতে তার চেহারা লাল হয়ে উঠলো। চমকাতে লাগলো আঁখিযুগল। হাসিখুশি চেহারা আরো আকর্ষণীয় হয়ে উঠলো। সে বললো, আল্লাহ আপনাদের সত্যপথ প্রদর্শন করুন।

এর কয়েকদিন পরের ঘটনা। দিনের সূচনালগ্ন। সালিমা রাফিদা দুজন

বসে গল্প করছে। দুজনের চেহারায় উচ্ছলতা ছাপিয়ে পড়ছে। সালিমা বললো, আমার ভয় হয় তোমার উপর কারো কোন বদ নজর লেগে যায় কিনা।

রাফিদা ঃ জ্বি। আর আপনার?

সালিমা ঃ আমি কি তোমার মতো?

রাফিদা ঃ আচ্ছা ঠিক আছে। দেখুন, জিজ্ঞেস করবো।

সালিমা ঃ কাকে?

রাফিদা ঃ আপনি নিজেই জানতে পারবেন।

সালিমা ঃ বলো না।

রাফিদা ঃ বলবো।

সালিমা ঃ কখন?

রাফিদা ঃ যখন তিনি আসবেন।

সালিমা ঃ কে তিনি?

ঠিক এই মুহূর্তে মাসউদ বাড়ীর এরিয়ায় প্রবেশ করলো। রাফিদা দরোজামুখী হয়ে বসেছিলো। তার প্রতি তার নজর পড়লো। সালিমা এদিকে পিঠ দিয়ে বসেছিলো। সে দেখতে পেলো না। রাফিদা দুষ্টুমির হাসি হাসলো। কিন্তু সালিমা কিছুই বুঝতে পারলো না। সে বললো, বলো না, সে কে?

রাফিদা ঃ দেখো, এই যে, তিনি আসছেন।

সালিমা ঘুরে দেখলো। মাসউদকে দেখে তার চেহারা জ্বলজ্বল করে উঠলো। গণ্ডদ্বয় লাল হয়ে উঠলো। ভীষণ লজ্জা পেলো সে। রাফিদার দিকে তাকিয়ে সে বললো, দুষ্টু কোথাকার!

রাফিদা হেসে বললো ঃ আগে আসতে দিন তারপর আপনার সামনেই জিজ্ঞেস করবো।

সালিমা ঃ মার খাবে।

এমন সময় মাসউদ চন্দ্ররূপী এই দুই রূপসীর কাছে এসে দাঁড়ালো। রাফিদা অভিবাদন জানালো ভাইয়াকে।

মাসউদ প্রতিউত্তর করে বললো ঃ রাফিদা! তোমার শরীর বর্তমানে কেমন?

রাফিদা ঃ আল্লাহর শোকর, ভালো আছি। বসুন।

মাসউদ রাফিদার কাছে এসে সালিমার দিকে ফিরে বসলো। তাকালো তার সুদর্শন চেহারার দিকে। সালিমা লজ্জায় মাথা নিচু করলো। রাফিদা বললো ঃ আল্লাহ তা'আলা বদরের যুদ্ধে মুমিনদের বিজয় দান করেছেন।

মাসউদ ঃ হাঁ, আল্লাহ তা'আলা বদর প্রান্তরে হক ও বাতিলের ফায়সালা করে দিয়েছেন। সত্য বিজয়ী হয়েছে। মিথ্যা হয়েছে পরাজিত।

রাফিদা ঃ আপনিও যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন?

মাসউদ ঃ হাঁ। এই গর্বের অংশীদারী আমিও। আমাকেও আহলে বদর (বদরে অংশগ্রহণকারী বলা হয়)।

রাফিদা ঃ কিছু হাল-অবস্থা শুনান।

মাসউদ ঃ কি শুনাবো। সবকিছুই বিস্ময়কর!

সালিমা ঃ সংবাদ ইত্যাদি জিজ্ঞেস করতে লাগলে। না মুখ ধুতে দিলে, না নাস্তা করতে।

রাফিদা ঃ হেসে বললো, আল্লাহ, আল্লাহ। এতটুকু খেয়াল! বাস্তবেই মাসউদ ভাইয়ার আসার আনন্দে আমি আত্মহারা। রাফিদার এই কথায় সালিমা পাশ কেটে গেলো। লজ্জা পেলো সে। উঠে পালাতে চাইলো। কিন্তু পালানো উচিত মনে করলো না। অবশ্য 'এতটুকু খেয়াল' এ কথাটি শুনে মাসউদ হাসলো। রাফিদা আলোচনা অব্যাহত রেখে বললো, হাত-মুখ ধুয়ে নিন, সালিমা নাস্তা নিয়ে আসবে।

মাসউদ ঃ সকালে আমি ওজু করেছিলাম। নামায পড়ে নাস্তাও সেরে ফেলেছি।

রাফিদা উচ্ছল দৃষ্টিতে সালিমার দিকে তাকালো। সালিমা! বলুন এবার কি বলবেন?

সালিমা ক্ষীণস্বরে বললো, এবার শুনান।

রাফিদা ঃ হুকুম হয়েছে। এবার হাল খবর শুনান। সালিমা আরও লজ্জা পেলো। মাসউদ বললো ঃ সংক্ষিপ্ত খবর শুনাচ্ছি। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ৩১৩ জন সাহাবী নিয়ে বদরে প্রান্তরে উপস্থিত হয়েছেন। তন্মধ্যে কয়েকজন ছিলেন বালক মুজাহিদ। প্রায় নিরস্ত্র এবং পদাতিক অবস্থায় তারা উপস্থিত হলেন। কাফিরদের সংখ্যা ছিলো প্রায় ১০০০ (মূলতঃ ৯৫০)। সশস্ত্র সুসজ্জিত অবস্থায় মক্কার প্রায় সব শীর্ষস্থানীয় খ্যাতনামা নেতৃবৃন্দের উপস্থিতি হয়েছে। যুদ্ধের পূর্বে প্রিয়নবী (সাঃ) খোশখবরী শুনিয়েছিলেন। যুদ্ধের সূচনা হলো, ভয়াবহ রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ হলো। বড় বড় হিরো বীর-বাহাদুরদের অন্তরও ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে উঠলো। আল্লাহ তা'আলা সাহাবায়ে কেরামকে বিজয় দান করেছেন। কাফিররা পরাজিত হয়েছে। তাদের শীর্ষস্থানীয় নেতৃবৃন্দ নিহত হয়েছে। অবশিষ্টরা হয়েছে বন্দী। আমি মনস্থ করেছি বদর থেকে তোমাদের কাছে আসবো। কিন্তু প্রিয়নবী (সাঃ) অসন্তুষ্ট হবেন—এই খেয়ালে সেখান থেকে আসতে পারিনি। মদীনা গেলাম, সেখান থেকে অনুমতি নিয়ে এসেছি।

রাফিদা ঃ পুনরায় মদীনায় কখন যাবেন ভাইয়া!

মাসউদ ঃ যখন তুমি বলবে। এসেছি তোমাকে নেয়ার জন্যে।

রাফিদা সালিমার দিকে ইশারা করে বললো, আর উনাকে?

মাসউদ ঃ এটা তার মর্জি।

রাফিদা ঃ সালিমা! আপনি যাবেন?

সালিমা লজ্জা পেলো। দুষ্টু মেয়েটিকে কি জবাব দিবে। এমন সময় উম্মে সালিমা এসে উপস্থিত হলেন। মাসউদকে লক্ষ্য করে তিনি বললেন ঃ মাসউদ তুমি এসে গেছো? মাসউদ তাকে সালাম করলো। বললো ঃ জ্বি হাঁ।

উম্মে সালিমা ঃ বেটা! গোসল সেরে নাও।

মাসউদ উঠে চলে গেলো। চলে গেলেন উম্মে সালিমাও। সালিমা রাফিদার দিকে তাকিয়ে বললো ঃ বড় দুষ্টু হয়ে গেছো তুমি রাফিদা। রাফিদা সরল কণ্ঠে বললো ঃ কি দুষ্টুমি করেছি আমি।

সালিমা ঃ মনে রেখো। সুবর্ণ সুযোগ এলে তোমাকে আমি এমন বিরক্ত করবো যে, লজ্জায় মাথা কাটা যাবে।

রাফিদা ঃ আচ্ছা আপু! তুমি কি ভাইয়ার সাথে যাবে?

সালিমা ঃ কি বলবো, তোমার প্রতি আমার এতোটা স্নেহ-মমতা জন্মেছে যে, তুমি যেখানে যাও আমিও সাথে আছি।

রাফিদা উচ্ছলতার সাথে মুচকি হেসে বললো, আমি নিয়ে যাবো, না উনি নিয়ে যাবেন? এতদশ্রবণে সালিমা তার দিকে তেড়ে এলো। রাফিদা হাসতে হাসতে উঠে পালালো।

এর পরদিন মাসউদ যুহরীর সাথে বললেন ঃ আমি এবং রাফিদা আপনার সীমাহীন কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। আপনি আমাদের প্রচুর শান্তিতে রেখেছেন। এবার আমরা মদীনার যাবার জন্য অনুমতি প্রার্থনা করছি।

যুহরী ঃ বেটা! আমাদেরও সবার ইচ্ছে মদীনা যাবার।

এতদশ্রবণে মাসউদ খুব খুশী হলো। বললো ঃ খুব ভালো। তাহলে চলুন।

যুহরী ঃ আজকে থেকে যাও। আগামীকাল যাবো।

পরদিন সবাই উটের উপর আরোহন করে মদীনাভিমুখে রওয়ানা হলেন। মহিলারা চললো হাওদায় করে।

৫১

শুভ পরিণাম

উমায়ের ইবন ওয়াহাব মদীনায় এসে পৌঁছলো। সে হযরত উমর ফারুক (রাঃ)কে ভয় করতো ভীষণ। তাকে দেখলে পালিয়ে পালিয়ে বেড়াতো। লুকিয়ে থাকতো। সে এই ফন্দিতে আছে কোথাও প্রিয়নবী (সাঃ)কে একাকী

পেলে কার্যসিদ্ধি করবে। কিন্তু রাসূলে আকরাম (সাঃ)এর চারপাশে সবসময় থাকতেন সাহাবায়ে কেরাম। সে চেষ্টা করেছিলো কোন বন্দীকে সুযোগ পেলে ভাগিয়ে নিয়ে যাবে। কিন্তু বন্দীদের কড়া নেগরানী থাকার কারণে তাও সম্ভব হলো না। একবার হযরত উমর (রাঃ)এর নজরে পড়ে গেলো। সে চাইছিলো সটকে পড়বে কিন্তু উমর ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) তাকে পালাবার সুযোগ দিলেন না। খপ করে তার গর্দান চেপে ধরে বললেন, হে আল্লাহর দুশমন! বল তুই কি জন্য এসেছিস?[১]

উমায়ের ভয় পেলো। তৎক্ষণাৎ সংযত হয়ে বললো, উমর ইবনুল খাত্তাব! আমার গর্দান ছাড়ুন। তাহলেই তো বলবো। উমর (রাঃ) তার গর্দান ছেড়ে দিয়ে বললেন ঃ সোজা হয়ে দাঁড়া। এখন সত্য কথা বল।

উমায়ের সোজা হয়ে দাঁড়ালো। বললো, আমি আমার সন্তানের মুক্তির জন্য এসেছি।

উমর ইবনুল খাত্তাব ঃ মিথ্যে বলিস নে। সত্যি সত্যি বল?

উমায়ের ঃ আমি সত্য বলেছি।

উমর (রাঃ) ঃ যদি তাই হয়ে থাকে তাহলে সোজা রাসূলে কারীম (সাঃ)এর খেদমতে হাজির হসনি কেন? মুক্তিপণ দিয়ে দিতি এবং ছেলেকে ছাড়িয়ে নিতি। ঘাপটি মেরে থেকেছিস কেন? কয়েক দিন ধরে তোকে আমি দেখছি। আমাকে দেখলেই তুই সটকে পড়িস কেন?

উমায়ের ঃ এটা সত্য যে, কয়েকদিন থেকে আমি এসেছি। আমি আপনাকে ভয় পাই। আপনি জানেন আমার কোন ধনসম্পদ নেই। আমি হতদরিদ্র। মুক্তিপণ কোত্থেকে দিবো? আমি চিন্তা করছিলাম মুহাম্মাদ (সাঃ)কে একাকী পেলে তাঁর সাথে আমার ছেলের কথা আলোচনা করবো। কিন্তু এরূপ সুযোগই আসেনি।

উমর (রাঃ) ঃ উমায়ের! তোর মনোবাসনা সম্পর্কে আমার সংশয় রয়েছে। যদি তাই হতো তাহলে আমাকে বলতে? তোর জন্য সুপারিশ করতাম?

উমায়ের ঃ সর্বদাই আমি আপনাকে ভয় করতাম। এখনও ভয় পাই। অতঃপর উমর (রাঃ) তার হাত ধরে বললেন ঃ তুই অন্য কোন অভিলাষ নিয়ে এসেছিস। চল, রাসূলের দরবারে। এ কথা বলে টেনে হিঁচড়ে তাকে বনী

টীকা ঃ ১. এটা উমর (রাঃ)-এর বিচক্ষণতা, অন্তর্দৃষ্টিও কাফিরের বিরুদ্ধে কঠোরতার প্রমাণ। কাফিরের বিরুদ্ধে তিনি ছিলেন বজ্রকঠোর অথচ মুসলমানদের সাথে রেশমের চেয়েও কোমল।—অনুবাদক

আদমের গর্ব সাইয়েদুল আম্বিয়া হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ)–এর খেদমতে হাজির করলেন। আরয করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আল্লাহর এই দুশমন কোন কুমতলবে এখানে এসেছে।

প্রিয়নবী (সাঃ) উমায়েরের দিকে তাকালেন। বেচারা থরথর করে কাঁপছে। রাসূলে আকরাম (সাঃ) ইবনুল খাত্তাবকে বললেন ঃ ছেড়ে দাও তাকে। উমর (রাঃ) তাকে ছেড়ে দিলেন। রাসূলে কারীম (সাঃ) উমায়েরকে বললেন, সামনে এসো। উমায়ের সামনে এসে প্রিয়নবী (সাঃ)এর সামনে পৌছলো। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, বলো, কি মতলবে এসেছো?

উমায়ের ঃ আমার ছেলে যুদ্ধবন্দী। তার মুক্তির জন্য হাজির হয়েছি।

প্রিয়নবী (সাঃ) ঃ মিথ্যে বলো না। সত্য প্রকাশ করো।

উমায়ের ঃ সত্যি বলছি।

প্রিয়নবী (সাঃ) ঃ তাহলে কোষবদ্ধ তলোয়ার কেন?

উমায়ের ঃ তরবারীর কপালে আগুন। এখন আর তরবারীর কি ভয়। বদরের যুদ্ধেই তলোয়ার কি কাজে লেগেছে?

প্রিয়নবী (সাঃ) ঃ বদর রণাঙ্গনে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন মুশরিকদের গর্ব–অহংকার ধুলায় লুণ্ঠিত করেছেন। তাদের তরবারীগুলো ভোতা হয়ে গেছে। হীনবল হয়ে পড়েছে তারা। আফসোস তোমাদের ব্যাপারে! এখনও ইসলামের মশাল ফুৎকারে নিভিয়ে দিতে চাইছো।

উমায়ের ঃ এখন আর আমাদের এই শক্তি নেই।

প্রিয়নবী (সাঃ) ঃ উমায়ের! জনসাধারণকে ধোকা দিতে পারো কিন্তু আল্লাহর রাসূলকে প্রতারিত করতে পারবে না। তুমি রুমে বসে সাফওয়ান ইবন উমাইয়ার সাথে আমাকে হত্যার ষড়যন্ত্র করোনি? সে তোমার ঋণ পরিশোধ করেনি? তোমার পরিবার–পরিজনের ভরণ–পোষণের ব্যয়ভার বহন করেনি সে? তোমার তলোয়ারটি হলাহল মিশ্রিত করে আনোনি? তুমি কি আমার শিরচ্ছেদের উদ্দেশ্যে এখানে আসোনি?

এসব গোপন খবর শুনে উমায়ের একেবারে জড় পাথর হয়ে গেলো। কতক্ষণ পর্যন্ত অবাক একটি মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে থাকলো। অতঃপর বললো ঃ কোন সন্দেহ নেই আপনি আল্লাহর রাসূল। এই ষড়যন্ত্রের খবর আমি আর সাফওয়ান ব্যতীত তৃতীয় কেউ জানে না। আল্লাহ তা'আলাই আপনাকে এ সংবাদ সম্পর্কে অবহিত করেছে। আমি ঈমান আনয়ন করলাম। এই বলে উমায়ের বসে পড়লো।

কালিমায়ে শাহাদাত ঃ আশহাদু আল্লা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ পড়ে হয়ে গেলো মুসলমান।

প্রিয়নবী (সাঃ) মুচকি হেসে বললেন ঃ উমায়ের! আল্লাহ তা'আলা তোমার পূর্ববর্তী সমস্ত গোনাহ মাফ করে দিয়েছেন। আল্লাহর কসম! তুমি অনেক লাভবান হয়েছো।[১] তখন সেখানে অনেক সাহাবায়ে কেরামের সমাবেশ। রাসূলে আকরাম (সাঃ) উমায়ের এবং সাফওয়ানের ষড়যন্ত্রের ইতিবৃত্ত শোনালেন। উমায়ের এর সত্যায়ন করে তার ইসলামের কথা প্রকাশ করলো। ফলে মুসলমানদের ঈমান আরো তাজা হলো।

এ এক বিস্ময়কর ব্যাপার। যখনই কেউ ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করতেন তখন আর কেউ তার নিয়ত ও ঈমানের ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করতেন না। তার থেকে কেউ দূরে সরে থাকতেন না। আপন ভাই জ্ঞান করতেন এবং তার সাথে এমন মধুর আচরণ করতেন যারফলে এই নওমুসলিম আক্ষেপ করতে আরম্ভ করতো কেন এসব লোকের বিরুদ্ধে শত্রুতা পোষণ করেছিলাম।

যেদিন উমায়ের মুসলমান হলো সেদিনই যুহরী, নাইল, মাসউদের সাথে রাসূলে কারীম (সাঃ)এর খেদমতে হাজির হলেন এবং ইসলাম গ্রহণ করলেন। ঈমান আনয়ন করলেন সালিমা এবং উম্মে সালিমাও। একজন আনসারীর একটি ছোট্ট বাড়ী তারা ভাড়া নিলেন। অবস্থান করতে লাগলেন সেখানে।

কয়েদীদের পক্ষ থেকে যে দূত মুক্তিপণ আনার জন্য মক্কা গিয়েছিলো সে ফেরত এলো। মুক্তিপণ নিয়ে আসতে লাগলো যুদ্ধবন্দীদের আপনজন, নিকট আত্মীয়রা। প্রিয়নবী (সাঃ) সাধারণভাবে মুক্তিপণ চার হাজার দিরহাম নির্ধারিত করেছিলেন। কিন্তু নেতাদের মুক্তিপণ তার চেয়েও কিছু বেশী নির্ধারণ করেছিলেন। মক্কার কাফিররা স্বীয় আপনজনদের মুক্তিপণ দিয়ে মুক্ত করতে লাগলো।

আব্বাস ছিলেন মদীনাবাসীদের ভাগিনা। মদীনাবাসীদেরকে বলা হতো আনসার। কোন কোন আনসারী প্রিয়নবী (সাঃ)এর নিকট আরয করলেন ঃ আব্বাস আমাদের ভাগিনা। আমরা তার কাছ থেকে মুক্তিপণ নিতে চাই না। ইয়া রাসূলাল্লাহ! যদি আপনি অনুমতি দেন তাহলে বিনা মুক্তিপণে আমরা তাকে ছেড়ে দিবো।

টীকা ঃ ১. রহমাতুল্লিল আলামীন (সাঃ)–এর এই হলো দয়া অনুকম্পার অনুপম নজীর। পরিকল্পিত ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে হলাহল মিশ্রিত তরবারী নিয়ে যে ঘাতক এসেছে প্রিয়নবীর শিরচ্ছেদ করতে, তাকেই সাক্ষাতমাত্র ক্ষমা করে দিলেন, আপন করে নিলেন নিজের। হয়ে গেলো সে মুসলমান। অপর ষড়যন্ত্রকারী সাফওয়ানও পরে ইসলাম গ্রহণ করেছিলো। ইতিহাস পাঠে তাই জানা যায়।—অনুবাদক।

প্রিয়নবী (সাঃ) ঃ আব্বাস তোমাদের ভাগিনা, আমার চাচা। এটা সাম্য নয় যে, তাকে বিনা মুক্তিপণে ছেড়ে দিবো। তাঁর প্রচুর মালসম্পদ আছে। অনায়াসেই তিনি মুক্তিপণ আদায় করতে পারেন। তিনি বিত্তহীন হলে এমনিই ছেড়ে দেয়া যেতো।

অতঃপর আব্বাস (রাঃ)-এর কাছ থেকে চার হাজার দিরহামেরও বেশী মুক্তিপণ নেয়া হলো। এ ব্যাপারে তিনি রাসূলে কারীম (সাঃ)-এর নিকট আপত্তিও জানিয়েছিলেন। প্রিয়নবী (সাঃ) ইরশাদ করলেন ঃ ইসলাম সাম্যের ধর্ম। আমাদের নিকট আপন-পর নির্বিশেষে সবাই সমান। এতদশ্রবণে হযরত আব্বাস খামোশ হয়ে গেলেন।[১]

প্রিয়নবী (সাঃ)-এর জামাতা আবুল আস ছিলেন বিত্তহীন। মুক্তিপণ দেয়ার মতো কোন অর্থ তার কাছে ছিলো না। তার স্ত্রী অর্থাৎ, রাসূলে আকরাম (সাঃ)-এর কন্যা যায়নব (রাঃ) নিজের কণ্ঠহার খুলে প্রেরণ করেছিলেন। এই হারটি তার আম্মা উম্মুল মুমিনীন হযরত খাদীজাতুল কুবরা (রাঃ) তাঁকে উপহার দিয়েছিলেন। স্মারক হিসাবে সেটি ছিলো যায়নাব (রাঃ)-এর নিকট। প্রিয়নবী (সাঃ)এর দরবারে এই হারটি পেশ করা হলে তাঁর মনে স্মরণ হলো হযরত খাদীজার কথা। অশ্রুসিক্ত হয়ে উঠলো হযরত রাসূলে আকরাম (সাঃ)এর দু নয়ন। সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ)-এর নিকট তিনি আরয করলেন ঃ তোমাদের জানা আছে, আবুল আস বিত্তহীন। তার অর্ধাঙ্গিনী অর্থাৎ, আমার কন্যা তার মুক্তিপণ হিসেবে এই কণ্ঠহারটি প্রেরণ

টীকা ঃ ১. আব্বাস রাতে বন্দীত্বের যন্ত্রণায় উহ আহ করছিলেন। তার শব্দ প্রিয়নবী (সাঃ)এর কানে এসে পৌছে। ফলে প্রিয়নবী (সাঃ)এর নিদ্রা দূর হয়ে যায়। লোকেরা জিজ্ঞেস করলো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনার কেন নিদ্রা আসেনি? তিনি ইরশাদ ফরমালেন, আমি কিভাবে নিদ্রা যেতে পারি, যেখানে আমার সম্মানিত চাচার যন্ত্রণার আওয়াজ আমার কানে এসে পৌছাচ্ছে! (কানয, ৫ম খণ্ড, পৃঃ ২৭৫)

এ ঘটনা সত্ত্বেও ইসলামী সাম্য এ অনুমতি দেয়নি যে, স্বীয় বয়োবৃদ্ধ সম্মানিত চাচাকে বন্দীদশা থেকে মুক্তি দেয়। যেভাবে সবার নিকট থেকে ফিদয়া নিয়ে মুক্তি দেয়া হয়েছে, তেমনি তাঁর থেকেও নেয়া হয়েছে। বরং সাধারণ বন্দীদের থেকে কিছুটা বেশী। কেননা সাধারণ বন্দীদের থেকে চার হাজার এবং সর্দারদের নিকট থেকে কিছু বেশী নেয়া হয়েছিলো। আব্বাস ধনী ছিলেন। তাকে চার হাজারের বেশী দিতে হয়।

আনসারগণ আব্বাসের ফিদয়া মার্জনা করে দেওয়ার জন্য অনুরোধ জানিয়েছিলেন। কিন্তু ইসলামী সাম্যে আত্মীয়-অনাত্মীয়, শত্রু-মিত্র সবাই এক সমান। আনসারদের অনুরোধ সত্ত্বেও তা গ্রহণ করা হয়নি।

করেছে। তার জননী তাকে উপহার দিয়েছিলেন এই হারটি। আমি জানি যায়নাবের নিকট এটি অত্যন্ত প্রিয়। তোমরা যদি ভালো মনে করো তাহলে এ হারটি যায়নবকে ফেরত দিয়ে আবুল আসকে মুক্ত করে দিতে পারো।

এতদশ্রবণে সবাই সমস্বরে বললেন ঃ হারটি ফেরত দিন, ছেড়ে দিন আবুল আসকে। ফলে আবুল আসকে মুক্ত করে দেয়া হলো। ফেরত দেয়া হলো হারটি। প্রিয়নবী (সাঃ) তার কাছ থেকে এই প্রতিশ্রুতি নিলেন যেন মক্কায় যেয়ে হযরত যায়নাবকে মদীনায় পাঠিয়ে দেয়। আবুল আস মক্কায় যেয়ে কণ্ঠহারটি যায়নাবের হাতে তুলে দিলেন। তাকে পাঠিয়ে দিলেন মদীনায়।

কয়েদীদের মধ্যে অনেকে ছিলো দরিদ্র। প্রিয়নবী (সাঃ) তাদের বললেন ঃ তোমরা দশজন করে মুসলমান বালককে লেখাপড়া শিক্ষা দিবে।[১] এর বিনিময়ে তোমাদের রেহাই দেয়া হবে। ফলে তারা দশজন করে বালককে শিক্ষা দিয়ে মুক্তিলাভ করলো।

হক ও বাতিলের এই প্রথম রণাঙ্গনে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন মুমিনদের শুধু বিজয়ই দান করেননি। বরং প্রচুর গনিমতের সম্পদ তাদের দিয়েছেন। মুক্তিপণের মাধ্যমেও তারা প্রচুর সম্প্রদের মালিক হলেন। যারা বদরের যুদ্ধে পায়দল গিয়েছিলেন তারা পেলেন সওয়ারী। যারা লৌহবর্মহীন গিয়েছিলেন তারা পেলেন বর্ম। যারা নিরস্ত্র গিয়েছিলেন তারা পেলেন হাতিয়ার। সাহাবীগণ প্রচুর ধনসম্পদের মালিক হলেন। এই যুদ্ধ ইসলামের বুনিয়াদকে মজবুত করে দিলো। মুসলমানদের ভয় ও প্রভাব গোটা আরবের পৌত্তলিক ও ইয়াহুদীদের উপর ছেয়ে গেলো।

অবশেষে রাফিদার চেষ্টায় মাসউদের সাথে সালিমার শুভ বিবাহ সম্পন্ন হলো। সালিমা জানতো তার ভাই নাইল রাফিদাকে ভালবাসতো। সেও এ দুজনকে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করানোর কোশেশ করলো। রাফিদা বললো ঃ আমার মাতাপিতার অনুমতি ব্যতীত আমি বিয়েশাদী করতে চাইনে। মাসউদ

টীকা ঃ ১. স্মর্তব্য, জীবনের প্রথম সুযোগেই মহানবী (সাঃ) মদীনায় শিক্ষা প্রচলনের কি গুরুত্বপূর্ণ ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন! কুরআনের সুপ্রসিদ্ধ লিপিকার যায়দ ইবন সাবিত (রাঃ) এ সময় শিক্ষাপ্রাপ্ত হন। কুরআনের সর্বপ্রথম আয়াত 'ইকরা বিসমি.......'তে শিক্ষা-দীক্ষার জরুরী নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। অথচ তিক্ত ও দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য বর্তমান বিশ্বে মুসলমানরাই শিক্ষা-দীক্ষার ক্ষেত্রে সবচেয়ে পিছিয়ে আছে। আল্লাহ তা'আলা আমাদের সুমতি দিন। আমীন।

—অনুবাদক।

মদীনা থেকে মক্কায় কুরয এবং নাসিরার সাথে সাক্ষাৎ করতে গেলো। মদীনায় নিয়ে আসতে গেলো তাদের। অবশ্য কুরযের সংবাদ সে জানতে পারলো না। কিন্তু নাসিরা মদীনায় হিজরত করতে প্রস্তুত হলেন। ফলে মাসউদ তাকে সাথে নিয়ে মদীনায় চলে এলো। মদীনা মুনাওয়ারায় এসে নাসিরা ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করলো। তার সম্মতিক্রমে রাফিদা এবং নাইলের শুভ আকদ সম্পন্ন হলো। আরবের এই হুর পেয়ে নাইল ভীষণ খুশী। সবাই আরাম–আয়েশে জীবন যাপন করতে লাগলো।

সুবহানাকাল্লাহুম্মা আসতাগফিরুকা ওয়া আতূবু ইলাইক।

সমাপ্ত

আপনার সংগ্রহে রাখার মত কয়েকটি মূল্যবান বই—

* মুসলিম ইতিহাসের বিস্ময়কর ঘটনাবলী
* এনজিও, নাস্তিক–মুরতাদ
* আমাদের নবীজীর (সাঃ) দৈনন্দিন জীবন
* বর্তমান যুগে মুসলমানদের দুর্দশা ও তার প্রতিকার
* রক্তাক্ত তাবলীগ ঃ চমৎকার খোদায়ী মদদ
* ফয়যুল মুলহিম ফী শরহি মুকাদ্দামাতি মুসলিম
* হযরতজীর কয়েকটি স্মরণীয় বয়ান (১ম খণ্ড)
* হযরতজীর কয়েকটি স্মরণীয় বয়ান (২য় খণ্ড)
* ইসলামে নারীর মর্যাদা ও অধিকার
* ইসলাম ও আধুনিক অর্থনীতি
* ইসলামে খেলাধুলা ও চিত্তবিনোদন
* বিচিত্র ঘটনাবলী
* ইসলামে ব্যবসা–বাণিজ্য
* রওযাতুল আদব
* তাবলীগী জামা'আত ঃ
  ভিত্তিহীন অভিযোগ ও তার জবাব
* ইসলামে মুরতাদদের বিধান
* গল্প শুধু গল্প নয়
* মহিলাদের মাসআলা মাসাইল
* জরুরী মাসআলা মাসাইল
* তুহফাতুল মুসল্লী
* দাওয়াত ও তাবলীগের নূরানী কর্মপদ্ধতি

প্রকাশিতব্য ঃ

* ইসলামী সভ্যতা
* মুসনাদে ইমাম আজম (রঃ)–অনুদিত
* কুরআন–হাদীসের আলোকে সিরাতে মুসতাকীম
* হযরত থানভীর দৈনন্দিন আমল
* নারী স্বাধীনতা ও ইসলাম
* সাহাবায়ে কিরামের মর্যাদা
* শিশুর সওগাত
* ফাযায়েলে তাওবা
* কবরের প্রথম রজনী
* মাণিক্য–জহরত

১। কুরয : রাফিদা! সত্যিই কি তুই মুহাম্মাদের ধর্ম গ্রহণ করেছিস?
রাফিদা : হ্যা! এ কথা বলতেই পাষন্ড পিতা স্বজোরে চপেটাঘাত করল ষোড়শী কন্যার গোলাপী মুখে। সুগন্ধি চুলের মুঠি ধরে একেরপর এক থাপ্পড় ও কিল-ঘুষি মারতে লাগল তার দেহে। রাফিদা পিতার প্রহারে বেহুশ হয়ে পড়ল। রাফিদার মা স্বামীকে ধিক্কার দিতে লাগল....

২। দু'আ শেষ করেই আল্লাহর রাসূল (সাঃ) এখনো আকাশের দিকে তাকিয়ে, দেখলেন একখন্ড মেঘ মুসলিম মুজাহিদদের অনতিদূরেই এসে থেমে গেছে। আবার সামনের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। এ দেখে তিনি মুচকি হাসলেন। জনৈক সাহাবী এক আল্লাহর দুশমনের পশ্চাদধাওয়া করছিলেন, হঠাৎ দেখলেন এক টুকরা মেঘ পাহাড়ের পেছন থেকে উঠে আসছে। আর তার থেকে শব্দ বের হচ্ছে "উকদুম হাইযুম" হাইযুম সামনে বাড়ো। এর সাথে সাথে তিনি বেত্রাঘাতের শব্দও শুনলেন। সামনেই দেখলেন উক্ত কাফিরের লাশ পড়ে আছে। তার নাক কাটা ও চেহারায় বেত্রাঘাতের চিহ্ন। নবীজী এ ঘটনা শুনে বললেন- স্বরটি মূলত ফেরেশতার, আর হাইযুম হলো তার ঘোড়ার নাম।

৩। বার্তাবাহক বলেই চলেছে- আমাদের সম্মানিত নেতৃবৃন্দ নিহত হয়েছেন। রবীআর দু'পুত্র উৎবা ও শায়বা নিহত হয়েছেন, হাজ্জাজের সন্তানদ্বয় উমাইয়া ও রবীআকে হত্যা করা হয়েছে। কতল করা হয়েছে আবুল বাখতারীকে। উমাইয়া ও নাওফেলও আর বেঁচে নেই, আমাদের প্রাণপ্রিয় সর্বাধিনায়ক আবু জেহেলও আর এ ধরায়.....।

৪। রাফিদা বদরে আসার সময় কুরাইশ বাহিনীর পরাজয় কাহিনী শুনছিল। মনে মনে সে যারপরনাই আনন্দিত হল। রাফিদার চেহারা গোলাপী রং ধারণ করল, আঁখীযুগল হয়ে উঠল প্রজ্জ্বল। কিন্তু নাইল তার আনন্দ দেখে কিংকর্তব্য বিমূঢ়। মৃদুস্বরে ডাক দিল রাফিদা! তুমি এতে আনন্দিত?
রাফিদা : হ্যা, সত্য-মিথ্যার এটাই প্রথম রণক্ষেত্র....।

বক্ষমান এ পুস্তকটি ভারতের স্বনামধন্য উপন্যাসিক ও লেখক জনাব মাওলানা সাদেক হোসাইন বদরের ঐতিহাসিক ঘটনাকে রোমাঞ্চকর ভঙ্গিতে উপন্যাস আকারে পাঠক সমাজের কাছে উপস্থাপন করেছেন। যা শুরু করলে শেষ না করা পর্যন্ত স্বস্তি আসবে না পাঠক হৃদয়ে। সাথে সাথে হক ও বাতিলের প্রতিদন্দ্বিতায় হক বিজয়ী হওয়ার জাজ্জ্বল্য প্রমাণও মিলবে এ বইটিতে।

আল আকসা লাইব্রেরী
৫০, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০।